সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

www.icsbook.info

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

سُنّت کی آئینی حیثیّت

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মদ মূসা

অনুবাদ সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
E-mail : shotabdipro@yahoo.com
www.moudoodiacademy.org

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মদ মূসা

অনুবাদ সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-006-0
শ. প্র : ৫১

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com
www.moudoodiacademy.org

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯৮ ঈসায়ী
পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

SUNNAT-E-RASULER AYEEMGATA MORJADA By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292, Mob : 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. www.moudoodiacademy.org, First Edition : November 1998, 5th Print : February 2012.

Price Tk. 200.00 Only.

আমাদের কথা

'সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত' আল্লামা মওদূদীর (রঃ) এক অনবদ্য গ্রন্থ, যার বাংলা সংস্করণের নাম দিয়েছি আমরা 'সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা'। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই একদল লোক রাসূলুল্লাহ্‌র (স) সুন্নাহ্‌কে ইসলামী শরীয়ার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আসছে। আজও এদের অনুসারীরা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সুন্নাতে রাসূলের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা হাদীস ভান্ডারকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যে এদের অনেকে যুক্তি ও তর্ক বহছের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। যারা ইসলামী শরীয়া এবং হাদীস ও সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান রাখেন না, তাদের কাছে হাদীস ও সুন্নাহ্‌ অস্বীকারকারীদের যুক্তি খুবই শানিত মনে হবে।

বিভিন্ন যুগে মুহাদ্দিস ও মুজাদ্দিদগণ মহানবীর (স) হাদীস ও সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে এদের বিভ্রান্তি থেকে ইসলামী উম্মাহ্‌কে হিফাযত করার ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট অবদান রেখে গেছেন। যুক্তি ও দলিল প্রমাণের কষ্টিপাথরে হাদীস তথা সুন্নাতে রাসূলকে আইন ও শরীয়ার ভিত্তি হিসেবে যেভাবে আল্লামা মওদূদী (রঃ) সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, গোটা হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর এ অনুপম অবদান চিরদিন সোনালী অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি মুনকেরীনে হাদীসের (হাদীস অস্বীকারকারীদের) তথাকথিত সমস্ত শানিত যুক্তিকে একেবারেই অন্তঃসারশূণ্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। হাদীস ও সুন্নাহ্‌র গোটা ভান্ডার অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যে মূলত কুরআনকেও অস্বীকার করছে এবং দীনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানছে, সে কথা তিনি সূর্যালোকের

মতো স্বচ্ছভাবে সুবিদিত করে দিয়েছেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মূলত চিরদিনের জন্যে ওদের মুখে চুনকালি পড়ে গেছে। এভাবে আল্লামা মওদূদী (রঃ) আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাহ্‌কে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে হিফাযত করার সুব্যবস্থা করে গেছেন।

এমনি করে, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, ইসলামী চিন্তার ঐক্য ও পূণর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, সেই সাথে হাদীস তথা সুন্নাতে রাসূলকে সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযত করে এবং বাতিল পন্থীদের আরোপিত জঞ্জাল ও কালিমা থেকে মুক্ত করে একালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুজাদ্দিদের আসনে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করে গেছেন।

এই গ্রন্থটি মূলত মাওলানা পত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে হাদীস অস্বীকারকারীদের বক্তব্য, মতামত ও রায়কে খন্ডন করে যেসব যুক্তি ও দলিল প্রমাণ পেশ করেছিলেন, সেগুলোরই সংকলন।

ইসলামী চিন্তাশীল, আলিম সামাজ, হাদীস বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবিদের জন্যে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আবেদনশীল প্রমাণিত হবে বলে আমরা মনে করি। সুধী সমাজের ঘরে ঘরে গ্রন্থখানি পঠিত ও রক্ষিত হবার দারুন প্রয়োজনও আমরা উপলব্ধি করছি।

গ্রন্থখানি মাওলানা মুহাম্মদ মূসা অনুবাদ করে দিয়েছেন। অতপর আমি আগাগোড়া সম্পাদনা করে দিয়েছি। তারপরও পরিভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সে ব্যাপারে আমরা বিজ্ঞ পাঠকদের পরামর্শের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই মহান অবদানের জন্যে মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) বিপুলভাবে পুরস্কৃত করুন। আমরাও এ কল্যাণের অংশীদার হবার ঐকান্তিক আকাংখা নিয়ে পরম দয়াময়ের দরবারে হাত পেতে রইলাম। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
২০.১১.৯১

সূচীপত্র

ভূমিকা

- **একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র বিনিময়** ২৭

সুন্নাত কি ৩১

সুন্নাত কি অবস্থায় বর্তমান আছে ৩৪

সুন্নাত কি সর্বস্বীকৃত এবং তার যথার্থতা পরীক্ষার উপায় কি ৪০

চারটি মৌলিক সত্য ৪৩

রসূলুল্লাহ (স)-এর কাজের ধরন ৪৭

মহানবী (স)-এর ব্যক্তিসত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার মধ্যে পার্থক্য ৪৮

কুরআনের অতিরিক্ত হওয়া এবং কুরআনের বিরোধী হওয়া সমার্থবোধক নয় ৪৯

সুন্নাত কি কুরআন মজীদের কোন হুকুম রহিত (মানসূখ) করতে পারে ৫০

দ্বিতীয় দফা ৫১

হাদীসসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রয়োগ ৫২

চতুর্থ দফা ৫৪

- **নবুওয়াতের পদমর্যাদা** ৫৬

যথার্থ ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পার্থক্য ৫৬

ডকটর সাহেবের পত্র ৫৬

প্রবন্ধকারের জবাব ৬৩

১. নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও তার দায়িত্ব ৬৪

রসূলুল্লাহ (স) শিক্ষক ও মুরব্বী হিসাবে ৬৭

রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর কিতাবের ভাষ্যকার হিসাবে ৬৮

রসূলুল্লাহ (স) নেতা ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে	৬৯
শরীআত প্রণেতা হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)	৭০
বিচারক হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)	৭১
রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)	৭২
সুন্নাত আইনের উৎস হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা	৭৫
২. রসূলুল্লাহ (স)-এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা	৭৬
মহানবী (স)-এর আইন প্রণয়ন কর্মের ধরন	৭৭
এই আইন প্রণয়নমূলক কাজের কয়েকটি দৃষ্টান্ত	৭৭
৩. সুন্নাত এবং তা অনুসরণের অর্থ	৮০
৪. রসূলে পাক (স) কোন্ ওহী অনুসরণে আদিষ্ট ছিলেন এবং আমরা কোন্টি অনুসরণে আদিষ্ট	৮১
৫. জাতির কেন্দ্র	৮৪
কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন	৮৫
৬. মহানবী (স) কি কুরআন পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই নবী ছিলেন	৮৮
৭. মহানবী (স)-এর ইজতিহাদী ভুলকে ভ্রান্ত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে	৮৯
৮. কাল্পনিক ভীতি	৯৩
৯. খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি অপবাদ	৯৭
১০. মহানবী (স)-এর নিকট কুরআন ছাড়াও কি ওহী আসত	১০৩
সুন্নাত সম্পর্কে আরও কতিপয় প্রশ্ন	১১০
ডকটর সাহেবের চিঠি	১১০
গ্রন্থকারের জওয়াব	১১২
ওহীর উপর ঈমান আনার কারণ	১১৫
'মা আনযালাল্লাহু' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে	১১৬
সুন্নাত কোথায় আছে	১২০
সুন্নাতের হেফাজত কি আল্লাহ করেছেন	১২০
ওহী বলতে কি বুঝায়	১২২

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি মাত্র ১২৪
ঈমান ও কুফরের মাপকাঠি ১২৪
সুন্নাতের বিধানের কি পরিবর্তন হতে পারে ১২৫

■ **অভিযোগ ও জবাব** ১২৭
১. বাযমে তুলূ-ই ইসলাম পত্রিকার সাথে সম্পর্ক ১২৭
২. দুর্মুখ প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য কি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ছিল ১২৮
৩. রসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিসত্তা ও নববী সত্তা ১২৯
৪. সুন্নাতের শিক্ষায় স্তর বিন্যাস ১৩১
৫. জ্ঞানানুসন্ধান না বিতর্কপ্রিয়তা ১৩৩
৬. রসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিবিধ সত্তার মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি ও পন্থা ১৩৫
৭. কুরআনের মত হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর ব্যবস্থা করা হল না কেন ১৩৬
৮. ধোঁকা ও প্রতারণার একটি নমুনা ১৩৮
৯. হাদীসের ভাণ্ডারে কি জিনিস সন্দেহজনক এবং কি জিনিস সন্দেহমুক্ত ১৩৯
১০. আরও একটি প্রতারণা ১৪১
১১. উম্মাতের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে -এরূপ কোন জিনিস কি নেই ১৪৩
১২. সুন্নাত মতবিরোধ কমিয়েছে না বৃদ্ধি করেছে ১৪৪
১৩. হাদীস অস্বীকারকারী ও খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের মধ্যে সাদৃশ্য ১৪৬
১৪. যে জিনিসের মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা নেই তা কি আইনের উৎস হতে পারে ১৪৮
১৫. কুরআন ও সুন্নাত উভয়ের বেলায় মতভেদ দূর করার পন্থা একই ১৪৯
১৬. একটি চিত্তাকর্ষক ভ্রান্তি ১৪৯
১৭. ব্যক্তিগত আইন ও জাতীয় আইনের মধ্যে বিভক্তি কেন ১৫০
১৮. রসূলের মর্যাদা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকরী বক্তব্য থেকে পশ্চাদপসরণ ১৫২
১৯. কোন অ-নবী কি নবীর যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে ১৫৩
২০. ইসলামী ব্যবস্থায় 'আমীর' এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের "জাতির কেন্দ্রবিন্দু"র মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে ১৫৪

২১. রিসালাতের যুগে পারস্পরিক পরামর্শের কি সীমারেখা ছিল ১৫৯
২২. আযানের পদ্ধতি কি পরামর্শের ভিত্তিতে না
ইলহামের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল ১৫৯
২৩. মহানবী (স)-এর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ দলীল কি না ১৬১
২৪. বক্র বিতর্কের একটি বিস্ময়কর নমুনা ১৬২
২৫. মহানবী (স)-এর ব্যক্তিগত মত এবং ওহীর ভিত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যের
মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল ১৬৪
২৬. সাহাবীগণ কি একথার প্রবক্তা ছিলেন যে, মহানবী (স)-এর
সদ্ধান্তসমূহ পরিবর্তন করা যেতে পারে ১৬৫
২৭. তিন তালাকের ব্যাপারে হযরত উমার (রা)-র ফয়সালার স্বরূপ ১৬৭
২৮. "মুআল্লাফাতুল কুলূব" সম্পর্কে হযরত উমার (রা)-র
যুক্তির ধরন-প্রকৃতি ১৬৮
২৯. বিজিত এলাকা সম্পর্কে হযরত উমার (রা)-র সিদ্ধান্ত কি মহানবী
(স)-এর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী ছিল ১৬৯
৩০. বেতন-ভাতা বন্টনের ব্যাপারে হজরত উমার (রা)-র সিদ্ধান্ত ১৭০
৩১. কুরআন মজীদের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ কি তৎকালীন
যুগের জন্য ছিল ১৭১
৩২. "সমসাময়িক কালের" ভুল ব্যাখ্যা ১৭২
৩৩. মহানবী (স) কি শুধুমাত্র কুরআনের ভাষ্যকার না আইন প্রণেতাও ১৭৩
৩৪. রসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরদৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ার তাৎপর্য ১৭৫
৩৫. কুরআনের আলোকে ওহীর শ্রেণীবিভাগ ১৭৮
৩৬. ওহী গায়র মাতলূর উপর ঈমান আনয়ন
রসূলের উপর ঈমান আনয়নের অংশ ১৮০
৩৭. পরোক্ষ ওহী (ওহী গায়র মাতলূ)-ও কি জিবরীল (আ)
নিয়ে আসতেন ১৮৩
৩৮. কিতাব ও হিকমাত (বিচক্ষণতা) কি একই জিনিস না স্বতন্ত্র জিনিস ১৮৪
৩৯. 'তিলাওয়াত' শব্দের অর্থ ১৮৫
৪০. কিতাবের সাথে মীযান অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ ১৮৬

৪১. আরেকটি বক্র বিতর্ক ১৮৮
৪২. কিবলার পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াতে কোন্ কিবলার কথা বলা হয়েছে ১৯০
৪৩. কিবলার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর আনুগত্য করা বা না করার প্রশ্ন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২
৪৪. রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নিজস্বভাবে কিবলা নির্ধারণের অপবাদ ১৯৩
৪৫. আয়াতের তাৎপর্য ১৯৫
৪৬. ওহী কি স্বপ্নের আকারেও আসে ১৯৬
৪৭. অর্থহীন অভিযোগ ও অপবাদ ১৯৭
৪৮. আয়াতাংশের তাৎপর্য ২০১
৪৯. হযরত যয়নব (রা)-র বিবাহ আল্লাহ্র হুকুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না ২০২
৫০. এর অর্থ কি প্রচলিত রীতিনীতি না আল্লাহ্র নির্দেশ ২০৪
৫১. আরও একটি মনগড়া ব্যাখ্যা ২০৬
৫২. উল্টাপাল্টা জবাব ২০৮
৫৩. অক্ষরশূন্য ওহীর ধরন ও বৈশিষ্ট্য ২০৯
৫৪. ওহী মাতূল ও ওহী গায়র মাতলূর মধ্যে পার্থক্য ২১০
৫৫. প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অস্বীকার করা রসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য অস্বীকার করার নামান্তর ২১১

■ **পাকিস্তান হাইকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়** ২১৩
রায়ের পর্যালোচনা ২৪৯
দুটি মূলনীতিগত প্রশ্ন ২৫০
হানাফী ফিক্হ্-এর আসল মর্যাদা ২৫১
বিজ্ঞ বিচারপতির মৌলিক দৃষ্টিভংগী ২৫৬
উপরোক্ত দৃষ্টিভংগীর সমালোচনা ২৫৯
ইজতিহাদের কয়েকটি নমুনা ২৬১
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিজ্ঞ বিচারকের ইজতিহাদ ২৬১

এই ইজতিহাদের প্রথম ভ্রান্তি ২৬২
দ্বিতীয় ভ্রান্তি ২৬৩
তৃতীয় ভ্রান্তি ২৬৪
চতুর্থ ভ্রান্তি ২৬৫
পঞ্চম ভ্রান্তি ২৬৭
২য় ইজতিহাদ - চুরির শাস্তি সম্পর্কে ২৬৯
৩য় ইজতিহাদ – সন্তানের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে ২৬৯
মৌলিক ভ্রান্তি ২৭১
সুন্নাত সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিভংগী ২৭১
সুন্নাত সম্পর্কে উম্মাতের দৃষ্টিভংগী ২৭১
বিচারকের দৃষ্টিতে ইসলামে নবীর মর্যাদা ২৭২
কুরআনের আলোকে নবীর আসল মর্যাদা ২৭৪
ওহী কি শুধু কুরআন পর্যন্ত সীমিত ২৭৮
মহানবী (স) কি নিজের চিন্তাভাবনার অনুসরণ করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন ২৬৯
মহানবী (স)–এর সুন্নাত ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র কি না ২৮০
রসূলের আনুগত্যের প্রকৃত অর্থ ২৮১
মহানবী (স)–এর পথনির্দেশ কি তাঁর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল ২৮৩
খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক সুন্নাত অনুসরণের কারণ ২৮৫
ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর হাদীসের জ্ঞান ও সুন্নাতের অনুসরণ ২৮৫
বিচারপতির মতে হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণ ২৮৮
উল্লেখিত কারণসমূহের সমালোচনা ২৯১
জাল হাদীস কি ইসলামী আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে ২৯১
মহানবী (স)–এর যুগেই কি জাল হাদীসের প্রচলন শুরু হয়েছিল ২৯২
হযরত উমার (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন কেন ২৯৩
ইমাম বুখারী (রহ)–এর ছয় লক্ষ হাদীসের কল্পকাহিনী ২৯৪
জাল হাদীস কেন রচনা করা হয়েছিল ২৯৫
যুক্তির তিনটি ভ্রান্ত ভিত্তি ২৯৭

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা ও তার কারণসমূহ ২৯৭
হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি ২৯৮
হাদীসসমূহ মৌখিকভাবে বর্ণনা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান,
বরং গুরুত্ব আরোপ ৩০০
জাল হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী ৩০২
মহানবী (স)-এর সুন্নাত আইনের উৎস হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ৩০৩
লিপিবদ্ধ জিনিসই কি শুধু নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে ৩০৫
হাদীসসমূহ কি আড়াইশো বছর ধরে অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠে পড়ে রয়েছিল ৩০৮
সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনা ৩১০
সাহাবীদের যুগ থেকে ইমাম বুখারীর যুগ পর্যন্ত
ইল্‌মে হাদীসের ধারাবাহিক ইতিহাস ৩১১
দ্বিতীয় হিজরী শতকের হাদীস-সংকলকবৃন্দ ৩১৩
হাদীসসমূহের মধ্যে মতপার্থক্যের তাৎপর্য ৩১৪
স্মৃতিশক্তি থেকে নকলকৃত রিওয়ায়াত কি অনির্ভরযোগ্য ৩১৫
হাদীসসমূহের সুরক্ষিত থাকার আসল কারণ ৩১৭
হাদীসসমূহের যথার্থতার একটি প্রমাণ ৩১৯
কতিপয় হাদীস সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারকের আপত্তি ৩২১
কোন কোন হাদীসে অশালীন বিষয়বস্তু আছে কেন ৩২২
অভিযোগসমূহের বিস্তারিত মূল্যায়ন ৩২৪
আরও দুটি হাদীস সম্পর্কে অভিযোগ ৩২৮
আরও একটি হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩২৯
বিচারপতির মতে সুন্নাতে নববী আইনের উৎস না হওয়ার
আরও দুটি প্রমাণ ৩৩০
স্বয়ং মুহাদ্দিসগণের কি হাদীসসমূহের উপর আস্থা ছিল না ৩৩২
হাদীসের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার অভিযোগ ৩৩৩
হাদীস কি কুরআনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে ৩৩৪
শেষ নিবেদন ৩৩৫

بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাহ অস্বীকার করার ফেতনা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরী শতকে উত্থিত হয়েছিল। এই ফিতনার সুত্রপাত করেছিল খারিজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়। খারিজীদের এই ফিতনা উথাপনের প্রয়োজন এজন্য হয়েছিল যে, তারা মুসলিম সমাজে যে নৈরাজ্য ছড়াতে চাচ্ছিল তার পথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ (হাদীস) প্রতিবন্ধক ছিল যা এই সমাজকে একটি সুশৃংখল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের এ পথে মহানবী (স)–এর সেই সব বাণীও প্রতিবন্ধক ছিল যার বর্তমানে খারিজীদের চরমপন্থী মতবাদ অচল হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তারা হাদীসের যথার্থতায় সন্দেহ পোষণ এবং সুন্নাহ্‌র অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

মুতাযিলাদের এই ফিতনার সুত্রপাত করার প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, অনারব ও গ্রীক দর্শনের সাথে প্রথম বারের মত সাক্ষাত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামী আকীদা–বিশ্বাস, নীতিমালা ও আইন–বিধান সম্পর্কে যেসব সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে তা পূর্ণরূপে অনুধাবনের পূর্বে তারা কোন না কোনভাবে এর সমাধান দিতে চাচ্ছিল। স্বয়ং এই দর্শনের উপর তাদের এতটা অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়নি যে, তার সমালোচনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার বিশুদ্ধতা ও শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। দর্শনের নামে যে কথাই এসেছে তারা তাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবী মনে করেছে এবং তারা চাচ্ছিল যে, ইসলামের আকীদা–বিশ্বাস ও নীতিমালার এমন ব্যাখ্যা করা হোক যাতে তা এই নামমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দাবীর অনুরূপ হয়ে যায়। এ পথেও হাদীস এবং সুন্নাহ্ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তারাও খারিজীদের মত হাদীসকে সন্দেহযুক্ত মনে করে এবং সুন্নাহ্‌কে দলীল হিসাবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

এই উভয় দলের ফেতনার উদ্দেশ্য এবং তাদের কৌশল ছিল অভিন্ন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কুরআন মজীদকে তার বাহকের মৌখিক ও আমলী (বাস্তব) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এবং আল্লাহ্‌র রসূল (স) স্বীয় পরিচালনায় ও নির্দেশনায় যে চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র একটি গ্রন্থের আকারে উপস্থাপন করা, অতপর তার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে আরেকটি ব্যবস্থায় রূপান্তর করা, যার উপর ইসলামের লেবেল আঁটা থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে কৌশল অবলম্বন করে তার দুটি অস্ত্র ছিলঃ

(এক) হাদীস সম্পর্কে মনের মধ্যে এই সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে যে, তা আদৌ মহানবী (স)-এর বাণী কি না?

(দুই) এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে যে, কোন কথা বা কাজ মহানবী (স)-এর হলেও তার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে আমরা কখন বাধ্য?

তাদের দৃষ্টিভংগী এই ছিল যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) আমাদের পর্যন্ত কুরআন মজীদ পৌছিয়ে দিতে আদিষ্ট ছিলেন। অতএব তিনি তা পৌছে দিয়েছেন। অতপর মুহাম্মাদ (স) ইবনে আবদুল্লাহ্ আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন তা কি আমাদের জন্য হুজ্জাত (অকাট্য প্রমাণ) হতে পারে?

এই দুটি ফিতনা সামান্য কাল চলার পর নিজের অপমৃত্যু নিজেই ঘটিয়েছে এবং তৃতীয় হিজরী শতকের পর কয়েক শতক পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ার কোথাও তার নামগন্ধও অবশিষ্ট ছিল না। নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ঐ সময় উল্লেখিত ফিতনার মূলোৎপাটন করেঃ

১. মুহাদ্দিসগণের ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক কাজ যা মুসলিম সমাজের সকল চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের আশ্বস্ত করে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্ যেসব রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তা কখনও সন্দেহযুক্ত নয়, বরং অতীব বিশ্বস্ত মাধ্যমে উম্মাতের নিকট পৌছেছে এবং তাকে সন্দেহযুক্ত রিওয়ায়াত থেকে পৃথক করার জন্য সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ বর্তমান রয়েছে।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা, যার সাহায্যে তৎকালীন যুগের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ মুসলিম জনসাধারণের সামনে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা তাই নয়-যা হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁকে দিতে চাচ্ছে। কুরআন মজীদ পৌছে দেয়ার জন্য তাঁকে একজন পত্রবাহক মাত্র নিযুক্ত করা হয়নি, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে

শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, কুরআনের ভাষ্যকার, আইনপ্রণেতা এবং বিচারক ও প্রশাসকও নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব স্বয়ং কুরআন মজীদের আলোকেই তাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তন আমাদের জন্য ফরয এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণের দাবী করে সে মূলতঃ কুরআনের অনুসারীই নয়।

৩. সুন্নাত অস্বীকারকারীদের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা–যারা কুরআনকে খেলনায় পরিণত করেছিল। সে বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মুসলিম সর্বসাধারণের সামনে এই সত্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের সাথে কুরআন মজীদের সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে দীন ইসলামের অবয়ব কতটা নিকৃষ্টভাবে বিকৃত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে কিভাবে কিভাবে খেলতামাশা করা যায় এবং তার অর্থগত বিকৃতির কি ধরনের হাস্যকর নমুনা সামনে আসে।

৪. উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ চিন্তা, যা কোন ক্রমেই একথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না যে, মুসলিম ব্যক্তি কখনও রসূলুল্লাহ (স)–এর আনুগত্য ও অনুবর্তন থেকে মুক্তও হতে পারে। মুষ্টিমেয় এমন কিছু লোক তো প্রতিটি যুগেই এবং প্রতিটি জাতির মধ্যেই থাকে যারা ছন্দহীন কথার মধ্যেই ছন্দ অনুভব করে, যুক্তিহীন কথার মধ্যে যুক্তি অনুভব করে, কিন্তু সমগ্র উম্মাতের চালিকা শক্তি হওয়া তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। মুসলিম সর্বসাধারণের মানসিক ছাঁচে এই অযৌক্তিক কথা কখনও ঠিকভাবে খাপ খায় না যে, লোকে রসূলুল্লাহ (স)–এর রিসালাতের উপর ঈমানও আনবে আবার নিজের ঘাড় থেকে তাঁর আনুগত্যের রশিও খুলে ফেলবে। একজন সহজ সরল প্রকৃতির মুসলমান যার মনমগজে বক্রতা নেই, কার্যত নাফরমানিতে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু এই আকীদা কখনও গ্রহণ করতে পারে না যে, যেই রসূলের উপর সে ঈমান এনেছে তাঁর আনুগত্য করতে মোটেই বাধ্য নয়।

এটা ছিল সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী জিনিস যা শেষ পর্যন্ত সুন্নাহ্ প্রত্যাখ্যানকারীদের শিকড় কেটে দিয়েছে। উপরন্তু মুসলিম জাতির মেজাজ এত বড় বিদআতকে হজম করার জন্য কোন প্রকারেই প্রস্তুত হয়নি যে, এই পূর্ণাংগ জীবন–বিধান, তার সমস্ত আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা এবং কাঠামো সমেত প্রত্যাখ্যান করা হবে যা রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগ থেকে শুরু হয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, আইম্মাই মুজতাহিদীন (মুজতাহিদ ইমামগণ) এবং উম্মাতের ফকীহ্‌গণের পথনির্দেশনায় ধারাবাহিকভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ লাভ করে আসছিল, এবং তা পরিত্যাগ করে ভবিষ্যতে একটি নতুন ব্যবস্থা এমন লোকদের দ্বারা গড়ে তোলা

হবে যারা দুনিয়ার প্রতিটি দর্শন ও প্রতিটি খেয়ালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের একটি আধুনিক সংস্করণ বের করতে চায়।

এভাবে ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে সুন্নাহ্ প্রত্যাখ্যানের এই ফিতনা কয়েক শতাব্দী যাবত নিজের শ্মশানভূমিতে পড়ে থাকে। অবশেষে হিজরী ত্রয়োদশ শতকে (খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে) তা পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠে। তার পহেলা জন্ম হয় ইরাকে, এখন পুনর্জন্ম লাভ করেছে ভারতে। এখানে স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খান ও মৌলভী চেরাগ আলী এর সূচনা করেন। অতপর মৌলভী আবদুল্লাহ চক্রালোবী এর পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরে মৌলভী আহ্মাদুদ-দীন অমৃতসরী এর ভেলা ভাসালেন এবং মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরী তা নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। অবশেষে আসে চৌধুরী গোলাম আহমাদ পারভেযের ভূমিকা, যিনি এই গোমরাহীকে চরম পর্যায়ে পৌছান।

এর পুনর্জন্মের কারণও তাই ছিল, যা দ্বিতীয় হিজরী শতকে এর জন্মের কারণ হয়েছিল। অর্থাৎ বাইরের দর্শন ও ইসলাম-বিরোধী সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়ে মানসিক পরাজয় বরণ করা এবং সমালোচনা ব্যতীতই বাইরের এসব জিনিসকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবী বলে মেনে নিয়ে ইসলামকে তদনুযায়ী ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের তুলনায় ত্রয়োদশ শতকের পরিস্থিতি ছিল অনেক ভিন্নতর। ঐ সময় মুসলমানরা ছিল বিজয়ী, তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যও ছিল এবং তারা যেসব দর্শনের সম্মুখীন হয়েছিল তা ছিল বিজিত ও পরাভূত জাতিসমূহের দর্শন। একারণে তাদের মন-মগজে এসব দর্শনের আক্রমণ খুবই হালকা প্রমাণিত হয় এবং অনতিবিলম্বে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

পক্ষান্তরে ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের উপর এই হামলা এমন সময় করা হয় যখন তারা প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে আসছিল, তাদের আধিপত্যের এক একটি ইট খসে পড়ছিল, তাদের দেশ শত্রুরা দখল করে নিয়েছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে পংগু করে দেয়া হয়েছিল, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উলোটপালট করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের উপর বিজয়ী জাতি নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা, আইন-কানুন এবং নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন ও শৃংখল পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়েছিল। এই অবস্থায় যখন মুসলমানগণ বিজয়ী জাতির দর্শন, বিজ্ঞান এবং তাদের আইন-কানুন ও সাংস্কৃতিক নীতিমালার সম্মুখীন হল তখন তাদের মধ্যে পূর্বকালের মুতাযিলাদের তুলনায় হাজার গুণ বেশী ভীত প্রভাবিত মনের

মুতাযিলার আবির্ভাব হতে থাকল। তারা মনে করে নিল যে, পাশ্চাত্য থেকে যে মতবাদ, যে চিন্তা, যে ধ্যানধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতির যে নীতিমালা এবং আইন-বিধান আমদানী হচ্ছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমালোচনা করে সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করা অজ্ঞতা প্রসূত ধারণা বৈ কিছু নয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইসলামকে যেভাবেই হোক কেটেছেটে যুগোপযোগী করে নিতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে তারা যখনই ইসলামকে মেরামত করতে চাইল তখন তারাও অতীতের মুতাযিলাদের অনুরূপ অসুবিধারই সম্মুখীন হল। তারা অনুভব করল যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে যে জিনিস পূর্ণাংগ ও বাস্তবরূপে কায়েম করেছে তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্। এই সুন্নাহ্ই কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে মুসলমানদের পূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণার বিনির্মাণ করেছে এবং এই সুন্নাহ্ই জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামের বাস্তব রূপ মজবুত ভিত্তির উপর গঠন করেছে। অতএব এই সুন্নাহ্র ব্যাপারে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ না করা পর্যন্ত ইসলামের কোনরূপ নতুন মেরামত সম্ভব নয়। তারপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ, যেগুলো বুঝার ক্ষেত্রে না থাকবে কোন বাস্তব নমুনা, না কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আর না কোন প্রকারের রিওয়ায়াত ও নযীর। এভাবে কুরআনকে অপব্যাখ্যার নিপুণ ফলকে পরিণত করা সহজ হবে এবং ইসলাম পরিণত হবে একটি মোমের পিন্ডে, যাকে দুনিয়ার প্রতিটি প্রচলিত দর্শন অনুযায়ী প্রতি দিন একটি নতুন আকৃতি দান করা যাবে।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারাও আবার অতীত কালে ব্যবহৃত দুটি কৌশল দুটি মারনাস্ত্র হিসাবে অবলম্বন করে। অর্থাৎ একদিকে যেসব হাদীসের মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়-তার যথার্থতায় সন্দেহের সৃষ্টি করা হল এবং অপরদিকে সুন্নাতের স্বয়ং ও সরাসরি হুজ্জাত (প্রমাণ) হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করা হল। কিন্তু এখানে পরিস্থিতির পার্থক্য এই কৌশল ও তার মারনাস্ত্রের বিস্তারিত আকারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। অতীত কালে যেসব লোক এই ফেতনার পতাকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তারা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপক্ক। তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ-এর জ্ঞানেও তারা ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেইসব মুসলমানদের সাথে যাদের জ্ঞান চর্চার ভাষা ছিল আরবী। তখনকার সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অনেক উন্নত। সেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বত্র বিচরণ করতেন এবং

এই ধরনের জনগণের সামনে কোন কাঁচা কথা এনে পরিবেশন করলে স্বয়ং সেই ব্যক্তিরই বিপাকে পড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ কারণে অতীত কালের মুতাযিলাগণ পরিমাপ করে কথা বলত। পক্ষান্তরে আমাদের যুগে যেসব লোক এই ফিতনা ছড়ানোর জন্য আবির্ভূত হয়েছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মানও স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খানের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একজন থেকে আরেকজনের নিম্নতর হতে থাকে। আর তাদেরকে এমন লোকদের মোকাবিলা করতে হয় যাদের মধ্যে আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানের অধিকারীদের নাম "শিক্ষিত" নয়, এবং "শিক্ষিত" এমন ব্যক্তির নাম যে পার্থিব বিষয়ে চাই যত কিছুই জানুক, কিন্তু কুরআনের উপর খুব মেহেরবানী করে থাকলে শুধু তার তরজমাটুকু–তাও আবার ইংরেজী তরজমার সাহায্যে পড়তে পারে। হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে বেশী জোর তারা কানে শুনা জ্ঞানের অধিকারী, তাও আবার প্রাচ্যবিদদের পৌঁছানো জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। ইসলামী রীতিনীতির উপর খুব বেশী হলে বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, আবার তাও এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, কতগুলো বাসিপচা হাড়ের সমষ্টি–যাতে ঠোকর মেরে যুগ অনেক সামনে এগিয়ে গেছে। পুনশ্চ ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের ভান্ডার সম্পর্কে তারা এই ধারণায় লিপ্ত হয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম। এই অবস্থায় অতীতের মুতাযিলাদের তুলনায় বর্তমান কালের মুতাযিলাদের যোগ্যতার মানদন্ড কতটা নিম্নতর হতে পারে তা সুস্পষ্ট। এখানে জ্ঞানের পরিমাণ কম এবং অজ্ঞতার বাহাদুরী ও দৃষ্টতা অত্যধিক।

বর্তমানে এই ফেতনার প্রসারের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. হাদীসকে সন্দেহপূর্ণ প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজেদের পক্ষ থেকে টীকা সংযোজন করে তা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, যাতে অজ্ঞ লোকেরা এই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয় যে, উম্মাত রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কোন জিনিসই নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়নি।

২. ত্রুটি বের করার উদ্দেশ্যে হাদীস ভান্ডারে শুদ্ধি অভিযান চালানো–ঠিক সেই ভাবে যেভাবে আর্য সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারীরা কখনও কুরআন মজীদে শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছিল এবং এমন এমন জিনিস বের করে বরং মনগড়াভাবে রচনা করে জনসাধারণের সামনে পেশ করা যাতে তাদের নিকৃষ্টভাবে প্রভাবিত করা যায় যে, হাদীসের গ্রন্থাবলী নেহায়েত লজ্জাজনক অথবা হাস্যকর উপাদানে প্লাবিত। অতপর অশ্রু বিসর্জনপূর্বক এই আবেদন পেশ

[illegible] যে, ইসলামকে অপমান থেকে বাঁচাতে হলে এই সমস্ত মূল্যহীন ভান্ডার সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।

৩. রসূলুল্লাহ (স)–এর রিসালাতের পদমর্যাদাকে শুধুমাত্র একজন ডাকপিয়নের পদ সাব্যস্ত করা যার দায়িত্ব কেবলমাত্র জনগণের নিকট কুরআন সংবাদ পৌঁছে দেয়া।

৪. শুধুমাত্র কুরআন মজীদকে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতকে ইসলামী আইন ব্যবস্থার আওতা থেকে বহিস্কৃত করা।

৫. উম্মাতের সকল আলেম, ফকীহ্ (আইন শাস্ত্রবিদ), মুহাদ্দিস (হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ) মুফাসসির (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং ভাষাবিশারদ ইমামগণকে অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা, যাতে মুসলমানগণ কুরআন মজীদের বক্তব্য হৃদয়ংগম করার জন্য তাদের শরণাপন্ন না হয়, বরং তাদের সম্পর্কে এই ভ্রান্তির শিকার হয় যে, তাঁরা সকলে কুরআনের যথার্থ শিক্ষাকে গোপন করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

৬. স্বয়ং একটি নতুন অভিধান রচনা করে কুরআন মজীদের সমস্ত পরিভাষাসমূহের অর্থের পরিবর্তন সাধন এবং কুরআনের আয়াতসমূহের এমন বিকৃত অর্থ আবিষ্কার করা যা পৃথিবীর যে কোনো আরবী ভাষাবিদের দৃষ্টিতে কুরআনের শব্দ থেকে বের করার কোনো অবকাশ নেই। (মজার ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি এই কাজ করছে তার সামনে যদি কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত স্বরচিহ্ন বাদ দিয়ে লিখে রাখা হয় তবে সে তা সঠিকভাবে পড়তেও সক্ষম নয়। কিন্তু তার দাবি এই যে, এখন স্বয়ং আরবরাই আরবী জানে না। তাই তাদের বর্ণিত অর্থ যদি কোন আরব কুরআনের শব্দভান্ডারে না দেখতে পায় তবে অপরাধ এই আরবদেরই)।

এই ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে সাথে একটা অভিনব ইসলামের বিনির্মাণ কাজও চলছে যার মৌলনীতি সংখ্যায় মাত্র তিনটি, কিন্তু দেখুন না তা কতটা তুলনাহীন মৌলনীতি (!)ঃ

১. প্রথম মূলনীতি এই যে, সমস্ত ব্যক্তিমালিকানা খতম করে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে ন্যস্ত করা হবে এবং সেই সরকার জনগণের মধ্যে রিযিক বন্টনের সর্বময় কর্তা হবে। এর নাম 'প্রতিপালন ব্যবস্থা' এবং বলা হয়ে থাকে যে, এই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই ছিল কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিগত তের শতাব্দী ধরে কারো পক্ষেই তা বুঝে উঠার সৌভাগ্য হয়নি। শুধুমাত্র অতি

বুযুর্গ কার্ল মারক্স এবং তার বিশিষ্ট খলীফা এঞ্জেলসই কুরআনের এই মৌল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

২. তাদের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, সমস্ত দল-উপদলের বিলুপ্তি সাধন করতে হবে এবং মুসলমানদের কোন দল গঠনের অনুমতিই দেয়া হবে না, যাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে অসহায় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে চায় তবে যেন অসংগঠিত থাকার ফলে তা করতে সক্ষম না হয়।

৩. তাদের তৃতীয় মূলনীতি এই যে, কুরআন মজীদে যে "আল্লাহ ও রাসূলের" উপর ঈমান আনার, যাদের আনুগত্য করার এবং যাদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার দ্বারা মূলত বুঝানো হয়েছেঃ ''জাতির কেন্দ্র'' (কেন্দ্রীয় সরকার)। সরকারই যেহেতু স্বয়ং "খোদা আর খোদার রসূল" তাই এই কেন্দ্রীয় সরকার কুরআনের যে অর্থই করবে তাই হবে তার আসল অর্থ। তার কোন নির্দেশ বা বিধান সম্পর্কে এই প্রশ্ন মোটেই তোলা যাবে না যে, তা কুরআনের পরিপন্থী। সে যা কিছু হারাম করবে তাই হারাম, যা কিছু হালাল করবে তাই হালাল। তার নির্দেশই হচ্ছে শরীআত এবং ইবাদত থেকে শুরু করে পারস্পরিক কার্যক্রম পর্যন্ত যে জিনিসের যে নমুনা সে প্রস্তাব করবে তা মান্য করা ফরজ, বরং ইসলামের শর্ত। যেভাবে 'রাজা' ভুল করতে পারে না, অনুরূপভাবে এই 'জাতির কেন্দ্র'ও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পবিত্র। জনগণের কাজ কেবল তার সামনে মাথা পেতে দেয়া। কারণ "আল্লাহ ও রসূল" না সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, আর না তাদের দ্বারা ভুল করার প্রশ্ন উঠতে পারে, আর না তাদের পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এই নতুন ইসলামের "প্রতিপালন ব্যবস্থার" উপর ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা এখনও অনেক কম। কিন্তু তার অবশিষ্ট সকল পুনর্গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক শাখাগুলো কতিপয় বিশিষ্ট পরিমন্ডলে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের শাসকদের নিকট তাদের "জাতির কেন্দ্র" শীর্ষক মতবাদ বহুত আবেদন সৃষ্টি করেছে। তবে এই শর্তে যে, তারা নিজেরাই "জাতির কেন্দ্র"। এটাও তাদের খুবই জনপ্রিয় যে, সমস্ত উপায়-উপকরণ থাকবে তাদের হাতে এবং জাতি সম্পূর্ণরূপে অসংগঠিত অবস্থায় তাদের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকবে। আমাদের বিচারক মন্ডলী ও আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকদের একটি দল তা এজন্য পছন্দনীয় মনে করে যে, বৃটিশ রাজত্বকালে তারা যে ধরনের আইন ব্যবস্থার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছে তার মূলনীতি, বুনিয়াদী দৃষ্টিভংগী ও আনুষংগিক বিধানের সাথে ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ আইন ব্যবস্থার পদে পদে সংঘর্ষ

...ছে এবং তার উৎস সম্পর্কেও তাদের কোন জ্ঞান নেই। এই কারণে উপরোক্ত মতবাদ তাদের নিকট খুবই পছন্দনীয় লাগল যে, সুন্নাহ্ ও ফিক্হ-এর ঝঞ্ঝাট থেকে তারা মুক্তি পেয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র কুরআন অবশিষ্ট থাকবে যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আধুনিক অভিধানের সাহায্যে এখন আরও সহজতর হয়ে গেছে। তাছাড়া পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমস্ত লোককে এই মতবাদ নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে। কারণ ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়েও মুসলমান থাকার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যবস্থাপত্র এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা ছাড়াও তাদের জন্যে এর চেয়ে অধিক খুশীর কথা আর কি হতে পারে যে, যা কিছু পাশ্চাত্যে হালাল কিন্তু "মোল্লা-মৌলভীর ইসলামে" এতোদিন পর্যন্ত হারাম ছিল তা এখন হালালও হয়ে যাবে এবং হালাকারীদের অনুকূলেই কুরআনের প্রমাণও বিদ্ধমান পাওয়া যাবে?

আমি বিগত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে এই ফেতনার মূলোচ্ছেদের জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখেছি যা আমার বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এখন এই গ্রন্থে যেসব প্রবন্ধ স্থান পাচ্ছে তা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আমার ও ডকটর আবদূল ওয়াদুদ সাহেবের মধ্যে "সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা" সম্পর্কে যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক পত্রালাপ হয়েছিল তার সবগুলো একত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন সদস্য বিচারপতি মুহাম্মাদ শফী সাহেবের একটি সিদ্ধান্ত উধৃত করা হচ্ছে। তিনি ১৯৬০ সালের ২১ জুলাই রাশীদা বেগম বনাম শিহাবুদ্দীন গং-এর মামলায় এই রায় প্রদান করেন এবং আমি এর বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করেছি।

এই দুই অধ্যায়ে পাঠকগণ একদিকে হাদীস অস্বীকারকারীদের সমস্ত প্রশ্ন ও যুক্তি-প্রমাণ তাদের ভাষায় শুনতে পাবেন এবং অপরদিকে তারা এও জানতে পারবেন যে, দীন ইসলামের সার্বিক ব্যবস্থা ও কাঠামোতে সুন্নাহ্র আসল মর্যাদা কি। এরপর পাঠক কোন্ মত গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার নিজের দায়িত্ব।

যেসব বিদগ্ধ পাঠকের হাতে আমার এ গ্রন্থটি পৌছবে তাদের নিকট আমি একটি বিশেষ আবেদন রাখতে চাই। তা হল, এই আলোচনা দীন ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে কোন একটি দিক বর্জন এবং অপর দিক গ্রহণের পরিণতি সুদূরপ্রসারী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দীন ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে এই বিতর্ক আমাদের দেশে শুধুমাত্র ছড়িয়েই পড়েনি, বরং এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। আমাদের ক্ষমতাসীন মহলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুন্নাত প্রত্যাখ্যানের মতবাদে

বিভ্রান্ত হচ্ছে। আমাদের উচ্চ বিচারালয়সমূহের বিচারকগণ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে, এমনকি হাইকোর্ট থেকে সম্পূর্ণত সুন্নাহ্ অস্বীকার করার ভিত্তির উপর একটি রায়ও প্রদান করা হয়েছে। কে জানে এই রায়কে ভবিষ্যতে কতো মোকদ্দমায় নযীর হিসাবে পেশ করা হবে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এবং বিশেষত সরকারী দফতরসমূহে এই অশুভ আন্দোলন সংগঠিতভাবে চলছে। তাই জরুরী প্রয়োজন মনে করছি, যাদের নিকট এই গ্রন্থখানা পৌছবে শুধুমাত্র আপনারা নিজেরাই যেন তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত না হন, বরং তা অধ্যয়নের জন্য অন্যদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করুন, চাই তারা সুন্নাহ্ গ্রহণকারীই হোক অথবা অস্বীকারকারী। যে ব্যক্তি যেরূপ চায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। কিন্তু শুধু একতরফা অধ্যয়নপূর্বক নিজের একটি দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্যে আমল দিতে অস্বীকার করা কোন শিক্ষিত লোকের জন্য শোভনীয় নয়। এই গ্রন্থে যেহেতু দুই পক্ষের বক্তব্যই বিস্তারিতভাবে এসে গেছে তাই আশা করা যায়, এটা সুন্নাহ্ গ্রহণকারী ও সুন্নাহ্ প্রত্যাখ্যানকারী উভয় দলকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করবে।

লাহোর, ৩০ জুলাই, ১৯৬১ খৃ.

বিনীত

আবুল আ'লা

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রবিনিময়

(বায়্মে তুলূয়ে ইসলাম' শীর্ষক মাসিক পত্রিকার একজন প্রসিদ্ধ সদস্য জনাব ডকটর আবদুল ওয়াদূদ এবং এই গ্রন্থকারের মধ্যে সুন্নাহ্কে ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল এখানে তা উদ্ধৃত করা হল)।

ডকটর সাহেবের প্রথম পত্র

মাখদূম ও মুহ্তারাম মাওলানা! আপনি দীর্ঘজীবি হোন।

আসসালামু আলাইকুম। সংবিধান প্রণয়নের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি সৎ মুসলমানের দীনী আশা-আকাংখার মৌলিক দাবী এই যে, পাকিস্তানের আইন ইসলামের স্থায়ী ও স্বকীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রণীত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হোক। এ প্রসংগে আইন কমিশনের প্রশ্নমালার জওয়াবে আপনার এবং অপরাপর বিশিষ্ট আলেমগণের এই অভিন্ন দাবীও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, পাকিস্তানের জন্য প্রণীত আইনের ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। "সুন্নাতের" বাস্তব গুরুত্বকেও আমি অস্বীকার করছি না এবং তার এই গুরুত্বকে খতম করার অভিপ্রায়ও আমার নেই। কিন্তু সুন্নাতকে যখন ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে তখন একটি সন্দেহ্ অবশ্যম্ভাবীরূপে মন-মগজে উত্থিত হয় এবং তার পরিণতিতে যেসব প্রশ্নের উদয় হয় তা আপনার সামনে পেশ করছি এবং আশা করছি আপনি প্রথম অবসরেই এই সন্দেহের অপনোদনকল্পে উত্তর প্রদান করবেন। প্রশ্নগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) আপনার মতে "সুন্নাত"-এর অর্থ কি? অর্থাৎ যেভাবে কিতাব বলতে কুরআন মজীদকে বুঝায় অনুরূপভাবে সুন্নাত (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাত)-এর অর্থই বা কি?

(২) আমাদের নিকট (কুরআনের মত) এমন কোন কিতাব আছে কি যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত ধারাবাহিকভাবে সুগ্রথিত হয়েছে? অর্থাৎ কুরআনের মত সুন্নাতেরও কোন মৌলিক ও অর্থবহ গ্রন্থ আছে কি?

(৩) রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের এই গ্রন্থের মূলপাঠ সকল মুসলমানের নিকট কি কুরআন মজীদের মূল পাঠের অনুরূপ গ্রহণযোগ্য ও সর্বসমর্থিত এবং সন্দেহ ও সমালোচনার উর্ধ্বে?

(৪) অনুরূপ কোন কিতাব যদি বর্তমান না থাকে তবে কুরআনের কোনো আয়াত বা আয়াতাংশ সম্পর্কে যেমন সহজেই বুঝা যায় যে, এটি কুরআন মজীদের আয়াত, তেমনি এটা কিভাবে জানা যাবে যে, অমুক কথা রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত কিংবা সুন্নাত নয়?

আমি আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি অন্তর ও দৃষ্টির পূর্ণ একাত্মতা সহকারে ইসলামী আইনকে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, এটাকে একজন মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকার করি। আমার এই অকৃত্রিম আবেদনের উদ্দেশ্য হলো, আমি চাই ইসলামী আইনের দাবী করতে গিয়ে ইসলামপ্রিয় লোকদের মন–মগজে তার একটি সুস্পষ্ট, অভিন্ন ও কার্যোপযোগী রূপরেখা বর্তমান থাকুক। যাতে দেশের ধর্মহীন বুদ্ধিজীবীরা পূর্ণ শক্তিতে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে যেরূপ তৎপর রয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য ইসলামপ্রিয় শক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। আইনের ব্যাপারে যেহেতু জনসাধারণের মনে পেরেশানী লক্ষ্য করা যায়, তাই তাদের অবহিতির জন্য আপনার প্রদত্ত উত্তর পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে আশা করবো তাতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না। ওয়াসসালাম।

বিনীত

আবদুল ওয়াদূদ

উত্তর

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

২১ মে, ১৯৬০ ঈসাঈ তারিখে আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন তা আজ আপনি প্রথম করেননি। ইতিপূর্বেই বিভিন্ন মহল থেকে তা উত্থাপিত হয়েছে এবং তার জওয়াবও আমি পরিষ্কার ভাষায় প্রদান করেছি।

বিভিন্ন মহল থেকে বারবার একই ধরনের প্রশ্নাবলীর পুনরাবৃত্তি করা এবং পূর্বের দেয়া উত্তরসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা কোন যুক্তিসংগত কথা নয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এ সম্পর্কে অনেক পূর্বেই আমি যে জবাব দিয়েছি তা আপনি অবহিত নন, তবে আমি আপনাকে তার বরাত বলে দিচ্ছি (দ্র. তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২০৯–২২০; ডিসেম্বর ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৬০–১৭০)। আপনি তা অধ্যয়নপূর্বক বিস্তারিতভাবে জানান যে, আপনার প্রশ্নাবলীর মধ্যে কোন্ প্রশ্নের জবাব সেখানে নাই এবং যেসব প্রশ্নের উত্তর বর্তমান আছে তার উপর আপনার কি আপত্তি আছে।

আপনি যদি আপনার এই পত্রের সাথে আমার ঐ উত্তরমালাও ছাপানোর ইচ্ছা রাখেন তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার উল্লেখিত প্রবন্ধদ্বয়ও হুবহু ছাপিয়ে দিন। কারণ মূলত আমার পক্ষ থেকে সেগুলিই আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব। এজন্য আপনি বলতে পারেন না যে, আমি আপনার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে অনীহা প্রকাশ করেছি।

বিনীত

আবুল আ'লা

ডকটর আবদুল ওয়াদূদ সাহেবের দ্বিতীয় পত্র

শ্রদ্ধেয় মাওলানা, আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনার পত্র পেয়েছি। পত্রোত্তরের জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি জানি, এই ধরনের প্রশ্নাবলী ইতিপূর্বেও বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু আমার জন্য বিশেষভাবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জবাব এ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

আপনি আপনার যেসব প্রবন্ধের প্রতি দিকনির্দেশ করেছেন তা আমি দেখেছি। কিন্তু আমাকে খুবই আফসোসের সাথে এই আবেদন করতে দিন যে, সেখানেও আমি আমার প্রশ্নাবলীর সুনির্দিষ্ট জবাব পাইনি। বরং তাতে আমার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সেখানে এমন কয়েকটি কথা আছে যা আপনার অন্যান্য প্রবন্ধের বিপরীত। যাই হোক বিতর্ক আমার উদ্দেশ্য নয় (আর না আপনার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তার দুঃসাহস আমি করতে পারি), বরং বক্তব্য অনুধাবনই আমার উদ্দেশ্য। তাই আপনার প্রবন্ধ পাঠে আমি যা কিছু অনুধাবন করতে পেরেছি তা নিম্নে পেশ করছি। আমি যদি সঠিক অনুধাবন করে

থাকি তবে তার স্বীকৃতি দিন, আর ভুল বুঝে থাকলে অনুগ্রহপূর্বক তার ব্যাখ্যা প্রদান করুন। এজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

১. আপনি বলেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন, অথবা কার্যত করেছেন, তাকে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত বলা হয়। এই বক্তব্য থেকে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

(ক) রসূলুল্লাহ (স) এই তেইশ বছরের জীবনে যেসব কথা ব্যক্তি হিসাবে বলেছেন অথবা কার্যত করেছেন তা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

(খ) 'সুন্নাত' হচ্ছে কুরআনের বিধান ও মৌলনীতির ব্যাখ্যা। কুরআন ব্যতীত দীন ইসলামের মূলনীতি অথবা বিধান নির্ধারণ করা যায় না এবং 'সুন্নাত' কুরআনের কোন নির্দেশ রহিত (মানসূখ) করতে পারে না।

(২) আপনি বলেছেন, এমন কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের সবই পূর্ণরূপে সংকলিত পাওয়া যেতে পারে এবং যার মূল পাঠ (মতন) কুরআন মজীদের মূল পাঠের মত সমস্ত মুসলমানের নিকট

(৩) আপনি আরও বলেছেন, হাদীসের বর্তমান সংকলনসমূহ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহ পৃথক করা যাবে। এজন্য হাদীসসমূহ যাচাইয়ের যে মূলনীতি পূর্ব থেকে স্থিরিকৃত আছে তা চূড়ান্ত নয়। রিওয়ায়াতের মূলনীতি ছাড়াও দিরায়াতের সাহায্য নেয়া যেতে পারে এবং যেসব লোকের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের দীর্ঘ চর্চার ফলে সুগভীর দূরদৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে তাদের দিরায়াতই গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) হাদীসসমূহের এভাবে যাচাই করার পরও একথা বলা যায় না যে, কুরআন যেমন আল্লাহ্‌র বাণী, এটাও তেমনি রসূলুল্লাহ (স)–এর বাণী।

আমি আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ওয়াসসালাম।

বিনীত

আবদুল ওয়াদূদ

উত্তর

মুহ্‌তারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনার চিঠি ২ মে, ১৯৬০ খৃ. তারিখে ডাক মারফত হস্তগত হয়েছে। এরপর আপনি পুনর্বার ২৮ মে একই

চিঠির প্রতিলিপি লোক মারফতও পাঠিয়েছেন। কিন্তু অবিরাম ব্যস্ততার কারণে এখন পর্যন্ত উত্তর দিতে পারিনি। এই অপারগতার জন্য আমি দুঃখিত।

আপনি আপনার পত্রে এই নিশ্চয়তা প্রদানে আমি আনন্দিত যে, পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আপনার উদ্দেশ্য নয়, বরং আপনি বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে চাচ্ছেন। আপনার মত ব্যক্তিত্বের নিকট আমি এটাই আশা করছিলাম। কিন্তু বিষয়টি বুঝার জন্য আপনি পত্র মাধ্যমে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা আপনার নিশ্চয়তা প্রদানের সাথে সামান্যতম সামঞ্জস্য রাখে, অন্তত আপনার চিঠি থেকে তা আমি অনুভব করতে পারছি না। আপনার ২১ মে তারিখের চিঠিটি বের করে পুনরায় পাঠ করুন। তাতে আপনি চারটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আমার সামনে রেখে সেগুলোর উত্তর চেয়েছিলেন। আমি ঐ তারিখেই সে পত্রের উত্তরে আপনাকে লিখেছিলাম, আপনি তরজমানুল কুরআনের ১৯৫৮ সনের জানুয়ারী সংখ্যা এবং ডিসেম্বর সংখ্যায় আমার অমুক অমুক প্রবন্ধ অধ্যয়নপূর্বক আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন যে, আপনার প্রশ্নাবলীর মধ্যে কোন্ প্রশ্নটির জবাব তাতে নেই এবং যেসব প্রশ্নের জবাব তাতে বর্তমান আছে তার উপর আপনার কি আপত্তি আছে। কিন্তু আপনি ঐসব প্রবন্ধ পাঠ করে আপনার প্রথম দিককার প্রশ্নাবলীর আলোকে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখার পরিবর্তে আরও কিছু প্রশ্ন যোগ করেছেন এবং এখন আপনি চাচ্ছেন যে, আমি এগুলোর উত্তর দেই। একটি আলোচনা শেষ করার পূর্বে আরেকটি আলোচনা উত্থাপন করা এবং কোন সমাপ্তি ছাড়া একইভাবে বক্তব্যের পর বক্তব্যের ধারা অব্যাহত রাখাটা কি বাস্তবিকই কোন বিষয় হৃদয়ংগম করার কোন পন্থা হতে পারে?

আপনার নতুন প্রশ্নাবলীর উপর আলোকপাত করার পূর্বে আমি চাই, আপনি আপনার প্রথম দিককার প্রশ্নাবলীর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন এবং স্বয়ং দেখুন, ঐ প্রশ্নগুলোর একেকটির কি উত্তর আপনি আমার সেসব প্রবন্ধে পেয়েছেন এবং তা কিভাবে উপেক্ষা করেছেন।

সুন্নাত কি?

আপনি চারটি প্রশ্ন এই কারণে উত্থাপন করেছেন যে, আমি আইন কমিশনের প্রশ্নমালার জবাব দিতে গিয়ে "ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসাবে সুন্নাতের উল্লেখ করেছিলা।" অন্য কথায় আপনার এই প্রশ্ন কয়টি "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদার" সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই প্রসংগে আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিলঃ

"আপনার মতে সুন্নাতের অর্থ কি? অর্থাৎ কিতাব বলতে যেভাবে কুরআন

মজীদকে বুঝায়, অনুরূপভাবে সুন্নাত (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর সুন্নাত) বলতে কি বুঝায়?”

এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার পূর্বেকার প্রবন্ধসমূহে দেখতে পেয়েছেন, তা এইঃ

“এই মুহাম্মাদী শিক্ষা সেই উচ্চতর আইন যা সর্বোচ্চ বিধানদাতার (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) মর্জি ও ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিধান মুহাম্মাদ (স) থেকে আমাদের নিকট দুইটি মাধ্যমে পৌঁছেছে। এক, কুরআন মজীদ যা অক্ষরে অক্ষরে মহান আল্লাহ্‌র বিধান ও তাঁর হেদায়াতের সমষ্টি। দুই, মুহাম্মাদ (স)-এর উসওয়া-ই হাসানা (অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ), অথবা তাঁর সুন্নাত যা কুরআন মজীদের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। মুহাম্মাদ (স) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পত্রবাহকই ছিলেন না যে, তাঁর কিতাব পৌঁছে দেয়া ব্যতীত তাঁর আর কোন দায়িত্ব ছিল না, বরং তিনি তাঁর নিয়োগকৃত পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা ও শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কানূনে ইলাহীর ব্যাখ্যা প্রদান করা, তার সঠিক উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেয়া, তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া। অতপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত জামায়াতের রূপ দান করে সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো। অতপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি সৎ ও সংশোধনকারী রাষ্ট্রের রূপ দান করে দেখিয়ে দেয়া যে, ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার উপর একটি পূর্ণাংগ সভ্যতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (স)-এর এই সমগ্র কাজই হচ্ছে সুন্নাত যা তিনি তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর এই সুন্নাত কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ আইন প্রণেতার উচ্চতর আইনের রূপায়ন ও পূর্ণতা বিধান করে। আর ইসলামী পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নাম শরীআত” -(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২১০-২১১)।

“এ এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নবূওয়াতের পদে সমাসীন হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র কুরআন মজীদ পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং একটি সামগ্রিক বিপ্লবও পরিচালনা করেন, যার ফলশ্রুতিতে একটি মুসলিম সমাজের জন্ম হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়া ছাড়াও মুহাম্মাদ (স) অন্য যে কাজটি করলেন তা শেষ পর্যন্ত কি হিসাবে করলেন? তা কি নবী হিসাবে করেছেন-যেখানে তিনি কুরআনের অনুরূপ আল্লাহর মর্জি ও

ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতেন? অথবা তাঁর নবূওয়াতী পদমর্যাদা কি কুরআন মজীদ পৌছে দেয়ার পর শেষ হয়ে গেছে এবং অতপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মত একজন মুসলমান হিসাবে থেকে যান–যাঁর কথা ও কার্যাবলী নিজের মধ্যে সরাসরি কোন আইনগত মর্যাদা রাখে না? প্রথম কথা স্বীকার করে নিলে সুন্নাতকে কুরআনের সাথে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় তাকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এ ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ (স) শুধুমাত্র পত্রবাহক ছিলেন না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন, যাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তন মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং যাঁর জিন্দেগীকে গোটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিবেক বুদ্ধি একথা মেনে নিতে সম্মত নয় যে, একজন নবী শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়ার সীমা পর্যন্তই নবী এবং তারপরে তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের চাইতে বেশী কিছু নন। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে এবং গোটা পৃথিবীতে মুহাম্মাদ (স)–কে অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় আদর্শ এবং তাঁর আদেশ–নিষেধকে বাধ্যতামূলক বলে মেনে নিয়েছে। এমনকি কোন অমুসলিম পন্ডিতও এই বাস্তব বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে না যে, মুসলমানগণ সর্বদা মুহাম্মাদ (স)–এর এই মর্যাদাই স্বীকার করে নিয়েছে আর এই কারণে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাতকে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এখন আমি বলতে পারছি না যে, কোন ব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদাকে কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে এ কথা না বলে যে, মুহাম্মাদ (স) কেবলমাত্র কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং এ কাজ সমাধা করার সাথে সাথেই তাঁর নবূওয়াতী মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া সে যদি এরূপ দাবী করেও তবে তাকে বলে দিতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (স)–কে এই মর্যাদা কি স্বয়ং সে দিচ্ছে, নাকি কুরআন তাঁকে এই মর্যাদা প্রদান করেছে? প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে তার বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে কুরআন থেকে নিজ দাবীর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করতে হবে”–(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২১৬–২১৭)।

এবার আপনি বলুন, “সুন্নাত বলতে কি বুঝায়” আপনার সে পশ্নের জবাব আপনি পেয়েছেন কি? আর আপনি জানতে পারছেন কি না যে, ইসলামী

আইনের ভিত্তি হিসাবে যে সুন্নাতের উল্লেখ করা হয় তা কি জিনিস? অন্যান্য প্রশ্ন উথাপনের পূর্বে আপনাকে একথা পরিষ্কার করতে হবে যে, আপনার মতে রসূলুল্লাহ (স) কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া ছাড়াও দুনিয়াতে আরও কোন কাজ করেছেন কি না, যদি করে থাকেন তবে তা কি হিসাবে করেছিলেন? যদি আপনার মতে এই কাজ করে দেয়ার পর মহানবী (স) সাধারণ মুসলমানদের মতই একজন মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কথা ও কাজে তাঁর নবী সুলভ মর্যাদা ছিল না, তাহলে আপনি একথা পরিষ্কার করে বলুন এবং এটাও বলে দিন যে, আপনার এই মতের উৎস কি? এটা কি আপনার মনমগজ প্রসূত কথা, নাকি কুরআনে এর সমর্থনে কোন প্রমাণ আছে? আপনি যদি একথা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা, বিচারক, শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে মহানবী (স) একটি মুসলিম সমাজ গঠন করার এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং চালিয়ে দেখানোর যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাতে তাঁর একজন নবীসুলভ মর্যাদা ছিল, তবে তা সেই সুন্নাত কি না ইসলামে যার আইনের ভিত্তি হিসাবে মর্যাদা থাকা উচিৎ? এটা পরের কথা যে, এই সুন্নাত কোন্ জিনিসের উপর প্রয়োগ হয় এবং কোন্ জিনিসের উপর প্রয়োগ হয় না। প্রথমে তো আপনাকে একথা পরিষ্কার বলতে হবে যে, কুরআন মজীদ ছাড়াও রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত স্বয়ং কোন জিনিস কি না? এবং সেটাকে আপনি কুরআনের পাশাপাশি আইনের উৎস হিসাবে স্বীকার করেন কি না? যদি তা স্বীকার না করেন তবে তার অনুকূলে আপনার প্রমাণ কি? এই মৌলিক কথা যতক্ষণ না সুস্পষ্ট হবে ততক্ষণ আপনার দ্বিতীয় পত্রে উথাপিত প্রশ্নাবলীর উপর আলোকপাত করে কি লাভ?

সুন্নাত কি অবস্থায় বর্তমান আছে?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "কুরআনের অনুরূপ আমাদের এখানে কি এমন কোন গ্রন্থ বর্তমান আছে যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত ধারাবাহিকভাবে মওজুদ রয়েছে? অর্থাৎ কুরআনের মত সুন্নাতের কি পূর্ণাংগ কোন কিতাব আছে?"

এই প্রশ্নের জবাবও আমার উধৃত প্রবন্ধে বর্তমান ছিল এবং আপনি তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে থাকলে এর জবাবও পেয়ে থাকবেন। আমি পুনরায় তা এখানে তুলে দিচ্ছি যাতে আপনি পূর্বে পেয়ে না থাকলে এখন তা পেয়ে যান।

"সুন্নাতকে স্বয়ং আইনের উৎস হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার পর এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর উত্তরে আরজ করব, আজ

চৌদ্দশত বছর অতীত হওয়ার পর আমরা প্রথমবারের মত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যিনি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কি সুন্নাত রেখে গিয়েছিলেন? দুটি ঐতিহাসিক সত্য অনস্বীকার্যঃ

এক, কুরআন মজীদের শিক্ষা এবং মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাতের ভিত্তিতে ইসলামের সূচনাতে যে সমাজ প্রথম দিন কায়েম হয়েছিল তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে জীবন্ত রয়েছে, তা গোটা জীবনকালে এক দিনের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং তার সবগুলো প্রতিষ্ঠান এই সমগ্রকালে উপর্যুপরি কর্মতৎপর থাকে। আজ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, নৈতিক মূল্যবোধ (value), ইবাদাত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, জীবনদর্শন ও জীবনপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে যে গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যার মধ্যে মতভেদের তুলনায় ঐক্য ও মিলনের উপাদান অধিক পরিমাণে বর্তমান, যা তাদেরকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সত্ত্বেও একই উম্মাত হিসাবে গেথে রাখার সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বুনিয়াদী কারণ হয়ে রয়েছে-তা প্রমাণ করে যে, এই সমাজকে কোন একক সুন্নাতের উপরই কায়েম করা হয়েছিল এবং সেই সুন্নাত এই দীর্ঘ কালের পরিক্রমায় ক্রমাগতভাবে অব্যাহত রয়েছে। এটা কোন লুপ্ত জিনিস নয় যার অন্বেষণের জন্য আমাদের অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে জানতে চেষ্টা করে যে, প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত কি এবং নতুন কি জিনিস কোন্ কৃত্রিম পন্থায় তাদের জীবন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করছে। যেহেতু সুন্নাত তাদের নিকট আইনের মর্যাদা সম্পন্ন এবং এর ভিত্তিতে তাদের বিচারালয়সমূহে রায় প্রদান করা হতো এবং তার ভিত্তিতে তাদের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হতো, তাই এর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই বিশ্লেষণের উপায়-উপকরণ এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রাথমিক খিলাফত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করেছি এবং কোন বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রতিটি বংশধরের (generation) সম্পাদিত কাজ সংরক্ষিত রয়েছে।

এই দুটি সত্যকে যদি কেউ উত্তমরূপে অনুধাবন করে এবং সুন্নাতকে জানার মাধ্যমসমূহ যথারীতি অধ্যয়ন করে তবে সে কখনও এমন সন্দেহের শিকার হতে পারে না যে, আজ হঠাৎ সে এক অসমাধানযোগ্য সমস্যার

সম্মুখীন হয়েছে”-(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮খৃ., পৃ. ২১৮)।

একই বিষয়ের উপর পুনর্বার আলোকপাত করতে গিয়ে আমি আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধে , যার বরাতও আগেই আপনাকে দিয়েছি, লিখেছিলাম যেঃ

“মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর নবূওয়াতী জিন্দেগীতে মুসলমানদের জন্য শুধুমাত্র একজন পীর-মুরশিদ ও ধর্মীয় বক্তাই ছিলেন না, বরং কার্যত নিজের জামাআতের নেতা, পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষক সবকিছুই ছিলেন এবং আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সম্পূর্ণ গঠন তাঁরই নির্দেশিত, শিখানো এবং নির্ধারিত পন্থায় হয়েছিল। এজন্য কখনও এটা হয়নি যে, তিনি নামায, রোযা ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদির যে শিক্ষা দান করে থাকবেন কেবল তাই মুসলমানদের মধ্যে চালু আছে এবং অন্যান্য সব কথা তারা কেবল ওয়াজ-নসীহত হিসাবে শুনেই ক্ষান্ত থাকবেন। বরং বাস্তবে যা ঘটেছে তা এই যে, যেভাবে তাঁর শিখানো নামায সাথে সাথে মসজিদে চালু হয় এবং জামাআতসমূহও কায়েম হতে থাকে, ঠিক সেভাবেই বিবাহ-শাদী, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে আইন-কানুন তিনি নির্ধারণ করেন, মুসলিম পরিবারগুলোতে তার বাস্তব অনুসরণ শুরু হয়ে যায়। লেনদেন ও আদান-প্রদানের যে নিয়ম-কানুন তিনি নির্ধারণ করে দেন, বাজারসমূহে তার প্রচলন হয়ে যায়। মোকদ্দমাসমূহের যে রায় তিনি প্রদান করেন তাই রাষ্ট্রীয় বিধান হিসাবে স্বীকৃতি পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সাথে তিনি যে আচরণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে বিজীত এলাকার জনগণের সাথে তিনি যে আচরণ করেন তা-ই মুসলিম রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয় এবং সার্বিকভাবে ইসলামী সমাজ ও তার জীবন ব্যবস্থা তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাসহ সেইসব সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বয়ং তিনি যার প্রচলন করেন অথবা পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে যেগুলোকে বহাল রেখে তিনি ইসলামী সুন্নাতের অংশে পরিণত করেন।

এগুলো ছিল জ্ঞাত, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সুন্নাত যেগুলো মসজিদ থেকে শুরু করে পরিবার, বাজার, বিচারালয়, রাজপ্রাসাদ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত মুসলমানদের সামাজিক জীবনের সমস্ত শাখা ও বিভাগ মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই কার্যকর হতে থাকে এবং পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো তার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিগত শতক পর্যন্ত তো এসব প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক সূত্র একদিনের জন্যও কর্তিত হয়নি। এরপরে যদি কোনরূপ বিচ্ছিন্নতার

সূত্রপাত হয়ে থাকে তবে তা শুধুমাত্র সরকার, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ ইত্যাকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যত এলোমেলো হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। এসব সুন্নাতের ব্যাপারে একদিকে হাদীসের নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত এবং অন্যদিকে উম্মাতের অব্যাহত আমল, দুটিই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ–(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮খৃ., পৃ. ১৬৭)।

পুনরায় সামনে অগ্রসর হয়ে এ প্রসংগে আরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমি এও লিখেছিলামঃ

এসব জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ সুন্নাত ব্যতীত আরেক প্রকারের সুন্নাত এরূপ ছিল যা রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি, সেগুলো বিভিন্ন সময়ে মহানবী (স)–এর কোন সিদ্ধান্ত, বাণী, আদেশ–নিষেধ, মৌন সমর্থন[১] ও অনুমতি অথবা কাজ দেখে বা শুনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গোচরে এসেছিল এবং সাধারণ লোকেরা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি।

এসব সুন্নাতের জ্ঞান, যা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, উম্মাত সংগ্রহ করার অব্যাহত প্রচেষ্টা মহানবী (স)–এর ইন্তেকালের পরপরই শুরু করে দেয়। কারণ খলীফা, প্রশাসকবর্গ, বিচারকমন্ডলী, মুফতী ও জনসাধারণ সকলে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আগত সমস্যা সম্পর্কে কোন ফয়সালা অথবা কাজ নিজের রায় ও মাসআলা নির্গত করার ভিত্তিতে করার পূর্বে এটা জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন যে, এই প্রসংগে মহানবী (স)–এর কোন পথনির্দেশ বর্তমান আছে কি না। এই প্রয়োজনের তাগিদেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করা শুরু হয় যার নিকট সুন্নাতের কোন জ্ঞান ছিল। আর যার নিকটই এই জ্ঞান বর্তমান ছিল তিনি তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়া স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। এটাই হাদীস রিওয়ায়াতের সূচনা বিন্দু এবং ১১ হিজরী থেকে ৩য়–৪র্থ হিজরী শতক পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এই সুন্নাত একত্রিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। জাল হাদীস প্রণয়নকারীরা তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটানোর যত অপচেষ্টাই করেছে তা প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ করে দেয়া হয়। কারণ যেসব সুন্নাতের মাধ্যমে কোন জিনিস প্রমাণিত অথবা পরিত্যক্ত হত, যার ভিত্তিতে কোন জিনিস হারাম অথবা হালাল সাব্যস্ত হত, যার

১. মৌন সমর্থন মূলে রয়েছে 'তাকরীর'। এর অর্থ রসূলুল্লাহ (স) নিজের উপস্থিতিতে কোন কাজ হতে দেখলেন, অথবা কোন পন্থার প্রচলন হল এবং তিনি তা নিষিদ্ধ করেননি। অন্য কথায় তাকরীর–এর অর্থ কোন জিনিস বহাল রাখা–(গ্রন্থকার)।

ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করত অথবা কোন অপরাধী মুক্তি পেত, মোটকথা যেসব সুন্নাতের উপর আইন–কানূনের ভিত্তি ছিল সেগুলো সম্পর্কে সরকার, বিচার বিভাগ এবং ফতোয়া বিভাগের এতটা বেপরোয়া হওয়ার প্রশ্নই উঠে না যে, হঠাৎ দাঁড়িয়েই কোন ব্যক্তি "কালান–নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম" (নবী স. বলেন) বলে দিত আর একজন বিচারক, প্রশাসক অথবা মুফতী তা মেনে নিয়ে কোন হুকুম দিয়ে বসতেন। এজন্য যেসব সুন্নাত আইন–কানূনের সাথে সম্পর্কিত ছিল সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণরূপে অনুসন্ধান চালানো হয়। সমালোচনার কঠোর চালুনি দ্বারা তা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়। রিওয়ায়াতের মূলনীতির আলোকেও তা পরখ করা হয় এবং দিরায়াত (বুদ্ধি–বিবেচনা)–এর মূলনীতির আলোকেও। আর যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়েছে সেগুলোও সংকলিত করে রাখা হয়েছে, যাতে পরবর্তী কালেও প্রতিটি ব্যক্তি তা গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়"–(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৬৮–১৬৯)।

এই উত্তর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার পর এবার বলুন, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন কি না? হয়ত আপনি প্রতিউত্তরে বলতে পারেনঃ আপনি "কুরআনের অনুরূপ একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থের" নামই তো উল্লেখ করতে পারেননি, যার মধ্যে "রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত আছে। কিন্তু আমি বলব, আমার এই উত্তরের উপর এইরূপ আপত্তি একটি স্থূল বিতর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপনি কি এতটুকু কথাও বুঝতে পারেন না যে, একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র একটি সুবিন্যস্ত আইনের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় না। বরং এই আইন গ্রন্থের সাথে সাধারণ প্রথা (Convention), ঐতিহ্য (tradition), নজির বা পূর্বদৃষ্টান্ত (precedent), বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থাপনা আইন, নৈতিক নির্দেশনা ইত্যাদির একটি দীর্ঘ ধারাক্রমও থাকে যা আইন গ্রন্থের ভিত্তিতে কার্যত একটি জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফল। এই জিনিস একটি জাতির জীবন ব্যবস্থার প্রাণসত্তা যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র না আইন গ্রন্থ তার জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র পেশ করতে পারে, আর না তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। আর এই জিনিস পৃথিবীর কোথাও কোন একটি গ্রন্থে সুবিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে না, থাকতেও পারে না। আর এই ধরনের একটি গ্রন্থের অভাব থাকার অর্থ এই নয় যে, এই জাতির নিকট উক্ত আইন গ্রন্থ ব্যতীত কোন রীতিনীতি বা আইন–

কানূন বর্তমান নাই। আপনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা অথবা দুনিয়ার অপর কোন জাতির সামনে একথা বলে দেখুন যে, তোমাদের নিকট তোমাদের রচিত আইন (Codified Law) ব্যতীত যা কিছুই আছে তা সবই অনির্ভরযোগ্য এবং তোমাদের সমস্ত প্রথা–ঐতিহ্য প্রভৃতি হয় একটি গ্রন্থের আকারে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে অন্যথায় সেগুলোকে আইনগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করতে হবে। অতপর আপনি নিজেই জানতে পারবেন, আপনার এই কথা কতটা গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী হয়।

নবী যুগের প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্য, নজির, সিদ্ধান্তসমূহ, আইন–কানূন ও নির্দেশাবলীর পূর্ণ রেকর্ড একটি গ্রন্থের আকারে সুবিন্যস্ত পাওয়া উচিৎ ছিল কেউ যদি এরূপ দাবী করে, তাহলে তা মূলত একটি নিরেট অবাস্তব চিন্তা এবং এমন ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে, যে কল্পনার জগতে বাস করে। আপনি প্রাচীন কালের আরবদের অবস্থা বাদ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য আজ এই যুগের অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যখন ঘটনাবলী ও অবস্থা রেকর্ড করার উপায়–উপকরণসমূহের অস্বাভাবিক রকম উন্নতি হয়েছে। মনে করুন এই যুগে এমন কোন নেতা আছেন যিনি ২৩ বছর পর্যন্ত রাতদিনের ব্যস্ত জীবনে এক মহান বিপ্লব সংগঠিত করেন। হাজার হাজার লোককে শিক্ষা–প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের উদ্দীষ্ট বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করেন, তাদের কাজে লাগিয়ে গোটা দেশের চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপ্লব সাধন করেন, নিজের নেতৃত্ব ও পরিচালনার মাধ্যমে একটি নতুন সামজ এবং একটি নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। এই সমাজে তার ব্যক্তিত্ব প্রতিটি মুহূর্তে হেদায়াতের একটি স্থায়ী নমুনা হিসাবে বিরাজ করে। সর্বাবস্থায় লোকেরা তাকে দেখে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, কি করা উচিত আর কি করা উচিৎ নয়। সর্বস্তরের লোক রাতদিন তার সাথে মিলিত হতে থাকে এবং তিনি তাদেরকে আকীদা–বিশ্বাস, চিন্তাধারা, চরিত্র নৈতিকতা, ইবাদত বন্দেগী, লেনদেন, আচার–ব্যবহার মোটকথা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে মৌলিক দিকনির্দেশও দিয়ে থাকেন এবং আনুষংগিক ব্যাপারেও। তাছাড়া রাষ্ট্রের পরিচালক, বিচারক, আইন প্রণেতা, পরিকল্পনাকারী এবং সেনানায়কও তিনি হয়ে থাকেন এবং দশ বছর পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের বিভাগসমূহকে তিনি নিজের মৌলনীতির উপর স্থাপন করেন এবং তার ভিত্তিতে নিজে তা পরিচালনা করেন। আপনি কি মনে করেন, আজ এই যুগেও এই সমস্ত কাজ কোন একটি দেশে সম্পাদিত হলে তার সমস্ত রেকর্ড "একটি গ্রন্থের" আকারে সংকলিত হতে পারে? সব সময় কি এই নেতার সাথে টেপ রেকর্ডার লাগিয়ে রাখা সম্ভব? প্রতিটি মুহূর্তে কি তার

দিনরাতের প্রতিটি গতিবিধি সংরক্ষণের জন্য তার পেছনে ক্যামেরা লাগিয়ে রাখা সম্ভব? যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এই নেতা লাখলাখ লোকের জীবনের উপর, গোটা সমাজের চেহারায় এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার উপর যে ছাপ রেখে গেছেন তা কি কোন সাক্ষ্যই নয় যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে? আপনি কি এই দাবী করবেন যে, এই নেতার ভাষণসমূহ শ্রবণকারী, তাঁর জীবনাচার অবলোকনকারী এবং তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী অসংখ্য লোকের প্রদত্ত রিপোর্ট সম্পূর্ণই অনির্ভরযোগ্য, কারণ স্বয়ং ঐ নেতার সামনে তা "একটি গ্রন্থাকারে" লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তিনি তার সত্যায়ন করেননি? আপনি কি বলবেন যে, তার বিচার বিভাগীয় ফয়সালা, তারা ব্যবস্থাপনা, আইন, তার আইনগত ফরমানসমূহ এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত যত তথ্য বিভিন্ন উৎসে ও বিভিন্ন আকারে বর্তমান আছে তার কোন মূল্য ও মর্যাদাই নেই, কারণ তা তো একটি "পূর্ণাংগ গ্রন্থরূপে" সংকলিত নেই?

এসব বিষয়ের উপর যদি বিতর্কের উদ্দেশ্যে নয় বরং বক্তব্য অনুধাবনের উদ্দেশ্যে চিন্তাভাবনা করা হয় তবে একজন বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি স্বয়ং অনুধাবন করতে পারবে যে, "একটি গ্রন্থের" এই দাবী কতটা অর্থহীন। এই ধরনের কথা একটি বদ্ধ কক্ষে বসে কতিপয় অর্ধ-শিক্ষিত ও প্রতারিত অনুসারীদের সামনে বলাবলি করলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু উন্মুক্ত ময়দানে শিক্ষিত মানুষের সামনে তা চ্যালেঞ্জ হিসাবে পেশ করা বড়ই দুঃসাহসের ব্যাপার।

সুন্নাত কি সর্বস্বীকৃত এবং তার যথার্থতা পরীক্ষার উপায় কি?

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন ছিলঃ "রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের সেই গ্রন্থখানির মূলপাঠ কি সব মুসলমানের নিকট কুরআন মজীদের মূল পাঠের মতো সর্বস্বীকৃত এবং সংশয়-সন্দেহ ও সমালোচনার উর্ধে?"

এবং চতুর্থ প্রশ্ন ছিলঃ "যদি এরূপ কোন গ্রন্থ বর্তমান না থাকে তবে যেভাবে সহজেই জানা যায় যে, এই বাক্য বা বাক্যাংশটুকু কুরআন মজীদের আয়াত, অনুরূপভাবে এটা কিভাবে জানা যাবে যে, অমুক কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত কি না?

উল্লেখিত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরের জন্য আমি আমার যেসব প্রবন্ধের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, যদি আপনি তা পাঠ করে থাকেন তবে সেখানে আপনি নিম্নোক্ত বক্তব্য অবশ্যই দেখে থাকবেনঃ

"নিসন্দেহে সুন্নাত সম্পর্ক তথ্যানুসন্ধান এবং তা নির্ণয় করতে গিয়ে

মতবিরোধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের মতবিরোধ কুরআন মজীদের অনেক হুকুম-আহ্‌কাম ও বক্তব্যের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়েও হয়েছে এবং হতে পারে। এ ধরনের মতবিরোধ যদি কুরআন মজীদ পরিত্যাগ করার অনুকূলে প্রমাণ না হতে পারে, তবে কী করে সুন্নাত পরিত্যাগ করার পক্ষে তাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এই মূলনীতি পূর্বেও স্বীকার করা হত এবং আজও স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই যে, যে ব্যক্তিই কোন নির্দেশকে কুরআনের অথবা সুন্নাতের নির্দেশ বলে দাবী করবে তাকে অবশ্যি তার বক্তব্যের অনুকূলে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তার বক্তব্য যথার্থ হয়ে থাকলে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অথবা অন্তত তাদের কোন বৃহৎ অংশের দ্বারা তা সীলমোহর করাতে হবে। আর যে কথা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অযথার্থ প্রমাণিত হবে তা অবশ্যি গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কোটি কোটি মুসলমান কোন একটি ফিকহী মাযহাবে দলবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের বৃহৎ বৃহৎ জনপদ কুরআনিক নির্দেশের কোন ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের কোন সংকলনের উপর নিজেদের সামগ্রিক জীবনের ব্যবস্থা কায়েম করেছে-(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২১৯)।

"মতবিরোধপূর্ণ সুন্নাত যদি স্বয়ং কোন উৎস ও প্রাধিকার (Authority) না হতে পারে, বরং যা কিছু মতবিরোধ হয়েছে তা এই বিষয়ে যে, কোন বিশেষ ব্যাপারে যে জিনিসকে সুন্নাত হওয়ার দাবী করা হয়েছে তা বাস্তবিক প্রামাণ্য সুন্নাত কি না, তবে কুরআন মজীদের আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণেও এরূপ মতভেদ হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তি এই বিতর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, কোন বিষয়ের যে হুকুম কুরআন মজীদ থেকে নির্গত করা হচ্ছে-তা মূলত কুরআন থেকে নির্গত হয় কি না? সম্মানিত পত্রলেখক স্বয়ং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই ধরনের মতভেদের সুযোগ সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং কুরআনকে আইনের উৎস ও প্রাধিকার হিসাবে মান্য করেন। প্রশ্ন হচ্ছে-অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে সুন্নাতের প্রমাণ ও তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং সুন্নাতকে আইনের উৎস ও প্রাধিকার স্বীকার করতে তাঁর এত সংশয় কেন?

একথা পত্রলেখকের মত একজন আইনজ্ঞের নিকট অজ্ঞাত থাকতে পারে না যে, কুরআন মজীদের কোন নির্দেশের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি, সংস্থা অথবা বিচারালয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা

প্রয়োগের পর শেষ পর্যন্ত যে ব্যাখ্যাকে বিধানের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, তার জ্ঞান ও কার্যসীমার মধ্যে ঐটিই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যদিও চূড়ান্তভাবে এই দাবি করা যায় না যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। সম্পূর্ণ এভাবেই সুন্নাতের পর্যালোচনার ইলমী উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে কোন বিষয়ে যে সুন্নাতই কোন ফকীহ অথবা আইন পরিষদ অথবা বিচারালয়ের নিকট প্রমাণিত হবে, তাই তার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স)-এর হুকুম, যদিও চূড়ান্তভাবে একথা বলা যায় না যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশ। এই উভয় অবস্থায় বিষয়টি যদিও বিতর্কিত থেকে যায় যে, আমার নিকট আল্লাহ্ তাআলা অথবা তাঁর রসূল (স)-এর নির্দেশ কি এবং আপনার নিকট কি, কিন্তু তথাপি আপনি এবং আমি যতখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-কে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ (Final Authority) মেনে নিচ্ছি তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর নির্দেশ আমাদের জন্য আইনবিধান কি না এবং সেগুলো অবশ্য পালনীয় কি না তা আমাদের নিকট বিতর্কিত বিষয় হতে পারে না"-(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৬২)।

"সুন্নাতের উল্লেখযোগ্য অংশের ব্যাপারে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি অংশে মতভেদ আছে। কতিপয় লোক কোন জিনিসকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং কতেকে তা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু এই ধরনের সব মতবিরোধ সম্পর্কে শত শত বছর ধরে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে আলোচনার ধারা অব্যাহত আছে এবং অতিশয় বিস্তারিতভাবে প্রতিটি দৃষ্টিকোণের সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি-প্রমাণ এবং যে মৌলিক উপাদানের উপর এই যুক্তির ভিত্তি রাখা হয়েছে তা সবই ফিক্‌হ ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্তমান আছে। কোন জিনিসের সুন্নাত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা আজ কোন শিক্ষিত লোকের জন্য কষ্টকর নয়। তাই আমার বুঝে আসে না যে, সুন্নাতের নামে কারো শংকিত হওয়ার কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে? অবশ্য যারা জ্ঞানবিজ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং যারা দূর থেকে হাদীসের মধ্যে মতবিরোধের কথা শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র"-(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৬৯)।

আমি আপনার উপরোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের জবাবে এই আলোচনা অধ্যয়নের পরামর্শ এই আশায় দিয়েছি যেন, একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি যিনি বক্তব্য অনুধাবনের আকাংখী, তা অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের প্রশ্নাবলীতে নিহিত মৌলিক ভ্রান্তিসমূহ অনুধাবনে সক্ষম হন এবং তিনি সরাসরি বুঝতে পারেন

না, সুন্নাতের পর্যালোচনায় মতপার্থক্য সুন্নাতকে আইনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, যেমন কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতভেদ কুরআনকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কিন্তু আপনি না এই ভ্রান্তি অনুভব করেছেন, আর না বক্তব্য হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করেছেন, বরং উল্টোদিকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছেন। আমি আপনার উত্থাপিত এসব প্রশ্নের উপর তো পরে আপত্তি তুলব, প্রথমে আপনি পরিষ্কার বলুন যে, আপনার মতে যদি শুধুমাত্র মতভেদমুক্ত জিনিসই আইনের উৎস হতে পারে তবে এই আসমানের নীচে পৃথিবীতে এমন কি জিনিস আছে যা মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাতে মানবীয় জ্ঞান মতভেদের কোন সুযোগ পায় না? আপনি কুরআন মজীদ সম্পর্কে এর অতিরিক্ত দাবী করতে পারেন না যে, তার মূলপাঠ সর্বস্বীকৃত এবং এর কোন আয়াত বা আয়াতাংশ কুরআনের আয়াত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। কিন্তু আপনি কি একথা অস্বীকার করতে পারেন যে, কুরআনের আয়াতসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবনের এবং তা থেকে বিবিধ নির্দেশ নির্গত. করার ক্ষেত্রে প্রচুর মতবিরোধ হতে পারে এবং হয়েছেও? যদি কোন আইনের আসল উদ্দেশ্য শব্দাবলীর মূলপাঠ বর্ণনা না হয়ে বরং বিধান বর্ণনা হয়ে থাকে তবে এই উদ্দেশ্যের বিচারে শব্দাবলীর (মূল পাঠ) ক্ষেত্রে ঐক্যমতে কি লাভ, যখন বিধান নির্ণয় করতে গিয়ে মতবিরোধ হয়ে যায় এবং সর্বদা হতে পারে? এজন্য হয় আপনাকে আপনার এই দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে হবে যে, "আইনের ভিত্তি কেবল এমন জিনিসই হতে পারে যার মধ্যে মতবিরোধের সুযোগ নাই" অথবা কুরআনকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে হবে। মূলত এই শর্ত সহকারে পৃথিবীতে কোন আইনই তো রচিত হতে পারে না। যেসব দেশের মোটেই কোন লিখিত সংবিধান (Written constitution) নাই (যেমন ব্রিটেন) তাদের সার্বিক ব্যবস্থার কি অবস্থা হতে পারে? বরং যাদের নিকট একটি লিখিত সংবিধান আছে তাদের মধ্যেও আইনের মূল পাঠেই কেবল মতৈক্য আছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যদি মতৈক্য থেকে থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক তা দেখিয়ে দিন।

চারটি মৌলিক সত্য

তাছাড়া আমার উল্লেখিত বক্তব্যে আরও কয়েকটি বিষয় রয়েছে যার প্রতি আপনি দৃষ্টিপাত না করে আসল সমস্যা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে পশ্চাদাপসরণ করতে দেব না, যতক্ষণ

না আপনি এসব বিষয় সম্পর্কে কোন পরিষ্কার বক্তব্য পেশ করছেন। হয় আপনি তা সহজভাবে স্বীকার করে নেবেন এবং নিজের অবস্থান পরিবর্তন করবেন, অথবা শুধুমাত্র দাবীর ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করুন। সেই বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(১) "সুন্নাতের বিরাট ও ব্যাপক অংশের উপর উম্মাতের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক ছাঁচ যেসব সুন্নাতের মাধ্যমে গঠিত হয় তার প্রায় সবগুলোতেই মতৈক্য রয়েছে। তাছাড়া যেসব সুন্নাতের উপর শরীআতের মূলনীতির ভিত্তি স্থাপিত সেসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতৈক্য বিদ্যমান। যেসব সুন্নাত থেকে আনুষংগিক বিধান নির্গত হয়েছে, অধিকাংশ মতভেদ কেবল সেই সুন্নাতগুলোকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। তারও সবগুলো মতবিরোধপূর্ণ নয়, বরং তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উপর উম্মাতের আলেমগণের মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। "মতভেদযুক্ত মাসআলাগুলোই বেশীর মঞ্চে উত্থাপন করা হয়েছে" এই কথা 'সুন্নাত সম্পূর্ণতই বিতর্কিত' এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্মাদ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞ লোকের দলের কখনও কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করে সর্বস্বীকৃত জিনিসকেও বিরোধপূর্ণ বানানোর অপচেষ্টা সুন্নাতের বিরাট অংশ সর্বস্বীকৃত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এধরনের গ্রুপ শুধুমাত্র সুন্নাতের উপর অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের মধ্যে কতেক কুরআন মজীদ তাহরীফ (বিকৃত) হওয়ার দাবী পর্যন্ত করেছে। কিন্তু এ ধরনের মুষ্টিমেয় লোকের অস্তিত্ব মুসলিম উম্মাতের সম্মিলিত মতৈক্য বাতিল করতে পারে না। এ ধরনের দুই চার শত বা দুই চার হাজার লোককে শেষ পর্যন্ত এই অনুমতি কেন দেয়া হবে যে, গোটা দেশের জন্য যে আইন রচিত হচ্ছে তার মধ্য থেকে এমন একটি জিনিসকে বাদ দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াবে যাকে কুরআনের পরে গোটা উম্মাত ইসলামী আইনের দ্বিতীয় ভিত্তি হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং সর্বকালে মেনে আসছে?

(২) আনুষংগিক বিধানের সাথে সম্পর্কিত যেসব সুন্নাতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে তার ধরনও এরূপ নয় যে, তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করে, বরং "পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কোটি কোটি মুসলমান কোন একটি ফিক্‌হ–ভিত্তিক মাযহাবের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের বৃহৎ বৃহৎ জনপদ কুরআনী বিধানের কোন একটি ব্যাখ্যার উপর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের কোন একটি সংকলনের উপর নিজেদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।" উদাহরণস্বরূপ আপনি আপনার নিজের

দেশ পাকিস্তানের দিকে তাকান যার আইন প্রণয়নের বিষয়টি আলোচনাধীন। আইনগত দিক থেকে এ দেশের গোটা মুসলিম জনবসতি মাত্র তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্তঃ হানাফী, শীআ ও আহ্‌লে হাদীস। এদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরআনিক বিধানের একটি ব্যাখ্যা এবং প্রামাণ্য সুন্নাতের একটি সংগ্রহ গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা কি গণতান্ত্রিক মূলনীতির ভিত্তিতে আইনের বিষয়টির এভাবে সমাধান করতে পারি না যে, ব্যক্তিগত (Personal) আইনের সীমা পর্যন্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কুরআনিক ব্যাখ্যা ও প্রামাণ্য সুন্নাতের সংকলন নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে, যা তারা অনুসরণ করছে, আর জাতীয় আইন (Public Law)-এর ক্ষেত্রে কুরআনের যে ব্যাখ্যা ও সুন্নাতের যে সংগ্রহের উপর অধিকাংশের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে?

(৩) "এটা কি করে জানা যাবে যে, অমুক কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস কি না"-এই প্রশ্ন সমাধানের অযোগ্য কোন প্রশ্ন নয়। যেসব সুন্নাত সম্পর্কে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যে, তা প্রামাণ্য কি না-"সেগুলোকে কেন্দ্র করে শত শত বছর ধরে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে প্রতিটি দৃষ্টিকোণের সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিপ্রমাণ এবং যার উপর এসব যুক্তির ভিত্তি রাখা হয়েছে তা সবই ফিক্‌হ ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে মওজুদ আছে। কোন জিনিসের সুন্নাত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা আজ আর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যেই কষ্টকর ব্যাপার নয়।

(৪) অতপর আইন-বিধানের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান হচ্ছেঃ "কুরআন মজীদের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি, সংস্থা অথবা বিচারালয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুপ্রসিদ্ধ ইলমী ও যৌক্তিক পন্থা প্রয়োগপূর্বক অবশেষে যে ব্যাখ্যাকে বিধানের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, তার জ্ঞান ও কর্মসীমার মধ্যে ঐটিই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যদিও চূড়ান্তভাবে এই দাবী করা যায় না যে, বাস্তবেও এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। সম্পূর্ণত এভাবেই সুন্নাত পর্যালোচনার বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করে কোন বিষয়ে যে সুন্নাতই কোন ফকীহ অথবা আইন পরিষদ অথবা বিচারালয়ের নিকট প্রমাণিত হবে তা তার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর হুকুম, যদিও চূড়ান্তভাবে একথা বলা যায় না যে, এটাই রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ।"

এখন আপনি নিজেই ঈমানদারীর সাথে নিজের বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আমার উধৃত বাক্যসমূহে আপনার সামনে যেসব বিষয় এসে গেছে তার

মধ্যে আপনি আপনার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন কি না? এর সম্মুখীন হয়ে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে একটি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক বক্তব্য পেশ করার পরিবর্তে আপনি আরও প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের যে চেষ্টা করেছেন তার যুক্তিসংগত কারণ কি যার উপর আপনার বিবেক আশ্বস্ত হতে পারে?

দ্বিতীয় পত্রের জওয়াব

এরপর আমি আপনার দ্বিতীয় চিঠিটি সামনে রাখছি। এই পত্রে আপনি অভিযোগ করেছেন, আপনার প্রথম চিঠির জওয়াবে আমি যেসব প্রবন্ধ নির্দেশ করেছিলাম তার মধ্যে আপনি আপনার প্রশ্নাবলীর সুনির্দিষ্ট উত্তর পাননি, বরং আপনার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি আপনার প্রশ্নাবলী সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করলাম তা পাঠ করে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, তার মধ্যে আপনি প্রতিটি প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট জওয়াব পেয়েছেন কি না এবং তাতে আপনার অস্থিরতা বৃদ্ধির আসল কারণ কি উল্লেখিত প্রবন্ধসমূহ না কি আপনার মন-মগজ?

আপনি আরও বলেছেন যে, উল্লেখিত প্রবন্ধে এমন কতগুলো কথা আছে যা আমার অন্যান্য প্রবন্ধের সাথে সাংঘর্ষিক। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, অনুগ্রহপূর্বক আমার সেসব প্রবন্ধের বরাত উল্লেখ করুন এবং বলুন যে, তার মধ্যে কোন্ বিষয়গুলো এই প্রবন্ধের বিপরীত। তবে আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি পশ্চাদাপসরণ করার জন্যে আরেকটি প্রশস্ত মাঠ খুঁজছেন। এজন্য আলোচনার ক্ষেত্রকে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখার খাতিরে এই জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আমি আবেদন করব, আমার অন্য প্রবন্ধের কথা আপাতত বাদ দিন, এখন আমি আপনার সামনে যেসব কথা পেশ করছি সে সম্পর্কে বলুন যে, তা আপনি কবুল করছেন না প্রত্যাখ্যান করছেন। যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে তার অনুকূলে যুক্তিগ্রাহ্য কি দলীল আপনার নিকট আছে?

চার দফার সারসংক্ষেপ

এরপর আপনি আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, এই পত্রালাপে আপনার উদ্দেশ্য বিতর্ক নয়, বরং বিষয়টি অনুধাবনই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। একথা বলার পর আপনি চার দফা আকারে আমার প্রবন্ধাবলীর নির্যাস নির্গত করে আমার সামনে পেশ করছেন এবং আমার নিকট দাবী করছেন, হয় আমি একথা স্বীকার করে নেব যে, আমার ঐসব প্রবন্ধের নির্যাস তাই, অথবা প্রমাণ করব যে, আপনি এসব প্রবন্ধের তাৎপর্য ভুল বুঝেছেন।

যেসব দফা আপনি নির্যাস আকারে আমার প্রবন্ধ থেকে বের করেছেন সে সম্পর্কে এখনই ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী আলোচনা করব। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে আমি আপনার নিকট আরয করব, আমার প্রবন্ধসমূহ থেকে আমি যেসব পয়েন্ট বের করে উপরে পেশ করেছি তার সামনে আপনার গৃহীত এই পয়েন্টগুলো রেখে আপনি নিজেই দেখুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে, যে মনমগজ ঐ পয়েন্টগুলোর পরিবর্তে এই পয়েন্টগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে তা কি বক্তব্য হৃদয়ংগম করার আকাংখী না বিতর্কপ্রিয় রোগী?

প্রথম দফা

আপনার বের করা প্রথম দফা হলোঃ "আপনি বলেছেন, মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন অথবা কার্যত করেছেন তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত বলা হয়। এই বক্তব্য থেকে দুটি জিনিস পাওয়া যাচ্ছেঃ

(ক) রসূলুল্লাহ (স) এই তেইশ বছরের জীবনে ব্যক্তি হিসাবে যেসব কথা বলেছেন অথবা কার্যত করেছেন তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(খ) সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের বিধান ও মূলনীতির ব্যাখ্যা। তা কুরআনের অতিরিক্ত দীন ইসলামের কোনো মূলনীতি অথবা বিধান প্রণয়ন করে না এবং সুন্নাত কুরআনের কোন নির্দেশও রহিত করতে পারে না।"

রসূলুল্লাহ (স)— এর কাজের ধরন

আমার বক্তব্য থেকে আপনি যে নির্যাস বের করেছেন তার প্রথম অংশই ভুল। আমার এসব প্রবন্ধের কোন্ স্থানে একথা লিখিত আছে যে, "মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন অথবা কার্যত করেছেন তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত বলা হয়?" বরং এর বিপরীতে আমি তো বলেছি যে, মহানবী (স)-এর নবূওয়াতী জীবনের সমস্ত কাজ যা তিনি তেইশ বছরে আঞ্জাম দিয়েছেন, কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এই সুন্নাত কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ সত্তার (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) মহান বিধানের গঠন ও পূর্ণতা প্রদান করে এবং এই সমগ্র কাজ মহানবী (স) যেহেতু নবী হিসাবে করেছেন, তাই তিনি এসব কাজে কুরআন মজীদের মতই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও মর্জির প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

আপনি যদি অন্যের বক্তব্যের মধ্যে আপনার নিজের ধারণা পড়তে অভ্যস্থ না হয়ে থাকেন তবে আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি যা কিছু বলেছি তা

অধ্যয়নপূর্বক দেখে নিন আমি কি বলেছিলাম এবং তাকে কি বানিয়ে দিয়েছেন।

অনন্তর আপনি তা থেকে যে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার উভয়টি এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আমার উক্ত বক্তব্যের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের পরিবর্তে একটি নতুন বিতর্কের পথ খুজেছেন। কেননা আপনার প্রথম প্রশ্ন ঐ বক্তব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না, আর আমিও আপনাকে আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধের বরাত এজন্য দেইনি যে, আপনি এই সমস্যার সমাধান তার মধ্যে অনুসন্ধান করবেন। তথাপি আমি আপনাকে একথা বলার সুযোগ দিতে চাই না যে, আমি আপনার নিক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে পশ্চাৎপদ হয়েছি। তাই আমি এই দুটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

মহানবী (স)— এর ব্যক্তিসত্তা ও নবূওয়াতী সত্তার মধ্যে পার্থক্য

(ক) ইসলামী শরীআতে একথা সম্পূর্ণ স্বীকৃত যে, মহানবী (স) রসূল হিসাবে যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন তা সবই সুন্নাত এবং তার অনুসরণ উম্মাতের জন্য বাধ্যতামূলক। আর তিনি ব্যক্তি হিসাবে যেসব কথা বলেছেন অথবা কার্যত যেসব কাজ করেছেন তা অবশ্যি সম্মানার্হ্য, কিন্তু তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব (রহ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"–য় "বাব বায়ানি আকসামি উলুমিন–নাবিয়্যি (সঃ)" শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাংগ ও অর্থবহ আলোচনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে একটি পূর্ণ অনুচ্ছেদই এই মূলনীতির আলোচনায় ব্যয় করেছেন এবং তার শিরোনাম দিয়েছেনঃ "বাব ওয়াজিবি ইমতিসালে মা কালাহু শারআন দূনা মা যাকারাহু (স) মিন মাআইশিদ–দুনয়া আলা সাবীলির–রায়" [অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স) শরীআতের বিধান হিসাবে যা বলেছেন তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক, পার্থিব ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে যা বলেছেন তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়]। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মহানবী (স)–এর ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে শেষ পর্যন্ত কে এই সিদ্ধান্ত নিবে যে, তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য এবং কোন্গুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের? প্রকাশ থাকে যে, আমরা স্বয়ং এই পার্থক্য ও সীমা নির্দেশ করার অধিকারী নই। এই পার্থক্য দুটি পন্থায়ই হতে পারে। হয় মহানবী (স) স্বয়ং তাঁর কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দিয়ে থাকবেন যে, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। অথবা মহানবী (স)–এর প্রদত্ত শিক্ষা থেকে শরীআতের যে মূলনীতি নির্গত হয় তার আলোকে প্রজ্ঞাবান, সতর্ক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ ব্যাপক বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে, তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ ধরনের কথা

ও কাজগুলো তাঁর নবূওয়াতী সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর কোন্ ধরনের কথা ও কার্যাবলীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফেলা যায়। এ বিষয়ে আমি আমার একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যার শিরোনাম হচ্ছে–"রসূলুল্লাহ (স)–এর ব্যক্তিসত্তা ও নবূওয়াতী সত্তা"–(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৯ খৃ.)।

কুরআনের অতিরিক্ত হওয়া এবং কুরআনের বিরোধী হওয়া সমার্থবোধক নয়

(খ) এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত যে, সুন্নাত কুরআনিক বিধান ও মূলনীতির ভাষ্যকার এই অর্থে যে, "তা কুরআনের অতিরিক্ত দীন ইসলামের কোনো মূলনীতি অথবা বিধান প্রণয়ন করে না।" আপনি যদি এর পরিবর্তে "কুরআনের পরিপন্থী" শব্দটি ব্যবহার করতেন তবে আমি শুধু ঐক্যমতই পোষণ করতাম না, বরং উম্মাতের সকল ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও এর সাথে একমত হতেন। কিন্তু আপনি "কুরআনের অতিরিক্ত" শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ কুরআনের অতিরিক্তই হতে পারে। আর একথা পরিষ্কার যে, "অতিরিক্ত" হওয়া এবং "পরিপন্থী বা বিপরীত" হওয়ার মধ্যে আসমান–জমীন পার্থক্য রয়েছে।[১] সুন্নাত যদি কুরআনের অতিরিক্ত কোন জিনিস না বলে তাহলে আপনি নিজেই চিন্তা করুন, এর প্রয়োজন কি? এর প্রয়োজন তো এজন্য যে, তা কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রতিভাত করে দেবে যা কুরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত হয়নি। যেমন কুরআন মজীদ "নামায কায়েমের" নির্দেশ দিয়েই থেমে যায়। একথা কুরআন বলে না বরং সুন্নাতই বলে দেয় যে, নামাযের অর্থ কি এবং তা কায়েমের অর্থই বা কি। এ উদ্দেশ্যে সুন্নাতই মসজিদ নির্মাণ, পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও জামাআতের সাথে নামায আদায়ের পন্থা, নামাযের ওয়াক্তসমূহ, নামাযের ধরন, তার রাকআত সংখ্যা, জুমুআ ও দুই ঈদের বিশেষ নামায এবং তার বাস্তব রূপ এবং আরও বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে আমাদের বলে দেয়। এসব কিছুই কুরআনের অতিরিক্ত, কিন্তু তার পরিপন্থী নয়।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, কোন হাদীসকে এমন অবস্থায় কুরআনের পরিপন্থী সাব্যস্ত করা যেতে পারে যখন কুরআন এক কাজ করার নির্দেশ দেয়, আর হাদীস তা করতে নিষেধ করে। অথবা কুরআন একটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলে কিন্তু হাদীস তা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু হাদীস যদি কুরআনের কোন সংক্ষিপ্ত নির্দেশের ব্যাখ্যা দান করে অথবা তা কার্যকর করার নিয়ম বলে দেয় এবং তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দেয়, তবে তা কুরআনের "পরিপন্থী" নয়, বরং কুরআনের "অতিরিক্ত"।

অনুরূপভাবে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সুন্নাত কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী মানবীয় চরিত্র ও নীতি–নৈতিকতা, ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় যে কাঠামো গঠন করেছে তা কুরআন থেকে এতটা অতিরিক্ত যে, কুরআনিক বিধানের আওতা থেকে সুন্নাতের পথনির্দেশনার আওতা অনেকটা প্রশস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে কুরআনের পরিপন্থী কিছু নেই, এবং যে জিনিসই বাস্তবিকপক্ষে কুরআনের পরিপন্থী হবে তাকে উম্মাতের ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের কেউ রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত বলে স্বীকার করেন না।

সুন্নাত কি কুরআন মজীদের কোন হুকুম রহিত (মানসূখ) করতে পারে?

এ প্রসংগে আপনি আরও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "সুন্নাত কুরআন মজীদের কোন হুকুম রহিত করতে পারে না।" একথা আপনি একটা ভুলের শিকার হয়ে লিখেছেন যা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। হানাফী মাযহাবের ফিক্হবিধগণ যে জিনিসকে "সুন্নাতের সাহায্যে কিতাবের হুকুম রহিতকরণ" نسخ الكتاب بالسنة পরিভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন তার অর্থ মূলত কুরআন মজীদের কোন সাধারণ হুকুমকে সীমাবদ্ধ (Qualify) করা এবং তার এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা (Explain) যা তার ভাষা থেকে প্রকাশ পায় না। যেমন, সূরা বাকারায় পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসীয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (আয়াত নম্বর ১৮০)। তাছাড়া সূরা নিসায় উত্তরাধিকার (সম্পত্তি) বন্টনের হুকুম নাযিল হল এবং বলা হল যে, এই অংশ মৃত ব্যক্তির ওসীয়াত পূর্ণ করার পর বন্টন করা হবে (আয়াত নম্বর ১১–১২)। এর ব্যাখ্যায় মহানবী (স), বলেন لا وصية لوارث - (ওয়ারিশদের জন্য ওসীয়াত করা যাবে না)। অর্থাৎ এখন ওসীয়াতের মাধ্যমে কোন ওয়ারিশের অংশে হ্রাসবৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ওয়ারিসদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এসব অংশের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি অসীয়াতের মাধ্যমে হ্রাসবৃদ্ধি করে তবে সে কুরআনের বিরোধিতা করল।

সুন্নাত এভাবে ওসীয়াতের সাধারণ অনুমতিকে, যা কুরআনের আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এমন হকদারের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যারা ওয়ারিশ হতে পারে না। একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আইনগতভাবে ওয়ারিশদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যে ওসীয়াতের এই সাধারণ অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করা যাবে না।

অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের উযু সম্পর্কিত আয়াতে (সূরা মাইদাঃ ৬) পা ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সেখানে কোন অবস্থাকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। মহানবী (স) মোজার উপর মাসেহ করে এবং অন্যদের তদ্রূপ করার অনুমতি প্রদান করে ব্যাখ্য দান করেন যে, এই হুকুম মোজা বিহীন পায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মোজা পরিহিত অবস্থায় পা ধৌত করার পরিবর্তে মাসেহ্ করলেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। এই জিনিসকে চাই 'রহিতকরণ' বলা হোক, অথবা 'ব্যতিক্রমকরণ' বলা হোক, কিংবা বলা হোক 'ব্যাখ্যাকরণ'–এর অর্থ তাই এবং এটা সস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য জিনিস। এর উপর আপত্তি তোলার শেষ পর্যন্ত কি অধিকার সেইসব লোকের রয়েছে যারা নবী না হওয়া সত্বেও কুরআন মজীদের কোন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশকে শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে "মধ্যবর্তী কালের বিধান" সাব্যস্ত করেন–যার পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই 'মধ্যবর্তী কাল' যখন তাদের অশুভ মতানুযায়ী অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন কুরআন মজীদের ঐসব বিধানও রহিত হয়ে যাবে।[১]

দ্বিতয়ি দফা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আপনি আমার প্রবন্ধ থেকে নির্গত করেছেন তা হলোঃ আপনি বলেছেন যে, "এমন কোন কিতাব নেই যার মধ্যে মহানবী (স)–এর সুন্নাত সম্পূর্ণ ও পূর্ণাংগভাবে সংকলিত আছে এবং যার মূল পাঠ সম্পর্কে কুরআনের মূল পাঠের মত সমস্ত মুসলমান একমত।"

আমার প্রবন্ধ থেকে আপনি এই যে নির্যাস বের করেছেন এ সম্পর্কে আমি কেবল এতটুকুই আরয করব যে, নিজের কল্পনায় ডুবে থাকা ব্যক্তিরা এবং যুক্তিসংগত কথা হৃদয়ংগম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তিরা অন্যদের বক্তব্য থেকে এ ধরনের নির্যাস বের করতে অভ্যস্ত। এই কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার এক নম্বর চিঠির উপর আলোচনাকালে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যা কিছু লিখেছি তা পুনরায় পড়ে নিন। আপনি নিজেই জানতে পারবেন যে, আমি কি বলেছি আর আপনি তার কি নির্যাস বের করেছেন?

১. জনাব পারভেয সাহেব কুরআন মজীদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানসহ ব্যক্তি মালিকানার বৈধতা প্রমাণকারী সমস্ত বিধানকে মধ্যবর্তী কালের বিধান সাব্যস্ত করেন। তার মতে কুরআনে হাকীমের এ সমস্ত বিধান তখনই রহিত হয়ে যাবে যখন পারভেয সাহেবের সকপোলকল্পিত "নিযামে রবূবিয়াত" (খোদায়ী ব্যবস্থা) কায়েম হয়ে যাবে।

তৃতীয় দফা

আপনার গৃহীত তৃতীয় দফায় "আপনি বলেছেন, হাদীসের বর্তমান ভান্ডার থেকে সহীহ্ হাদীস পৃথক করা যেতে পারে। এজন্য রিওয়ায়াতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে নীতিমালা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট আছে তা শেষ কথা নয়। রিওয়ায়াতের মূলনীতি ছাড়া দিরায়াতের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। যেসব লোকের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছে, তাদের দিরায়াতই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে।"

হাদীসসমূহ পরীক্ষা—নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত ও দিরায়ারেত প্রয়োগ

আপনি যে বাক্যগুলোর এই আশ্চর্যজনক ও চরমভাবে বিকৃত নির্যাস নির্গত করেছেন–আমি সেই বাক্যগুলো এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি, যাতে আমার বক্তব্যের অবিকল চিত্র সামনে আসতে পারে এবং মনগড়া নির্যাসের প্রয়োজন না থাকে।

"হাদীস শাস্ত্র فن حديث এই সমালোচনারই (অর্থাৎ ঐতিহাসিক সমালোচনা) অপর নাম। ১ম হিজরী শতক থেকে আজ পর্যন্ত এই শাস্ত্রের এই সমালোচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং কোনো ফকীহ্ অথবা মুহাদ্দিস এই কথার প্রবক্তা ছিলেন না যে, ইবাদত সংক্রান্ত হোক অথবা আচার-ব্যবহার ও লেনদেন সংক্রান্তই হোক-যে কোন বিষয় সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে সংযুক্তকারী কোন হাদীস ঐতিহাসিক সমালোচনা ব্যতিরেকেই প্রমাণ حجت-হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হবে। এই শাস্ত্র বাস্তবিকপক্ষে উপরোক্ত সমালোচনার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক যুগের উত্তম থেকে সর্বোত্তম ঐতিহাসিক সমালোচনাকেও অতি কষ্টে উপরোক্ত সমালোচনার যোগফল অথবা বিকশিত রূপ (Improvement) বলা যেতে পারে। বরং আমি বলতে পারি যে, হাদীসবেত্তাগণের সমালোচনার নীতিমালার মধ্যে এমন মাধুর্য ও সূক্ষ্মতা রয়েছে-যে পর্যন্ত বর্তমান কালের ইতিহাস সমালোচকগণের বুদ্ধিমত্তা এখনো পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে আমি প্রতিবাদের আশংকা ছাড়াই বলব যে, পৃথিবীতে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও জীবনাচার এবং তাঁর যুগের ইতিহাসের রেকর্ডই এমন যা মুহাদ্দিসগণের গৃহীত এই কড়া সমালোচনার মানদন্ডের পরীক্ষা সহ্য করতে পারত। অন্যথায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ এবং কোন যুগের ইতিহাসও সমালোচনার এরূপ কঠোর মানদন্ডের সামনে নিরাপদে টিকে থাকতে পারেনি

এবং তা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তথাপি আমি একথা বলব যে, আরও অধিক সংশোধন ও উন্নতির পথ রুদ্ধ নয়। কোন ব্যক্তি এই দাবী করতে পারে না যে, রিওয়ায়াত যাচাই করার যেসব মূলনীতি মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন তাই চূড়ান্ত। আজ যদি কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে এসব মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করার পর তার মধ্যে কোন স্থবিরতা ও ত্রুটি নির্দেশ করেন এবং অধিক সন্তোষজনক সমালোচনার জন্য কিছু মূলনীতি যুক্তিসংগত দলীল–প্রমাণসহ পেশ করেন তবে অবশ্যি তাকে স্বাগত জানানো হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কে না চাইবে যে, কোন জিনিসকে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত সাব্যস্ত করার পূর্বে তা প্রমাণিত সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে এবং কোন কাঁচাপাকা কথা যেন মহানবী (স)–এর সাথে সম্পর্কিত হতে না পারে।

হাদীসসমূহের যাচাই–বাছাই করার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতের সাথে দিরায়াতের ব্যবহারও একটি সর্বসমর্থিত জিনিস যার উল্লেখ সম্মানিত পত্রলেখক করেছেন .....অবশ্য এই প্রসংগে যে কথাটি সামনে রাখা উচিৎ এবং আমি আশা করি যে, মুহতারাম পত্রলেখকও ভিন্নমত পোষণ করবেন না, তা এই যে, কেবলমাত্র এমন লোকদের দিরায়াত গ্রহণযোগ্য হবে যাঁরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিক্হের অধ্যয়ন ও চর্চায় নিজেদের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালের অধ্যবসায় ও অনুশীলনে এক বিশেষ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে এবং যাদের জ্ঞানবুদ্ধি ইসলামী চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থার চৌহদ্দির বাইরের মতবাদ, মূলনীতি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে ইসলামী ঐতিহ্যকে ঐগুলোর মানদন্ডে পরখ করার ঝোঁক প্রবণতা নেই। নিসন্দেহে আমরা না বুদ্ধিজ্ঞানের ব্যবহারের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারি, আর না কারো জিভ টেনে ধরতে পারি। কিন্তু যাই হোক এটা নিশ্চিত ব্যাপার যে, ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা আনাড়ির মত কোন হাদীসকে মনোপূত পেয়ে গ্রহণ এবং কোন হাদীসকে নিজের মর্জি–বিরুদ্ধ পেয়ে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে অথবা ইসলাম–বিরোধী কোন চিন্তা ও কর্মব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত ব্যক্তিরা হঠাৎ উত্থিত হয়ে বিজাতীয় মানদন্ডের আলোকে হাদীসসমূহের গ্রহণ–বর্জনের পসরা বসায় তবে মুসলিম উম্মাহ্র নিকট তাদের দিরায়াত না গ্রহণযোগ্য হতে পারে আর না এই জাতির সামগ্রিক বিবেক ঐ ধরনের অর্থহীন বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের উপর কখনও আশ্বস্ত হতে পারে। ইসলামের সীমার মধ্যে তো কেবল ইসলামের আলোকে লালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞানবুদ্ধিই এবং ইসলামের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানই সঠিক কাজ করতে পারে। বিজাতীয় রং ও মেজাজে রঞ্জিত জ্ঞানবুদ্ধি অথবা

প্রশিক্ষণহীন জ্ঞান বিশৃংখলা সৃষ্টি ব্যতীত কোন গঠনমূলক কাজ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে করতে পারে না" (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮খৃ., পৃ. ১৬৪–১৬৬)।

উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে আপনি নিজেই আপনার গৃহীত নির্যাসের তুলনা করে দেখুন। আপনার সামনে উত্তমরূপে প্রতিভাত হয়ে যাবে যে, বক্তব্য হৃদয়ংগম করার আকাংখার কতটা উত্তম নমুনা আপনি পেশ করেছেন!

চতুর্থ দফা

আপনি আমার প্রবন্ধ থেকে চতুর্থ যে দফাটি নির্গত করেছেন তা হলোঃ

"হাদীসসমূহের এভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পরও এটা বলা যায় না যে, তা আল্লাহ্‌র কালামের মত সুনিশ্চিতভাবে রসূলুল্লাহ (স)–এর বাণী।"

এও আরেকটি অতুলনীয় নমুনা যা বিতর্কপ্রিয়তার পরিবর্তে বক্তব্য অনুধাবনের আকাংখা হিসাবে আপনি পেশ করেছেন। যে বাক্যসমূহ থেকে আপনি উপরোক্ত সারসংক্ষেপ নির্গত করেছেন তা হুবহু এখানে তুলে দেয়া হলঃ "কুরআন মজীদের কোন নির্দেশের একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি, অথবা সংস্থা অথবা বিচারালয় ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের প্রসিদ্ধ ইলমী পন্থা প্রয়োগের পর অবশেষে যে ব্যাখ্যাকে বিধানের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, তার জ্ঞান ও কার্যসীমার মধ্যে ঐটিই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যদিও চূড়ান্তভাবে এই দাবী করা যায় না যে, বাস্তবিকপক্ষে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। সম্পূর্ণ এভাবেই সুন্নাতের পর্যালোচনার ইলমী উপায়–উপকরণ ব্যবহার করে কোন বিষয়ে যে সুন্নাতই কোন ফকীহ্ অথবা আইন পরিষদ অথবা বিচারালয়ের নিকট প্রমাণিত মনে হবে তা তার জন্য রসূলুল্লাহ (স)–এর হুকুম, যদিও চূড়ান্তভাবে একথা বলা যায় না যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই রসূলুল্লাহ (স)–এর নির্দেশ।"

উপরোক্ত বক্তব্য যদিও আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু পুনরাবৃত্তি দূষণীয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তা পুনরায় উল্লেখ করলাম যাতে আপনি নিজেও আপনার নির্যাস নির্গত করার নৈপুণ্যের প্রতিষেধক দিতে পারেন। আর এই নৈতিক দুঃসাহসের প্রতিষেধক আমি নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে দিতেছি যে, আমার বক্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করে আমার সামনে পেশ করে আপনি বাস্তবিকই বাহাদুরি প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার যথার্থ মূল্য দিচ্ছি এবং সেই কথারও যা আপনার মত একজন বিবেকবান মানুষের কাছে আশা করা যায় না, কিন্তু হয়ত "বায্‌মে তুলূয়ে ইসলাম" পত্রিকাই আপনাকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশের দাবী

সবশেষে আমি আরজ করতে চাই যে, আপনার প্রথম চিঠি আপনি নিম্নোক্ত বাক্যে সমাপ্ত করেছেনঃ

"আইন প্রসংগে যেহেতু সর্বসাধারণের মনে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, তাই তাদের অবগতির জন্য যদি আপনার প্রদত্ত জওয়াব পত্রস্থ করা হয় তবে আমি আশা করি যে, এ ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না।"

আমি এ সম্পর্কে বলতে চাই, আপত্তি থাকা তো দূরের কথা আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, আপনি এই পত্রালাপ হুবহু পত্রিকায় ছাপিয়ে দিন। আমি নিজেও তা তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় ছাপিয়ে দিচ্ছি। আপনিও তা "তুলূয়ে ইসলাম" পত্রিকায় নিকটবর্তী কোন সংখ্যায় ছাপানোর ব্যবস্থা করুন, যাতে উভয় পক্ষের জনসাধারণ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে পেরেশানি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তরজমানুল কুরআন
জুলাই ১৯৬০ খৃ.

বিনীত
আবুল আ'লা

যথার্থ ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পার্থক্য

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে ডকটর আবদুল ওয়াদূদ সাহেব ও প্রবন্ধকারের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয় তা পাঠকগণের গোচরিভূত হয়েছে। এ সম্পর্কে ডকটর সাহেবের আরও একটি পত্র হস্তগত হয়েছে, যা নিম্নে গ্রন্থকারের জওয়াবসহ উল্লেখ করা হল]।

ডকটর সাহেবের পত্র

মুহতারাম মাওলানা!

আসসালামু আলাইকুম। ৮ আগষ্ট আপনার চিঠি পেয়েছি। আশা করি এরপর কিছুটা প্রসন্নতার সাথেই কথা বলা যাবে। আপনার ২৬ জুনের পত্রে আমার প্রথম পত্রের জওয়াবের সমাপ্তিতে আপনি বলেছিলেনঃ

"পরের প্রশ্নগুলো উত্থাপনের পূর্বে আপনার একথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার ছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও কাজ করেছিলেন কি না, যদি করে থাকেন তবে কি হিসাবে?"

অনন্তর একথাও লিখেছিলেনঃ "প্রথমে আপনাকে পরিষ্কার বলতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত স্বয়ং কোন জিনিস কি না? তাকে আপনি কুরআনের পাশাপাশি আইনের উৎস হিসাবে মানেন কি না, যদি না মানেন তার পেছনে আপনার যুক্তি কি?"

অতএব আমার বর্তমান পত্রে আলোচ্য বিষয়ের কেবল এই অংশ সম্পর্কে কথা বলাই যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে। আর এর অবশিষ্ট অংশের আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবি রাখলাম। আপনার হয়ত মনে আছে, আমার ২৬ মে তারিখের চিঠিতে আমি পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম, "আমি সুন্নাতের বাস্তব গুরুত্বকে না অস্বীকার করি, আর না তার গুরুত্বকে খতম করার কোন উদ্দেশ্য আমার আছে।"

অতএব "আমার মতে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত স্বয়ং কোন জিনিস কি না"–আপনার এরূপ প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য সুন্নাত বলতে যা বুঝায় এ ব্যাপারে আপনার সাথে আমার মতবিরোধ আছে। এখন অবশিষ্ট থাকল এই প্রশ্ন যে, আমি সুন্নাতকে কুরআনের পাশাপাশি আইনের উৎস হিসাবে স্বীকার করি কি না? এ প্রসংগে আমার উত্তর নেতিবাচক। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, এর সপক্ষে আমার প্রমাণ কি?" প্রথমে আমাকে একথা পরিষ্কার করবার অনুমতি দিন যে, রসূলুল্লাহ (স) কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনানো ছাড়া দুনিয়াতে আরও কোন কাজ করেছেন কি না? যদি করে থাকেন তবে কি হিসাবে? এর উত্তর সামনে এসে গেলে সাথে সাথে যুক্তিপ্রমাণও সামনে এসে যাবে।

আমি আপনার সাথে শতকরা একশো ভাগ একমত যে, মহানবী (স) শিক্ষক ছিলেন, বিচারকও ছিলেন, সেনাপতিও। তিনি লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের একটি সুসংগঠিত জামাআতও প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতপর একটি রাষ্ট্রও কায়েম করেছেন ইত্যাদি! কিন্তু আপনার একথার সাথে আমি একমত নই যে, "তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করেছেন তা সেই সুন্নাত যা কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ বিধানদাতার মহান আইনের গঠনও পূর্ণতা প্রদান করে।"

নিসন্দেহে মহানবী (স) সর্বোচ্চ বিধানদাতার আইন অনুযায়ী সমাজ সংগঠন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্র কিতাবের আইন (নাউযুবিল্লাহ) অসম্পূর্ণ ছিল এবং মহানবী (স) কার্যত যা কিছু করেছেন তার দ্বারা এই আইন পূর্ণতা লাভ করে, এ কথা আমার বোধগম্য নয়। আমার মতে ওহী প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা মহানবী (স)–এর সাথে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রিসালাতের দায়িত্ব যা রসূলুল্লাহ (স) সম্পাদন করেছেন তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মহানবী (স)–এর পরেও তাঁর পদাংক অনুসরণে সমাজ পরিচালনা করা যেতে পারে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে। মহানবী (স) যদি مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)–কে অন্যদের নিকট পৌছে দিয়ে থাকেন, তবে উম্মাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ কে অন্যদের পর্যন্ত পৌছে দেয়া। মহানবী (স) যদি مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অনুযায়ী জামাআত গঠন করে থাকেন, রাষ্ট্র কায়েম করে থাকেন এবং আমর বিল–মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল–মুনকার (সত্যন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ)–এর দায়িত্ব পালন করে থাকেন তবে উম্মাতেরও কর্তব্য হচ্ছে, ঠিক এভাবে কাজ করা। মহানবী (স) যদি "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন তবে উম্মাতকেও "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী মীমাংসা করতে হবে। মহানবী (স) যদি وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

('কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর') অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করে থাকেন তবে উম্মাতও তাই করবে। মহানবী (স) যদি তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে যুদ্ধসমূহে ঘোড়ার পিঠে অতিবাহিত করে থাকেন তবে উম্মাতও ঐসব মূলনীতি সামনে রেখে যুদ্ধ করবে।

অতএব "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী উম্মাত যদি প্রশিক্ষণ, সংগঠন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পরামর্শ, বিচার, যুদ্ধসংগ্রাম প্রভৃতি কাজ করে তবে তা রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতেরই অনুসরণ। মহানবী (স)-ও তাঁর যুগের দাবী অনুযায়ী "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী আমল করে সমাজ গঠন করেন। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ হচ্ছে এই যে, প্রতিটি যুগের উম্মাত নিজ যুগের দাবী অনুযায়ী "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী আমল করে সমাজ গঠন করবে। বর্তমান সময়ে আমরা যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বর্তমানের দাবী অনুযায়ী উপযুক্ত মনে করব তদ্রূপ সরকার গঠন করব। কিন্তু "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন" তার চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থান করে তা করতে হবে। এটাই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের উপর আমল। আমরা এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন" শীর্ষক আয়াত যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তদনুযায়ী যদি যুদ্ধ করি তবে এটা হবে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের উপর আমল।

সুন্নাতের অর্থ যদি এই হয়, যেমন এক মৌলভী সাহেব একটি স্থানীয় পত্রিকায় গত সপ্তাহে লিখেছিল যে, হযরত উমার (রা)-র সেনাবাহিনীর একটি দুর্গ দখলে এজন্য বিলম্ব হচ্ছিল যে, সৈনিকগণ কয়েক দিন ধরে মেসওয়াক করেননি, অথবা আজকের আনবিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে তীরের ব্যবহারই সুন্নাত অর্থে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে, কারণ মহানবী (স) যুদ্ধের সময় তীর ব্যবহার করেছিলেন, তবে মহানবী (স)-এর সুন্নাতের সাথে এর চেয়ে অধিক উপহাসের বিষয় আর কি হতে পারে!

উপরোক্ত সমস্ত কাজে মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে যার অনুসরণ করেছেন তা আল্লাহ্র কিতাবে বর্তমান مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ -রই অনুসরণ করেছেন এবং উম্মাতকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারাও এর অনুসরণ করবে। যেখানে اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ("তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে-তোমরা তার অনুসরণ কর"-আ'রাফঃ ৩) বলে উম্মাতের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, সেখানে এই ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (স)-ও এর অনুসরণ করেন قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ "বল, আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট যে ওহী করা হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি"-(আরাফঃ ২০৩)। না জানি আপনি কোন্ সব কারণের ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাবের বিধানকে অসম্পূর্ণ বলছেন। অন্তত আমার দেহে

তো এই ধারণাও কম্পন সৃষ্টি করে। আপনি কি কুরআন মজীদ থেকে এমন কোন আয়াত পেশ করতে পারেন যা থেকে জানা যাবে যে, কুরআনের বিধান অসম্পূর্ণ? আল্লাহ্ তাআলা তো মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য শুধুমাত্র একটি আইন বিধানের দিকেই ইংগিত প্রদান করেছেন, যা সংশয় সন্দেহের উর্ধে, বরং তার শুরুই হয়েছে নিম্নোক্ত বাক্যর দ্বারা– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ "এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নাই।" আবার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালার জন্য এই জীবন–বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এটাও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই আইন–বিধান ব্যাপক ও বিস্তারিত।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ـ

"তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানব–যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব নাযিল করেছেন?"–(আনআমঃ ১১৪)।

বরং মুমিন ও কাফেরের মধ্যে এই পার্থক্য রাখা হয়েছে যে–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই কাফের"–(মায়েদাঃ ৪৪)।

কুরআন মজীদকে كِتٰبٌ عَزِيْزٌ ـ (মহিমাময় গ্রন্থ) বলে কি সম্বোধন করা হয়নি? وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ـ ("সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ") –এর ঘোষণা কি একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহর বিধান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে? আর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাফেররাও তো এই কিতাব ছাড়া কোন জিনিস নিজেদের সান্ত্বনার জন্য আশা করত, যখন আল্লাহ তাআলা বললেন যে, এই কিতাব কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ

"এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়?"–(আনকাবূতঃ ৫১)।

একথা আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি যে, দীনের দাবী যেহেতু এই ছিল যে, সামগিকভাবে কিতাবের উপর আমল হবে এবং এটা হতে পারে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী কুরআনের উপর আমল করবে। তাই সার্বিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য একজন জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন এবং আমি এও অনুভব করি যে, যেখানে

সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েমের প্রশ্ন রয়েছে–সেই লক্ষ্যে যে ব্যক্তি পৌছিয়ে দেন তার স্থান ও মর্যাদা অনেক উপরে। কারণ তিনি পয়গাম এজন্য পৌছে দেন যে, ওহী তিনি ছাড়া আর কারো কাছে আসে না। সুতরাং কুরআন মজীদ এজন্য পরিষ্কার করে দিয়েছে যে– مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "কেউ রসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল"–(নিসাঃ ৮০)। অতএব রসূলুল্লাহ (স) উম্মাতের কেন্দ্রবিন্দুও ছিলেন। আর রসূলুল্লাহ (স)–এর পরেও এই কেন্দ্রিকতাকে কায়েম রাখা হবে। অতএব এই বিষয়টি কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ

"মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র, তার পূর্বে রসূলগণ গত হয়েছে। অতএব যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?"–(আল–ইমরানঃ ১৪)।

প্রকাশ থাকে যে, আমর বিল–মারূফ ওয়া নাহ্‌য়ু আনিল মুনকার–এর ধারাবাহিকতা (যদি এর উদ্দেশ্য ওয়াজ–নসীহত না হয়) এই অবস্থায় কায়েম থাকতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের উপর আমল করার মাধ্যমে জাতির কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতাকে অব্যাহতভাবে কার্যকর রাখা হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে আইন–ব্যবস্থার উপর চালানো মহানবী (স)–এর উদ্দেশ্য ছিল এবং ভবিষ্যত উম্মাতের কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে, এই আইন ব্যবস্থাকে অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত করা হবে।

আপনার আগের প্রশ্ন এই যে, মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে যে কাজ করেছেন তাতে তাঁর মর্যাদা কি ছিল? আমার উত্তর এই যে, মহানবী (স) যা কিছু করে দেখিয়েছেন তা একজন মানুষ হিসাবে, কিন্তু "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী করে দেখিয়েছেন। মহানবী (স)–এর রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদন ছিল ব্যক্তি হিসাব, আমার এই উত্তর আমার নিজের মনমগজ প্রসূত নয়, বরং আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স) বারবার একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ ('আমি তোমাদের মতই মানুষ')। কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মহানবী (স)–এর মর্যাদা ছিলঃ একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং কখনও কখনও তাঁর ইজতিহাদী ভুলও হয়ে যেত।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْ اِلَيَّ رَبِّيْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ـ

"বল! আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার নিকট আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, অতীব নিকটে"–(সাবাঃ ৫০)।

দীন ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করার মত ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সংশোধনীও এসে যেত। যেমন এক যুদ্ধের প্রাক্কালে কতিপয় লোক যুদ্ধে যোগদান না করে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল এবং মহানবী (স)–ও অনুমতি প্রদান করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ۔

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে?"–(তওবাঃ ৪৩)।

অনুরূপভাবে সূরা তাহরীমেও সংশোধনী এসেছেঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ۔

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন?'– (তাহ্‌রীমঃ ১)

অনুরূপভাবে সূরা আবাসায়ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى، اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ه وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى ه اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ه اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ه فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى ه وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ه وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ه وَهُوَ يَخْشٰى ه فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ه

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এলো এবং সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে"–(আয়াত নং ১–১০)।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হল যে, ওহীর আলোকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে আনুষংগিক বিষয়াদিতে রসূলুল্লাহ (স)-এর ইজতিহাদী ভুলও হয়ে যেত। আর মহানবী (স) মানুষ হিসাবে এসব কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রেই এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল। যদি এরূপ না হত তবে এর দুটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সৃষ্টি হত।

প্রথমত এই ধারণা যে, মহানবী (স) যা কিছু করেছেন তা যেহেতু নবী হিসাবে করেছেন তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আজও নিরাশার জগতে কোন কোন স্থানে এই ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, মহানবী (স) যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত এবং তা পুনর্বার কায়েম করা সম্ভব নয়। এই ধারণা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ নাকচ করে দেয়।

এর দ্বিতীয় পরিণতি এই ধারণার আকারে প্রকাশ পেতে পারে যে, এজন্য মহানবী (স)-এর পরেও নবীগণের আগমন অত্যাবশ্যক-যাতে তারা পুনর্বার এই ধরনের সমাজ কায়েম করতে পারেন (যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়)।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, এই দুটি পরিণতি কত ভয়াবহ যা এই ধারণার ফলশ্রুতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সামনে আসছে যে, মহানবী (স) যা কিছুই করেছেন একজন নবী হিসাবেই করেছেন। খতমে নবূওয়াত (নবূওয়াতের পরিসমাপ্তি) মানবতার পরিভ্রমণ পথে একটি মাইল-ফলকের মর্যাদা সম্পন্ন। এখান থেকে ব্যক্তিত্বের যুগ শেষ হয়ে যায় এবং মূলনীতি ও মূল্যবোধের যুগ শুরু হয়। সুতরাং "মহানবী (স) যা কিছু করেছেন একজন নবী হিসাবে করেছেন" এই ধারণা খতমে নবূওয়াতের মূলনীতি প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ মুহাম্মাদ একজন রসূলমাত্র"-৩ঃ ১৪৪)-এর মত সুস্পষ্ট আয়াত থাকতে একথা বলা যে, রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করতেন ওহীর আলোকেই করতেন [এবং ওহীর ধারাবাহিকতা মহানবী (স)-এর সত্তার সাথে শেষ হয়ে গেছে]--এই কথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, মহানবী (স)-এর পর দীন ইসলামের ধারাবাহিকতা কায়েম থাকতে পারে না। খলীফাগণ উত্তমরূপেই বুঝতেন যে, ওহী আল-কিতাব (الكتاب)-এর মধ্যে সংরক্ষিত আছে এবং এরপর মহানবী (স) যা কিছু করতেন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসতে পারেনি। রাষ্ট্রের সীমা বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনের তালিকাও দীর্ঘ হতে থাকে। সামনের দিনগুলোতে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এর সমাধানের জন্য পূর্বের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে এবং তার মধ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে খলীফাগণ তাকে সঅবস্থায় বহাল রাখতেন। আর যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হত তবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এসব কিছুই কুরআনের আলোকে করা হত। এটা রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রদর্শিত পন্থাই ছিল

এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তগণও তা কায়েম রাখেন। এরই নাম ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ।

যদি ধরে নেয়া হয়, যেমন আপনি বলেন যে, মহানবী (স) যা কিছু করতেন ওহীর আলোকে করতেন, তবে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে যে ওহী প্রেরণ করতেন তার উপর (নাউযুবিল্লাহ) আশ্বস্ত না হতে পারায় আরেক প্রকারের ওহী নাযিল শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এই দুই রংগের ওহী কেন? পূর্বে আগত নবীগণের উপর যে ওহী নাযিল হত তাতে কুরআন নাযিল হওয়ার ইংগিত থাকত। অতএব আপনি যে দ্বিতীয় প্রকারের ওহীর কথা বলছেন, কুরআন মজীদে তার দিকে ইংগিত করাটা কি আল্লাহ্র জন্য খুব কঠিন ব্যাপার ছিল, যিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান? কুরআনে তো এমন কোন জিনিস আমার নজরে পড়ছে না। আপনি যদি এ ধরনের কোন আয়াতের দিকে ইংগিত করতে পারেন তবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। ওয়াসসালাম।

অকৃত্রিম

আবদুল ওয়াদুদ

প্রবন্ধকারের জবাব

মুহ্তারামী ওয়া মুকাররামী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ। ১৭ আগষ্ট, ১৯৬০ খৃ. আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। সদ্য প্রাপ্ত এই পত্রে আপনার পূর্বেকার চারটি প্রশ্নের মধ্যে আপনি প্রথম প্রশ্নের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে নবূওয়াত ও সুন্নাত সম্পর্কে আপনার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আপনার নবূওয়াত সম্পর্কিত ধারণাই মৌলিকভাবে ভ্রান্ত। প্রকাশ থাকে যে, ভিত্তির মধ্যেই যদি গলদ থাকে তবে এই ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পরের প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি না। এজন্যেই আমি আবেদন করেছিলাম যে, আপনি আমার প্রদত্ত উত্তরের উপর আরো প্রশ্ন উত্থাপন করার পরিবর্তে আমার উত্তরের মধ্যে উল্লেখিত আসল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখুন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমার এই আবেদন গ্রহণপূর্বক সর্বপ্রথম মৌলিক প্রশ্নের উপর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখন আমি আপনার এবং যেসব লোক এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছেন তাদের কিছু খেদমত করার সুযোগ পাব।

নবূওয়াত ও সুন্নাতের যে ধারণা আপনি ব্যক্ত করেছেন তা কুরআন মজীদের নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ অধ্যয়নেরই ফল। সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনি এই নেহায়েত

ত্রুটিপূর্ণ ও স্বল্প অধ্যয়নের উপর এতটা নির্ভর করে বসে আছেন যে, ১ম হিজরী শতক থেকে আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে গোটা উম্মাতের আলেম সমাজ ও সর্বসাধারণের যে ঐক্যবদ্ধ আকীদা ও কার্যক্রম চলে আসছে তাকে আপনি ভ্রান্ত মনে করে বসেছেন এবং আপনি নিজের কাছে এই ধারণা করে বসে আছেন যে, পৌনে চৌদ্দশত বছরের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সমস্ত মুসলমান মহানবী (স)–এর পদমর্যাদা অনুধাবন করার ব্যাপারে হোঁচট খেয়েছে, তাদের সমস্ত আইনজ্ঞ আলেম সুন্নাতকে আইনের উৎস মেনে নিয়ে ভুল করেছেন এবং তাদের সমগ্র সাম্রাজ্য নিজের আইন–ব্যবস্থার ভিত্তি সুন্নাতের উপর রেখে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। আপনার এই ধারণার উপর বিস্তারিত আলোচনা তো সামনে অগ্রসর হয়ে করব। কিন্তু এই আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি চাচ্ছি যে, আপনি শান্ত মনে আপনার দীনী জ্ঞানের পরিমাণটা স্বয়ং যাচাই করুন এবং নিজেই চিন্তা করুন যে, এ সম্পর্কে আপনি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন তা কি এতবড় একটি ধারণার জন্য যথেষ্ট? কুরআন মজীদ তো কেবল আপনি একাই পড়েননি, কোটি কোটি মুসলমান প্রতিটি যুগে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অংশে তা অধ্যয়ন করছেন এবং এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ইসলামের ইতিহাসে অতীত হয়েছেন এবং আজও পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের জন্য কুরআনের অধ্যয়ন তাদের অসংখ্য ব্যস্ততার মধ্যে একটি আনুষংগিক (গৌণ) ব্যস্ততা ছিল না, বরং তাঁরা নিজেদের গোটা জীবন কুরআনের এক একটি শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করার মধ্যে, তার অন্তর্নিহিত ভাব হৃদয়ংগম করায় এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত বের করায় অতিবাহিত করে দিয়েছেন এবং এখনও করছেন। শেষ পর্যন্ত আপনি কিভাবে এই ভ্রান্তির শিকার হলেন যে, নবূওয়াতের মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে এসব লোক কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ উল্টা বুঝেছেন এবং সঠিক উদ্দেশ্য কেবল আপনার নিকট ও আপনার মত গুটিকয়েক ব্যক্তির সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে? গোটা ইসলামের ইতিহাসে আপনি উল্লেখযোগ্য একজন আলেমের নামও নিতে পারবেন না যিনি কুরআন মজীদের আলোকে নবূওয়াতের পদমর্যাদা সম্পর্কে আপনার অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন এবং সুন্নাতের মর্যাদাও আপনার অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। আপনি যদি এ ধরনের কোন একজন আলেমেরও বরাত দিতে পারেন তবে অনুগ্রহপূর্বক তার নামটা বলে দিন।

১. নবূওয়াতের পদ ও তার দায়িত্ব

আপনার বুদ্ধি ও বিবেকের নিকট এই অকৃত্রিম আবেদন করার পর এখন আমি আপনার পেশকৃত ধারণা সম্পর্কে কিছু আরজ করব। আপনার গোটা আলোচনা দশটি দফা সম্বলিত। তার মধ্যে প্রথম দফা স্বয়ং আপনার বাক্য অনুযায়ী এই যেঃ

"আমি আপনার সাথে শতকরা একশো ভাগ একমত যে, মহানবী (স) শিক্ষকও ছিলেন, বিচারকও ছিলেন এবং সেনাপতিও। তিনি লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়ে একটি সুসংগঠিত জামাআতও প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতপর একটি রাষ্ট্রও কায়েম করেছেন।”

আপনি যে শতকরা ১০০% ভাগ ঐক্যমতের কথা বলেছেন তা মূলত শতকরা একভাগ বরং হাজারের একভাগও ($\frac{১}{১০০০}$) নয়। কারণ আপনি মহানবী (স)-কে শুধুমাত্র শিক্ষক, বিচারক, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত' হওয়ার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসহ মানেননি। অথচ এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা বা না করার কারণেই সমস্ত পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। সামনে অগ্রসর হয়ে আপনি নিজেই একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আপনার মতে মহানবী (স) এই সমস্ত কাজ রসূল হিসাব নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে করেছেন। আর একারণেই সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি যেসব কাজ করেছেন তাকে আপনি সেই সুন্নাত বলে স্বীকার করেন না যা আইনের উৎস হিসাবে গণ্য। অন্য কথায় মহানবী (স) আপনার মতানুযায়ী একজন শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিয়োগকৃত নয়, বরং দুনিয়াতে যেমন অন্যান্য শিক্ষক হয়ে থাকে তিনিও তদ্রূপ একজন শিক্ষক ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি বিচারকও ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে বিচারক নিয়োগ করেননি, বরং তিনিও দুনিয়ার সাধারণ বিচারকদের ন্যায় একজন বিচারক ছিলেন। শাসক, সংস্কারক নেতা ও পথপ্রদর্শকের ক্ষেত্রেও আপনি একই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কোন পদই আপনার ধারণায় মহানবী (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'দায়িত্ব প্রাপ্ত' হিসাবে লাভ করেননি।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে মহানবী (স) এই পদগুলো কিভাবে লাভ করলেন? মক্কার ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা কি স্বেচ্ছায় তাঁকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করেছিল এবং তারা নেতৃত্বের এই পদ থেকে তাঁকে পদচ্যুত করারও অধিকারী ছিল? মদীনায় পৌঁছে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হল, সেই সময় কি আনসার ও মুহাজিরগণ কোন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের এই রাষ্ট্রের কর্ণধার, প্রধান বিচারপতি এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হবেন? মহানবী (স)-এর বর্তমানে কি অপর কোন মুসলমান এসব পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারত? মহানবী (স)-এর নিকট থেকে এসব পদ অথবা এর মধ্যে কোন একটি পদ ফেরত নিয়ে কি মুসলমানগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অপর কাউকে প্রদান করার অধিকারী ছিল? তাছাড়া এমন কিছুও ঘটেছে কি যে, মদীনার এই রাষ্ট্রের জন্য কুরআন মজীদের আওতায় ব্যাপক বিধান ও সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে মহানবী (স)-এর যুগে কোন আইন পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, যেখানে তিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে কুরআন মজীদের

উদ্দেশ্য অনুধাবনের চেষ্টা করে থাকবেন এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআনের যে অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে থাকত তদনুযায়ী আইন-কানূন রচিত হয়ে থাকবে? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি নেতিবাচক হয় তবে আপনি কি বলতে চান যে, মহানবী (স) গায়ের জোরে নিজেই পথপ্রদর্শক, রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারপতি, আইনপ্রণেতা ও মহান নেতা হয়ে বসেছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, মহানবী (স)-এর যে মর্যাদা আপনি সাব্যস্ত করছেন, কুরআন মজীদও কি তাঁর অনুরূপ মর্যাদা সাব্যস্ত করে? এ প্রসংগে একটু কুরআন শরীফ খুলে তার ভাষ্য দেখুন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) শিক্ষক ও মুরুব্বী হিসাবে

এই পবিত্র কিতাবে চার স্থানে মহানবী (স)-এর রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছেঃ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ..... رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ -

"স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই (কা'বা) ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল (তখন এই বলে তারা দোয়া করেছিলঃ) ---হে খোদা! এদের নিকট এদের জাতির মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন" (বাকারাঃ ১২৭-২৯)।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٥

"যেমন আমি তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি-যে তোমাদের আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং তোমরা যে জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতে না তা তোমাদের শিক্ষা দেয়"-(বাকারাঃ ১৫১)।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -

"প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর

আয়াত পড়ে শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়”-(আল-ইমরানঃ ১৬৪)।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে (এমন) একজন রসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়”-(জুমুআঃ ২)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বারবার যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলকে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়ার জন্য পাঠাননি, বরং তার সাথে নবী হিসাবে প্রেরণের আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিলঃ

(এক) তিনি লোকদের কিতাবের শিক্ষা দান করবেন।

(দুই) এই কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করার কৌশল (হিকমাহ্) শিক্ষা দেবেন।

(তিন) তিনি ব্যক্তি ও তাদের সমাজের পরিশুদ্ধি করবেন। অর্থাৎ নিজের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দোষক্রটি দূর করবেন এবং তাদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী ও উন্নত সমাজব্যবস্থার বিকাশ সাধন করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা শুধুমাত্র কুরআনের শব্দগুলো শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কোন কাজই ছিল, অন্যথায় পৃথকভাবে তার উল্লেখ অর্থহীন। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যেসব উপায় ও পদ্ধতিই গ্রহণ করতেন, তাও কুরআনের শব্দসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কিছু ছিল, অন্যথায় প্রশিক্ষণের এই পৃথক কার্যক্রমের উল্লেখের কোন অর্থ ছিল না। এখন বলুন যে, কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এই শিক্ষক ও মুরব্বীর পদ যা মহানবী (স)-এর উপর ন্যস্ত ছিল, তা কি তিনি শক্তিবলে দখল করেছিলেন, না আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ পদে নিয়োগ করেছেন? কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ও পুনরুক্তির পরও এই কিতাবের উপর ঈমান পোষণকারী কোন ব্যক্তি কি একথা বলার দুসাহস করতে পারে যে, এই দুটি পদ রিসালাতের অংশ ছিল না এবং মহানবী (স) এসব পদের দায়িত্ব ও দায়িত্ব ও কার্যক্রম রসূল হিসাবে নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতেন? সে যদি তা বলতে না পারে তবে আপনি বলুন, কুরআন মজীদের পাঠ শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত

যেসব কথা মহানবী (স) কিতাবের শিক্ষা ও হিকমাত (কৌশল) প্রসংগে বলেছেন এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে স্বীকার করতে এবং তাকে সনদ (দলীল-প্রমাণ) হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে তা স্বয়ং রিসালাত অস্বীকার করা নয় তো কি?

রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র কিতাবের ভাষ্যকার হিসাবে

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ -

"এবং (হে নবী!) এই যিকির তোমার উপর নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাক, যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে" (নাহলঃ ৪৪)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মহানবী (সা)-এর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা যে হুকুম-আহ্‌কাম ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান করবেন। স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন এক ব্যক্তিও অন্তত এতটুকু কথা বুঝতে সক্ষম যে, কোন কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সেই কিতাবের মূল পাঠ পড়ে শুনিয়ে দিলেই হয়ে যায় না, বরং ব্যাখ্যা দানকারী তার মূল পাঠের অধিক কিছু বলে থাকেন, যাতে শ্রবণকারী কিতাবের অর্থ পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। আর কিতাবের কোন বক্তব্য যদি কোন ব্যবহারিক (practical) বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে ভাষ্যকার ব্যবহারিক প্রদর্শনী (practical demonstration) করে বলে দেন যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এভাবে কাজ করা। তা না হলে কিতাবের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীকে কিতাবের মূল পাঠ শুনিয়ে দেয়াটা মকতবের কোন শিশুর নিকটও ব্যাখ্যা বা ভাষ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এখন আপনি বলুন, এই আয়াতের আলোকে মহানবী (স) কুরআনের ভাষ্যকার কি ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন, না আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভাষ্যকার নিয়োগ করেছিলেন? এখানে তো আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের উপর কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন যে, রসূল নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কিতাবের তাৎপর্য তুলে ধরবেন। অতপর কিভাবে এটা সম্ভব যে, কুরআনের ভাষ্যকার হিসাবে তাঁর পদমর্যাদাকে রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে পৃথক সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁর পৌঁছে দেয়া কুরআনকে গ্রহণ করে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হবে? এই অস্বীকৃতি কি সরাসরি রিসালাতের অস্বীকৃতির নামান্তর নয়?

রসূলুল্লাহ (স) নেতা ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে

সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ . . . قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ -

"বল (হে নবী), তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন...বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে কাফেরদের আল্লাহ পছন্দ করেন না"-(আয়াত নং ৩১-৩২)।

সূরা আহ্‌যাবে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ -

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে এক অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতের আকাংখী"-(আয়াত নং ২১)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল (স)-কে নেতা সাব্যস্ত করছেন, তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর জীবন চরিতকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং পরিষ্কার বলছেন যে, এই নীতি অবলম্বন না করলে আমার নিকট কোন আশা রেখ না। এ ছাড়া আমার ভালোবাসা লাভ করা যায় না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফরী। এখন আপনি বলুন, রসূলুল্লাহ (স) কি স্বয়ং নেতা ও পথপ্রদর্শক হয়ে গিয়েছিলেন? অথবা মুসলমানগণ তাঁকে নির্বাচন করেছিল? আর নাকি আল্লাহ তাআলাই তাঁকে এই পদে সমাসীন করেছেন? কুরআনুল করীমের এ আয়াত যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে মহানবী (স)-কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতা সাব্যস্ত করে, তাহলে এরপরও তাঁর আনুগত্য ও তাঁর জীবনচরিত অনুসরণ করার ব্যাপরটি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের জওয়াবে এ কথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন যে, এর দ্বারা কুরআন মজীদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। যদি তাই অর্থ হত তবে فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ (কুরআনের অসুরণ কর) বলা হত, فَاتَّبِعُونِي (আমার অনুসরণ কর) বলা হত না। এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনচরিতকে উত্তম আদর্শ বলার তো কোন অর্থই ছিল না।

শরীআত প্রণেতা হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)

সূরা আ'রাফে মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেনঃ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

"সে তাদেরকে ন্যায়ানুগ কার্যের আদেশ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল এবং নাপাক জিনিসসমূহ হারাম করে, আর তাদের উপর থেকে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিল এবং সেই বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী ছিল"-(আয়াত নং ১৫৭)।

উল্লেখিত আয়াতের শব্দসমূহ একটি বিষয় সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (Legislative Powers) প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম শুধু কুরআন মজীদে বর্ণিতগুলোই নয়, বরং এর সাথে মহানবী (স) যা কিছু হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করেছেন, অথবা যেসব জিনিসের হুকুম দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন তাও আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাও আল্লাহ্‌র বিধানের একটি অংশ। এ কথাই সূরা হাশরে পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

"রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ কর, আর যে জিনিস থেকে বিরত রাখে (নিষেধ করে) তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চিত আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা"-(আয়াত নং ৭)।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের কোনটিরই এই ব্যাখ্যা করা যায় না যে, তার মধ্যে কুরআনের আদেশ-নিষেধ ও কুরআনের হালাল-হারামের কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যাখ্যা নয়, বরং আল্লাহ্‌র কালামের পরিবর্তনই হবে। আল্লাহ তাআলা তো এখানে আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কার্যক্রম সাব্যস্ত করেছেন, কুরআনের কার্যক্রম নয়। এরপরও কি কোন ব্যক্তি আল্লাহ বেচারাকে বলতে চায় যে, আপনার বক্তব্যে ভুল হয়ে গেছে। আপনি ভুল করে কুরআনের পরিবর্তে রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)?

বিচারক হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)

কুরআন মজীদে এক স্থানে নয় বরং অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি মহানবী (স)কে বিচারক নিয়োগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
اَرٰىكَ اللّٰهُ ۔

"(হে নবী!) আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্যপথ দেখিয়েছেন, তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পার"–(সূরা নিসাঃ ১০৫)।

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَّاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۔

"আর (হে নবী) বল! আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন তোমাদের মাঝে ইনসাফ করি"–(সূরা শূরাঃ ১৫)।

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۔

"ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হবে, যেন রসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম"– (সূরা নূরঃ ৫১)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ
الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۔

"তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং তাঁর রসূলের দিকে আস, তখন এই মুনাফিকদের তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে"–(নিসাঃ ৬১)।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

"অতএব (হে নবী) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারে না–যতক্ষণ তারা নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে"–(নিসাঃ ৬৫)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হচ্ছে যে, মহানবী (স) স্বয়ংসিদ্ধভাবে অথবা মুসলমানদের নিযুক্ত বিচারক ছিলেন না, বরং আল্লাহ তাআলার নিয়োগকৃত বিচারক ছিলেন। তৃতীয় আয়াতটি বলে দিচ্ছে, তাঁর বিচারক হওয়ার মর্যাদা বা পদ রিসালাতের পদ থেকে স্বতন্ত্র ছিলনা, বরং রসূল হিসাবে তিনি বিচারকও ছিলেন এবং একজন মুমিনের রিসালাতের প্রতি ঈমান তখন পর্যন্ত সঠিক ও যথার্থ হতে পারেনা যতক্ষণ না সে তাঁর এই মর্যাদার সামনেও শ্রবণ ও আনুগত্যের ভাবধারা গ্রহণ করবে। চতুর্থ আয়াতে مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন) অর্থাৎ কুরআন এবং রসূল উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, মীমাংসা লাভের জন্য দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে। (এক) কুরআন, আইন, বিধান হিসাবে এবং (দুই) রসূলুল্লাহ (স) বিচারক হিসাবে। আর এই দুই জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মুনাফিকের কাজ, মুমিনের কাজ নয়। পঞ্চম আয়াতে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স)কে যে ব্যক্তি বিচারক হিসাবে না মানে সে মুমিনই নয়, এমনকি রসূলুল্লাহ (স) প্রদত্ত ফয়সালা সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি নিজের অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে তবে তার ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও কি আপনি বলতে পারেন যে, মহানবী (স) রসূল হিসাবে বিচারক ছিলেন না, বরং দুনিয়ার সাধারণ জজমেজিষ্ট্রেটের ন্যায় তিনিও একজন বিচারক ছিলেন মাত্র? তাই তাদের ফয়সালাসমূহের ন্যায় মহানবী (স)–এর ফয়সালাও আইনের উৎস হতে পারে না? দুনিয়ার কোন বিচারকের কি এরূপ মর্যাদা হতে পারে যে, তার ফয়সালা যদি কেউ না মানে, অথবা তার সমালোচনা করে, অথবা অন্তরে তাকে ভ্রান্ত মনে করে তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়?

রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)

কুরআন মজীদ একইভাবে বিস্তারিত আকারে এবং পুনরুক্তি সহকারে অসংখ্য স্থানে একথা বলেছে যে, মহানবী (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং তাঁকে রসূল হিসাবেই এই পদ প্রদান করা হয়েছিলঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি তাকে এজন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমোদন (sanction) অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে"–(নিসাঃ ৬৪)।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল"–(নিসাঃ ৮০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

"(হে নবী) নিশ্চিত যেসব লোক তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করে তারা মূলত আল্লাহ্‌র নিকটই বাইআত গ্রহণ করে"–(আল–ফাতহ্‌ঃ ১০)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলেরও আনুগত্য কর, নিজেদের আমল বিনষ্ট কর না"–(মুহাম্মাদঃ ৩৩)।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

"কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করার এখতিয়ার রাখবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করবে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হল"–(আহ্‌যাবঃ ৩৬)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন তাদেরও। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে

ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক"–(নিসাঃ ৫৯)।

এসব আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, রসূল এমন কোন রাষ্ট্রনায়ক নন যিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বয়ং কর্ণধার হয়ে গেছেন, অথবা লোকেরা তাঁকে নির্বাচন করে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়েছে, বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর রাষ্ট্রনায়ক সুলভ কাজ তাঁর রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে ভিন্নতর কোন জিনিস নয়, বরং তাঁর রসূল হওয়াটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর অনুগত রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার নামান্তর। তাঁর আনুগত্য করা হলে তা মূলত আল্লাহ্রই আনুগত্য করা হল। তাঁর নিকট বাইআত হওয়াটা মূলত আল্লাহর নিকট বাইআত হওয়ার শামিল। তাঁর আনুগত্য না কারার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং এর পরিণতি ব্যক্তির কোন কার্যক্রমই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়া। পক্ষান্তরে ঈমানদার সম্প্রদায়ের (যার মধ্যে বাহ্যত সমগ্র উম্মাত, তাদের শাসক গোষ্ঠী ও তাদের "জাতির কেন্দ্রবিন্দু" সব অন্তর্ভুক্ত) সর্বোতভাবেই এ অধিকার নাই যে, কোন বিষয়ে আল্লাহ্র রসূলের সিদ্ধান্ত দেয়ার পর তারা ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এসব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থেকে আরও অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ আয়াত চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যার মধ্যে পরপর তিনটি আনুগত্যের হুকুম দেয়া হয়েছেঃ

১. সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আনুগত্য।

২. অতপর রসূলুল্লাহ (স) এর আনুগত্য।

৩. অতপর তৃতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের (অর্থাৎ আপনার জাতীয় কেন্দ্রবিন্দুর) আনুগত্য।

এর পূর্বেকার কথা থেকে জানা গেল যে, রসূল উলিল আমর (সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ) এর অন্তর্ভুক্ত নন, বরং তার থেকে পৃথক ও উর্ধে এবং তাঁর স্থান আল্লাহ্র পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে কথা জানা যায় তা হলো, উলিল আম্র এর সাথে বিতর্ক ও মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু রসূলের সাথে বিতর্ক বা মতপার্থক্য হতে পারেনা। তৃতীয়ত জানা গেল যে, বিতর্ক ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য দুটি প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছেঃ (এক) আল্লাহ, (দুই) অতপর আল্লাহ্র রসূল। প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রত্যাবর্তনস্থল শুধুমাত্র আল্লাহ হতেন, তবে সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে রসূল (স) এর উল্লেখ সম্পূর্ণ অর্থহীন হত। তাছাড়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ যখন আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন রসূলের দিকে

প্রত্যাবর্তনের অর্থও এছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা যে, রিসালাতের যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন এবং এই যুগের পর রসূলুল্লাহ (স) এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

সুন্নাত আইনের উৎস হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা

এখন আপনি যদি বাস্তবিকই কুরআন মজীদকে মানেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থের নাম নিয়ে আপনার নিজের মনগড়া মতবাদের অনুসারী না হয়ে থাকেন তবে দেখে নিন যে, কুরআন মজীদ পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন বাক্যে রসূলুল্লাহ (স) কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শিক্ষক, অভিভাবক, নেতা, পথপ্রদর্শক, আল্লাহ্‌র কালামের ভাষ্যকার, আইনপ্রণেতা (Law Giver), বিচারক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক সাব্যস্ত করছে এবং মহানবী (স) এর এ সমস্ত পদ এই পাক কিতাবের আলোকে রিসালাতের পদের অবিচ্ছেদ্য অংগ। কালামে পাকের এই ভাষণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীকার করেন যে, উপরোক্ত সমস্ত পদের অধিকারী হিসাবে মহানবী (স) যে কাজ করেছেন তা কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় উৎস (Source of Law)। কোন ব্যক্তি চরম বিভ্রান্ত না হলে এরূপ কল্পনা করতে পারে না যে, গোটা দুনিয়ার মুসলমান এবং প্রতিটি যুগের সমস্ত মুসলমান কুরআন পাকের এসব আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবনে ভুল করে কেবল সঠিক অর্থ সে-ই অনুধাবন করতে পেরেছে যে, মহানবী (স) কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত রসূল ছিলেন এবং অতপর তাঁর মর্যাদা ছিল একজন সাধারণ মুসলমানের মত। অবশেষে এমন কি অদ্ভুত অভিধান তার হস্তগত হয়েছে যার সাহয্যে সে কুরআন মজীদের শব্দাবলীর এই অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছে যা গোটা উম্মাতের বুঝে আসেনি?

---

১. বরং যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে জানা যায় যে, স্বয়ং রিসালাতের যুগেও ব্যাপক অর্থে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতই ছিল প্রত্যাবর্তনস্থল। কারণ মহানবী (স)-এর শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গোটা আরব উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছিল। দশ-বার লাখ বর্গমাইলের এই দীর্ঘ ও প্রশস্ত দেশে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সরাসরি মহানবী (স)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু এই যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্নরগণ, বিচারকগণ এবং প্রশাসকগণকে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় যে উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হত, তা ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এরই সুন্নাত।

২. রসূলুল্লাহ (স)— এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

দ্বিতীয় বিষয়টি আপনি এই বলেছেনঃ "কিন্তু আপনার একথার সাথে আমি একমত নই যে, তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করেছেন তা সেই সুন্নাত যা কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ বিধানদাতার মহান আইনের গঠন ও পূর্ণতা প্রদান করে। নিসন্দেহে মহানবী (স) সর্বোচ্চ বিধানদাতার আইন অনুযায়ী সমাজ সংগঠন করেছেন, কিন্তু আল্লাহর কিতাবের আইন (নাউযুবিল্লাহ) অসম্পূর্ণ ছিল এবং মহানবী (স) কার্যত যা কিছু করেছেন তার দ্বারা এই আইন পূর্ণতা লাভ করে, এরূপ কথা আমার নিকট অবোধগম্য।"

একই প্রসংগে সামনে অগ্রসর হয়ে আপনি আরও বলেছেনঃ "জানি না আপনি কোন্ সব কারণের ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাবের বিধানকে অসম্পূর্ণ বলেছেন। অন্তত আমার দেহে তো এই ধারণা কম্পন সৃষ্টি করছে। আপনি কি কুরআন মজীদ থেকে এমন কোন আয়াত পেশ করতে পারেন যার মাধ্যমে জানা যাবে যে, কুরআনের বিধান অসম্পূর্ণ?"

উপরোক্ত ছত্রগুলোতে আপনি যা কিছু বলেছেন তা একটা বড় ধরনের ভ্রান্ত ধারণা। আইন শাস্ত্রের একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হৃদয়ংগম করতে না পারার কারণে আপনি এর শিকার হয়েছেন। পৃথিবীভর এই নীতি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ প্রদান করেন, অথবা একটি কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, অথবা একটি নীতি নির্ধারণ করে নিজের অধীনস্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে তার বিস্তারিত কাঠামো সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়নের এখতিয়ার প্রদান করেন, তবে তার প্রণীত নীতিমালা আইন-বিধান থেকে স্বতন্ত্র কোন জিনিস নয়, বরং তা ঐ আইনের অংশ হিসাবে গণ্য হয়। আইন প্রণেতার নিজের উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, তিনি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, আনুষংগিক বিধান তৈরী করে তার কার্যপ্রণালী (Procedure) নির্দিষ্ট করে দেয়া, তিনি যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন তদনুযায়ী বিস্তারিত বিধান প্রণয়ন করা এবং তিনি সংক্ষিপ্তাকারে যে পথনির্দেশ দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের অধীনস্থ ব্যক্তি, অথবা ব্যক্তিবর্গ, অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইন-কানূন তৈরীর অনুমতি প্রদান করেন। এই আনুষংগিক বিধান নিঃসন্দেহে প্রাথমিক মৌল বিধানের সাথে মিলিত হয়ে তার পুনর্গঠন ও পরিপূর্ণতা দান করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আইন প্রণেতা ভুলবশত ত্রুটিপূর্ণ বিধান তৈরী করেছিলেন এবং অপর কেউ এসে তার ত্রুটি দূরীভূত করেছেন। বরং তার অর্থ এই যে, আইন প্রণেতা স্বীয় আইনের মৌলিক অংশ

নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং বিস্তারিত ও ব্যাখ্যামূলক অংশ নিজের নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রচনা করে দিয়েছেন।

মহানবী (স)—এর আইন প্রণয়ন কর্মের ধরন

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় আইন প্রণয়নে এই নিয়মই ব্যবহার করেছেন। তিনি কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্তাকারে বিধান ও পথনির্দেশনা দান করে অথবা কতিপয় মূলনীতি বর্ণনা করে, অথবা নিজের পছন্দ ও অপছন্দের কথা প্রকাশ করে এই কাজ তাঁর রসূলের উপর অর্পণ করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র অক্ষরিকভাবেই এই আইনের বিস্তারিত রূপ দান করবেন না, বরং বাস্তবে তা কার্যকর করে এবং তদনুযায়ী কাজ করেও দেখিয়ে দেবেন। আইন প্রণয়নের এখতিয়ার প্রদানের এই নির্দেশ স্বয়ং আইনের মূল পাঠেই (অর্থাৎ কুরআন মজীদেই) বর্তমান রয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ -

"আর (হে নবী!) আমরা এই যিকির তোমার নিকট এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাদের সামনে তুলে ধরতে পার"-(নাহ্লঃ ৪৪)।

এখতিয়ার প্রদানের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের পর আপনি একথা বলতে পারেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বক্তব্যমূলক ও কর্মমূলক বর্ণনা কুরআন মজীদের বিধান থেকে পৃথক কোন জিনিস। তা মূলত কুরআনের আলোকে এই আইনের একটি অংশ। তাকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ স্বয়ং কুরআনকে এবং আল্লাহ্র এখতিয়ার অর্পণের নির্দেশনামাকে চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর।

এই আইন প্রণয়নমূলক কাজের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

আপনার উথাপিত প্রশ্নাবলীর যদিও এটাই পূর্ণাংগ উত্তর, কিন্তু আরও অধিক অবগতির জন্য আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি যার সাহায্যে আপনি বুঝতে পারবেন যে, কুরআন মজীদ এবং মহানবী (স)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন" وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ - তওবাঃ ১০৮) এবং মহানবী (স)-কে নির্দেশ দেন যে, "তিনি যেন নিজের পোশাক পবিত্র রাখেন" وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -আল-মুদ্দাসসিরঃ ৪)। মহানবী (স) উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ পূর্বক তা কার্যে পরিণত করার জন্য পায়খানা-পেশাবের পর

পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দান করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র হয়ে যাও, তবে পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড় না (দ্র. নিসাঃ ৪৩; মায়েদাঃ ৬)। মহানবী (স) বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন যে, এখানে নাপাক (জানাবাত) অর্থ কি? এই নাপাক কোন্ অবস্থার উপর প্রযোজ্য আর কোন্ অবস্থার উপর প্রযোজ্য নয় এবং এই নাপাকি থেকে পাক হওয়ার পন্থা কি?

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা হুকুম করেছেন যে, তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠো, তখন নিজেদের মুখ এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ্ কর এবং পদদ্বয় ধৌত কর বা তা মাসেহ্ কর (মায়েদাঃ ৬)। মহানবী (স) বলে দেন যে, মুখ ধৌত করার নির্দেশের মধ্যে কুলকুচা করা ও নাক পরিষ্কার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কান মাথার একটি অংশ, তাই মাথার সাথে কানও মাসেহ্ করতে হবে। পদদ্বয়ে মোজা পরিহিত থাকলে তা মাসেহ্ করবে এবং মোজা পরিহিত না থাকলে তা ধৌত করবে। সাথে সাথে তিনি এটাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, কোন্ অবস্থায় উযু ছুটে যায় এবং কোন্ অবস্থায় তা অবশিষ্ট থাকে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে, রোযাদার ব্যক্তি রাতের বেলা ফজরের সময় কালো সূতা সাদা সূতা থেকে পৃথক না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে পারে

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔

–বাকারাঃ ১৮৭)। মহানবী (স) বলেন যে, এর অর্থ রাতের অন্ধকার থেকে ভোরের শুভ্র আলো উদ্ভাসিত হওয়া।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা পানাহারের জিনিসসমূহের মধ্যে কোন কোন জিনিস হালাল এবং কোন কোন জিনিস হারাম হওয়ার কথা বলার পর অবশিষ্ট জিনিসসমূহের ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশ দেন যে, তোমাদের জন্য পাক জিনিস হালাল এবং নাপাক জিনিস হারাম করা হয়েছে (দ্র. মায়েদাঃ ৪)। মহানবী (স) স্বীয় বক্তব্য ও বাস্তব কর্মের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বর্ণনা দান করেছেন যে, পাক জিনিস কি যা আমরা খেতে পারি এবং নাপাক জিনিস কি যা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিৎ।

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকার আইনের বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে, তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে এবং তাদের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে তারা সকলে মিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে (দ্র. নিসাঃ ১১)। এখানে এ কথা বলে দেয়া হয়নি যে, যদি দুইজন কন্যা সন্তান থাকে তবে তারা কতটুকু অংশ পাবে? মহানবী (স) ব্যাখ্যা করে বলে দেন যে, দুই কন্যা সন্তানও দুয়ের অধিক কন্যা সন্তানের সমান অংশ পাবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে দুই সহোদর বোনকে একই সময় একই ব্যক্তির বিবাহাধীনে একত্র করতে নিষেধ করেছেন (দ্র. নিসাঃ ২৩)। মহানবী (স) বলে দেন যে, ফুফু-ভাইঝি এবং খালা-বোনঝিও এই হুকুমের মধ্যে শামিল রয়েছে।

[কুরআন মজীদ পুরুষদের একসংগে দুই-দুই, তিনি-তিন অথবা চার-চার মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে (দ্র. নিসাঃ ৩)। এ আয়াতে চূড়ান্তভাবে সুস্পষ্ট করা হয়নি যে, এক ব্যক্তি একই সময় নিজের বিবাহাধীনে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না। হুকুমের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা মহানবী (স) প্রদান করেছেন এবং যাদের বিবাহাধীনে চারের অধিক স্ত্রী ছিল, মহানবী (স) তাদেরকে চারের অধিক স্ত্রীদের তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন।

কুরআন মজীদ হজ্জ ফরজ হওয়া সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ প্রদান করেছে এবং পরিষ্কারভাবে বলেনি যে, এই ফরজ কার্যকর করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতি বছর হজ্জ করতে হবে, নাকি জীবনে একবার হজ্জ করাই যথেষ্ট, অথবা একাধিকবার হজ্জে যাওয়া উচিৎ (দ্র. আল-ইমরানঃ ৯৭)? এটা আমরা মহানবী (স) এর ব্যাখ্যার মাধ্যমেই জানতে পারি যে, জীবনে একবার মাত্র হজ্জ করেই কোন ব্যক্তি হজ্জের ফরজিয়াত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

কুরআন মজীদ সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রাখার ব্যাপার ভীতিকর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে (দ্র. তওবাঃ ৩৪)। এ আয়াতের সাধারণ অর্থের মধ্যে এতটুকু অবকাশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না যে, আপনি দৈনন্দিন খরচের অতিরিক্ত একটি পয়সাও নিজের কাছে রাখতে পারবেন, অথবা আপনার পরিবারের মহিলাদের নিকট অলংকারের আকারে এক চুল পরিমাণ সোনাও রাখতে পারেন। একথা মহানবী (স)-ই বলে দিয়েছেন যে, সোনা-রূপার নেসাব (যাকাত আরোপিত হওয়ার পরিমাণ) কি এবং নেসাব পরিমাণ বা তার অতিরিক্ত সোনা-রূপা জমাকারী ব্যক্তি যদি তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করে তবে সে এই ভীতিকর শাস্তির আওতায় পড়বে না]।[১]

---

১. বন্ধনীর মধ্যের অংশ পরে যোগ করা হয়েছে।

এই কয়টি উদারহণ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, মহানবী (স) আল্লাহ তাআলার সোপর্দকৃত আইন প্রণয়নের এখতিয়ার প্রয়োগ করে কুরআন মজীদের বিধানাবলী, পথনির্দেশ, ইশারা–ইংগীত ও অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহের কিভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই জিনিস যেহেতু কুরআন মজীদে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণের নির্দেশের উপর ভিত্তিশীল ছিল, তাই তা কুরআন থেকে স্বতন্ত্র কোন বিধান ছিল না, বরং কুরআনের বিধানেরই একটা অংশ।

৩. সুন্নাত এবং তা অনুসরণের অর্থ

আপনার তৃতীয় দফা হলোঃ "রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের অনুসরণের অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স) যে কাজ করেছেন; তাই করা তার অর্থ এই নয় যে,মহানবী (স) যেভাবে করেছেন আমরাও সেভাবেই করব। মহানবী (স) যদি "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তা অন্যদের নিকট পৌছিয়ে থাকেন তবে উম্মাতেরও কর্তব্য হচ্ছে যে, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তা অন্যদের পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া---"।[১]

সুন্নাত ও তার অনুসরণের এই যে অর্থ আপনি নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে আমি শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, এটা স্বয়ং **"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন"** এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যার অনুসরণ আপনি অপরিহার্য মনে করেন। "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তার আলোকে সুন্নাতের অনুসরণ তো এই যে, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ পাকের নিয়োগকৃত শিক্ষক, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, আইনপ্রণেতা, বিচারক, প্রশাসক, রাষ্ট্রপ্রধান ও কুরআনের ভাষ্যকার হিসাবে যা কিছু বলেছেন এবং কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন, তাকে আপনি রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত হিসাবে মানবেন এবং তার অনুসরণ করবেন। এর দলীল–প্রমাণ আমি পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করে এসেছি, তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এ প্রসংগে আপনি মিসওয়াক সম্পর্কিত যে কথা লিখেছেন তার সোজা উত্তর এই যে, গভীর চিন্তা প্রসূত জ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় এই প্রকারের অস্পষ্ট ও অনির্ভরযোগ্য কথা নজীর হিসাবে পেশ করে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা

---

১. একথা বলার সময় ডকটর সাহেব এই বাস্তব ঘটনা ভুলে গেছেন যে, মহানবী (স) সর্বপ্রথম যে কাজ করেছেন তা ছিল "নবূওয়াতের দাবী"। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত অনুসরণের সর্বপ্রথম উপাদান এই সাব্যস্ত হয় যে, প্রথমে নবূওয়াতের দাবী করতে হবে (মাআযাল্লাহ)।

যায় না। প্রত্যেক চিন্তাগোষ্ঠীর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা নিজেদের অযৌক্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভংগিকে কৌতুক ও প্রহসনে পরিণত করে পেশ করে। তাদের বক্তব্য প্রমাণ হিসাবে পেশ করে আপনি যদি স্বয়ং ঐ দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করেন তবে তার অর্থ এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দলীল–প্রমাণের মোকাবিলা করা থেকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে আপনি কঠিন পরীক্ষার জন্য শুধু দুর্বল যুক্তি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

অনুরূপভাবে আপনার এই যুক্তিও দুর্বল যে, সুন্নাত অনুসরণের অর্থ আজকের আনবিক যুগে তীর–ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করা। কারণ রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে তীর–ধনুক দিয়েই যুদ্ধ করা হত। শেষ পর্যন্ত এ কথা আপনাকে কে বলেছে যে, সুন্নাত অনুসরণের অর্থ এটাই? সুন্নাত অনুসরণের এই অর্থ কখনও কোন বিশেষজ্ঞ আলেমই গ্রহণ করেননি যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করব, যা রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে ব্যবহার করা হত। বরং চিরকালই তার অর্থ এই মনে করা হত যে, যুদ্ধের ময়দানে আমরা সেই উদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইসলামী বিধান অনুসরণ করব যার অনুসরণের জন্য রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যেসব উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করতে এবং যেসব কার্যক্রম অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবো।

৪. রসূলে পাক (স) কোন্‌ ওহী অনুসরণে আদিষ্ট ছিলেন এবং আমরা কোন্‌টি অনুসরণে আদিষ্ট?

আপনার নিজের ভাষায় আপনার চতুর্থ দফাটি হলো, "উপরোক্ত সমস্ত কাজে মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে যার অনুসরণ করেছেন তা আল্লাহর কিতাবে বর্তমান مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ - ("আল্লাহ যা নাযিল করেছেন) এরই অনুসরণ করেছেন এবং উম্মাতকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারাও এর অনুসরণ করবে। যেখানে اِتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ বলে উম্মাতের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, সেখানে এই ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (স)–ও এর অনুসরণ করেনঃ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ

এই বক্তব্যে আপনি দুইটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং আয়াত দুটি শুধু ভুলই নকল করেননি, বরং উদ্ধৃত করতে গিয়ে এমন ভুল করেছেন যা আরবী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও করতে পারে না। প্রথম আয়াতটি মূলতঃ এরূপঃ اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"(তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে–তোমরা তার অনুসরণ কর।" অথচ আপনার নকলকৃত ব্যাক্যের এরূপ অর্থ হবেঃ "আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর।" দ্বিতীয় আয়াতের মূল পাঠ কুরআন মজীদে এরূপঃ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ

"বল (হে মুহাম্মাদ), আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট যে ওহী করা হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।" আপনি যে পাঠ উল্লেখ করেছেন তার অর্থ দাঁড়ায়ঃ "বল! অনুসরণ কর সেই ওহীর যা আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়।" আমি এই ভুল সম্পর্কে আপনাকে এজন্য সতর্ক করছি যে, আপনি কোন এক সময় ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন যে, একদিকে কুরআন সম্পর্কে আপনার জ্ঞানের এই দুর্দশা এবং অন্যদিকে আপনি এই ধারণার শিকার হয়েছেন যে, গোটা উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ কুরআনকে অনুধাবন করতে ভুল করেছেন এবং আপনি তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন।

এখন আসল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এখানে আপনি দুটি কথা বলেছেন এবং উভয়টিই ভ্রান্ত। একটি কথা আপনি এই বলেন যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট শুধুমাত্র কুরআনে বিদ্যমান ওহীই আসতো এবং তিনি কেবলমাত্র এর অনুসরণ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। অথচ কুরআন মজীদ থেকেই স্বয়ং প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে মহানবী (স)–এর উপর বিধান নাযিল হত এবং তিনি উভয় প্রকার ওহীর অনুসরণ করতে আদিষ্ট ছিলেন (এর প্রমাণ সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তরে পেশ করা হবে)। দ্বিতীয় কথা আপনি এই বলেন যে, উম্মাতকে কেবলমাত্র কুরআন মজীদ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআন মজীদ বলে যে, উম্মাতকে রসূলুল্লাহ (স)–এর অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(১) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

"হে নবী! বলে দাও যে, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"–(আল–ইমরানঃ ৩১)।

(২) وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ

الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ -

"আমার রহমাত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দিব যারা অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত থাকে, যাকাত দান করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অতএব যারা এই উম্মী রসূল ও নবীর অনুসরণ করে–যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাওয়া যায়"–(আ'রাফঃ ১৫৬–৭)।

(٣) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

"তুমি এ যাবত যে কিবলার অনুসরণ করছিলে তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমরা জানতে পারি, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায়"–(বাকারাঃ ১৪৩)।

এসব আয়াতেই রসূলুল্লাহ (স)–এর আনুগত্য করার নির্দেশকে ব্যাখ্যার কুঁদযন্ত্রে চড়িয়ে এই অর্থ বের করা সম্ভব নয় যে, এর দ্বারা মূলত কুরআন মজীদের আনুগত্য করাই বুঝানো হয়েছে। যেমন আমি পূর্বে আরয করে এসেছি যে, বাস্তবিকই যদি উদ্দেশ্য তাই হত যে, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)–এর নয়, বরং কুরআনের অনুসরণ করবে তবে শেষ পর্যন্ত এমন কি কারণ ছিল যে, এক নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা فَاتَّبِعُوْا كِتَابَ اللّٰهِ ব্যবহার করার পরিবর্তে فَاتَّبِعُوْنِيْ শব্দ ব্যবহার করেছেন? তাহলে আপনার ধারণামতে আল্লাহ তাআলার কি এখানে ভুলচুক হয়ে গেছে? (নাউযুবিল্লাহ)।

পুনশ্চ দুই নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে তো এই ব্যাখ্যারও সুযোগ নাই। কারণ তাতে পৃথকভাবে আল্লাহ পাকের আয়াতের উপর ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মহানবী (স)–এর আনুগত্যের উল্লেখও পৃথকভাবে রয়েছে।

তৃতীয় নম্বরে উল্লেখিত আয়াত এর চেয়েও খোলাভাবে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে এবং এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যার শিকড় কেটে দিয়েছে, সাথে সাথে আপনার এই কল্পনারও মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর উপর কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কোন আকারে ওহী আসতো না। মাসজিদুল–হারামকে কিবলা নির্ধারণের পূর্বে মুসলমানদের যে কিবলা ছিল তাকে কিবলা বানানোর কোন হুকুম কুরআনে আসেনি। যদি এসে থাকে তবে আপনি তার উল্লেখ করুন। এই ঘটনা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের প্রারম্ভিক কালে মহানবী (স)–ই এই কিবলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং প্রায় চৌদ্দ বছর যাবত সেদিকে

মুখ করে মহানবী (স) ও সাহাবাগণ নামায আদায় করতে থাকেন। চৌদ্দ বছর পরে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার এই আয়াতে মহানবী (স)–এর উপরোক্ত কাজের সত্যায়ন করলেন এবং এই ঘোষণা দিলেন যে, এই কিবলা আমাদের নির্ধারিত ছিল এবং আমরা আমাদের রসূলের মাধ্যমে তা এজন্য নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? রসূলুল্লাহ (স)–এর উপর কুরআন ছাড়াও যে ওহীর মাধ্যমে হুকুম–আহ্‌কাম নাযিল হত, এটা একদিকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং অপর দিকে এই আয়াত সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ (স)–এর সেইসব হুকুম মানতেও আদিষ্ট যা কুরআন মজীদে উল্লেখ নাই। এমনকি আল্লাহ তাআলার নিকট রিসালাতের প্রতি মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষাও এভাবে হয়ে থাকে যে, রসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা তারা মান্য করে কি না?

এখন আপনি এবং আপনার অনুরূপ একই মত পোষণকারীগণ স্বয়ং চিন্তা করে দেখুন, আপনারা নিজেদের কি বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। বাস্তবিকই আপনার অন্তরে যদি এতটুকু খোদাভীতি থেকে থাকে যে, তাঁর দেয়া হেদায়াতের পরিপন্থী কর্মপন্থার চিন্তা করতেও আপনার দেহে কম্পন ধরে যায় তবে আমার আবেদন এই যে, বিতর্ক ও বাহাসের জযবা থেকে নিজের মন–মানসিকতাকে পবিত্র করে উপরের কয়েকটি লাইন পুনপুন পাঠ করুন। আল্লাহ করুন আপনার দেহে কম্পন ধরে যায় এবং আপনি এই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যান যার মধ্যে আপনি ত্রুটিপূর্ণ অধ্যয়নের কারণে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন।

৫. জাতির কেন্দ্র

পঞ্চম যে বিষয়টি আপনি বলেছেন তা আপনার ভাষায় এই যেঃ "দীনের দাবী যেহেতু এই ছিল যে, সামগ্রিকভাবে কুরআনের উপর আমল হবে এবং এটা হতে পারে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী কুরআনের উপর আমল করবে। তাই সার্বিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য একজন জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন এবং আমি এও অনুভব করি যে, যেখানে সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েমের প্রশ্ন রয়েছে, সেই লক্ষে যে ব্যক্তি পৌঁছিয়ে দেন তার স্থান ও মর্যাদা অনেক উপরে। কারণ তিনি পয়গাম এজন্য পৌঁছিয়ে দেন যে, ওহী তিনি ছাড়া আর কারও নিকট আসে না সুতরাং কুরআন মজীদ এজন্য পরিষ্কার করে দিয়েছে যে مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ. "কেউ রসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল" অতপর রসূলুল্লাহ (স) উম্মাতের

কেন্দ্রবিন্দুও ছিলেন। আর রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের উপর আমল করার অর্থ এই যে, তাঁর অবর্তমানেও (ইন্তেকালের পরও) এই কেন্দ্রিকতাকে কায়েম রাখা হবে। অতপর এই বিষয়টি কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে তুলে ধরেছেঃ

وَمَا مُحَمَّدًا اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ ـ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ

এই বিষয়টি আপনি ভালোভাবে খুলে বর্ণনা করেননি। আপনার সামগ্রিক বক্তব্য থেকে আপনার যে উদ্দেশ্য বুঝা যায় তা এই যে, রসূলুল্লাহ (স)–কে শুধুমাত্র সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য নিজ যুগে রসূল ছাড়াও "জাতির কেন্দ্রবিন্দু"ও বানানো হয়েছিল। তাঁর "রসূল" হওয়ার মর্যাদা তো চিরস্থায়ী ছিল বটে, কিন্তু "জাতির কেন্দ্র" হওয়ার মর্যাদা কেবলমাত্র সেই সময় পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ তাঁর জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিচালনা করছিল। অতপর তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর পরে যে জীবন্ত ব্যক্তিত্বকে এই ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য নেতা বানানো হয়েছিল এবং এখন বানানো হবে সে নিজ যুগের জন্য রসূলুল্লাহ (স)–এর অনুরূপই 'জাতির কেন্দ্র' ছিলেন এবং থাকবেন। এখন রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের অনুসরণের অর্থ এই যে, আমরা সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য একের পর এক ধারাবাহিকভাবে 'জাতির কেন্দ্রবিন্দু' কায়েম করতে থাকব। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের 'জাতির কেন্দ্রবিন্দুগণের' উপর যদি রসূলুল্লাহ (স)–এর কোন প্রাধান্য থেকে থাকে তবে শুধু এতটুকু যে, কুরআন মজীদ পৌছে দেয়ার কারণে তাঁর স্থান অনেক উপরে।

কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন

আপনার বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি তা যদি সঠিক না হয় তবে আপনি সংশোধন করে দিন। বক্তব্য প্রদানকারী হিসাবে আপনার নিজের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সঠিক হবে। কিন্তু আমি যদি আপনার উদ্দেশ্য সঠিক অনুধাবন করে থাকি তবে এর উপর কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়ঃ

"জাতির কেন্দ্র" বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন? আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে রসূলুল্লাহ (স)–এর রিসালাতের দায়িত্বের যে বিস্তারিত বিবরণ

---

১. এখানেও আয়াত উধৃত করতে গিয়ে ভুল করা হয়েছে। وَمَا مُحَمَّدًا ـ নয় বরং وَمَا مُحَمَّدٌ হবে। مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ ـ নয় বরং مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ হবে।

দান করেছেন তা হলো--আল্লাহ্‌র কিতাব পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত, তিনি এই কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী, তদনুযায়ী কাজ করার কৌশল শিক্ষাদানকারী, ব্যক্তি ও সমাজের পরিশুদ্ধকারী, মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ, তিনি পথপ্রদর্শক, তাঁর আনুগত্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক, আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের অধিকারী, আইন প্রণেতা (Law giver), বিচারক ও রাষ্ট্রপ্রধান। কুরআন মজীদ আমাদের বলে, এসব পদ রসূল হওয়ার কারণেই মহানবী (স) লাভ করেন এবং রিসালাতের পদে সমাসীন হওয়ার অর্থই এই ছিল যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই তিনি এসব পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কিত কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য আমি ইতিপূর্বে নকল করে এসেছি যার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রোয়জন।

এখন যেহেতু 'জাতির কেন্দ্র' কুরআনের পরিভাষা নয়, বরং আপনাদের সকপোলকল্পিত পরিভাষা, তাই অনুগ্রহপূর্বক আপনি বলুন, 'জাতির কেন্দ্র' নামক পদটি কি উপরোক্ত পদসমূহ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন পদ? নাকি এসব পদের সমষ্টি? অথবা ঐসব পদের কতগুলো এর অন্তর্ভুক্ত এবং কতগুলো এর বহির্ভূত? যদি তা উপরোক্ত পদসমূহ ব্যতীত ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে তবে তা কি এবং মহানবী (স)-এর এই পদ সম্পর্কিত জ্ঞান আপনি কোন্ সব মাধ্যমে লাভ করেছেন? যদি তা উপরোক্ত পদসমূহের সমষ্টি হয়ে থাকে তবে আপনি এটাকে কিভাবে রিসালাত থেকে পৃথক সাব্যস্ত করতে পারেন? আর যদি উপরোক্ত পদসমূহের কতিপয় পদ 'জাতির কেন্দ্র' শীর্ষক পদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে এবং কতেক রিসালাতের পদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা কোন্ কোন্ পদ যা 'জাতির কেন্দ্র'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সেগুলোকে কোন্ সব দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি রিসালাতের পদ থেকে বিছিন্ন করছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন 'জাতির কেন্দ্রে' সমাসীন হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকাশ থাকে যে, এই সমাসীন তিনটি পন্থায় হতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলা কোন ব্যক্তিকে মুসলমানদের জন্য জাতির কেন্দ্রবিন্দু নিয়োগ করবেন। (দুই) মুসলমানগণ নিজেদের মর্জি মাফিক তাকে নির্বাচন করবে। (তিন) কেউ জাতির কেন্দ্রবিন্দুর পদটি জোরপূর্বক দখল করবে। এখন প্রশ্ন হল, জাতির কেন্দ্র বলতে যাই বুঝানো হোক, মহানবী (স) উপরোক্ত তিন পন্থার মধ্যে কোন্ পন্থায় শেষ পর্যন্ত উক্ত পদে সমাসীন হয়েছিলেন? আল্লাহ তাআলা কি তাঁকে উক্ত পদে নিয়োগ করেছিলেন? নাকি মুসলমানগণ তাঁকে এই পদের জন্য নির্বাচন করেছিলেন? অথবা মহানবী (স) নিজেই জাতির কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিলেন? এর মধ্যে যে পন্থাটির কথাই আপনি গ্রহণ করবেন তার সুস্পষ্ট

ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। আর একথারও ব্যাখ্যা হওয়া দরকার যে, মহানবী (স)–এর পর যে ব্যক্তিই 'জাতির কেন্দ্রবিন্দু' হবে সে কি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তালিকাভুক্ত ও সমাসীন হবে, নাকি মুসলমানগণ তাকে জাতির কেন্দ্রবিন্দু নির্বাচন করবে? অথবা সে নিজেই বাহুবলে এই পদে সমাসীন হবে? যদি উভয়ের নিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে আপনার মতে কোন পার্থক্য না থেকে থাকে তবে খোলাখুলিভাবে একথা বলে দিন যাতে আপনার অবস্থান অস্পষ্ট না থাকে। আর যদি পার্থক্য থেকে থাকে তবে বলে দিন যে, সেই পার্থক্যটা কি এবং এই পার্থক্যের কারণে উভয় প্রকারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মর্যাদা ও এখতিয়ারের মধ্যেও কোন মৌলিক পার্থক্য সূচীত হয় কি না?

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, "যিনি পৌঁছিয়ে দেন তার স্থান ও মর্যাদা অনেক উপরে" একথা বলে আপনি অনুগ্রহপূর্বক রসূলুল্লাহ (স)–কে জাতির অন্যান্য "কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের" উপর যে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছেন তা কি শুধু স্তর ও মর্যাদাগত প্রাধান্য অথবা আপনার মতে উভয়ের পদের ধরন ও প্রকৃতির মধ্যেও কোন পার্থক্য আছে? আরও অধিক পরিষ্কার বাক্যে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আচ্ছা আপনার ধারণা মতে জাতির কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে রসূলুল্লাহ (স)–এর যেসব এখতিয়ার ছিল তাঁর ইন্তেকালের পর সেই এখতিয়ার কি তাঁর পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকট স্থানান্তর হয়? এখতিয়ারের দিক থেকে তাঁরা উভয়ে কি সম মর্যাদার অধিকারী? আর অন্যদের উপর মহানবী (স)–এর প্রাধান্য কি শুধু এতটুকুই যে, তিনি তাঁর পরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তুলনায় কিছুটা অধিক সম্মানের যোগ্য, কারণ তিনি কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন? এটাই যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে তবে বলুন যে, মহানবী (স)–এর পরে যে ব্যক্তি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসীন হবে অথবা যাকে আসীন করানো হবে তার মর্যাদাও কি এরূপ হবে যে, তার সিদ্ধান্ত অমান্য করা তো দূরের কথা, এর বিরুদ্ধে মনের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুভব করলেও ব্যক্তির ঈমান চলে যায়? তার মর্যাদাও কি এরূপ যে, সে নিজে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তার বিপরীত মত পোষণ করার অধিকারটুকুও মুসলমানদের নেই? তার অবস্থানও কি এরূপ যে, তার সাথে মুসলমানগণ বিতর্ক করতে পারবে না এবং তার নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া ছাড়া উম্মাতের কোন উপায় নেই যদি সে মুমিন থাকতে চায়? এই জীবন্ত ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগণ যারা জাতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সমাসীন হবে তারা কি অনুসরণীয় আদর্শ যে, মুসলমানগণ তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি দেখবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে নিজেদেরকে তাদের মত গড়ে তুলবে? তারাও কি আমাদের পরিশুদ্ধি, কিতাব ও হিকমতের শিক্ষাদান এবং "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন"

তার ভাষ্য প্রদানের জন্য 'প্রেরিত' হয়েছেন যে, তাদের বক্তব্য দলীল প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত?

আপনি এসব প্রশ্নের উপর কিছুটা সবিস্তার আলোকপাত করলে কতই না ভালো হয় যাতে এই "জাতির কেন্দ্রের" সঠিক অবস্থান ও মর্যাদা সকলের সামনে প্রতিভাত হয়ে যায়, যার চর্চা আমরা দীর্ঘদিন যাবত শুনে আসছি।

৬. মহানবী (স) কি কুরআন পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই নবী ছিলেন?

আপনার নিজের বাক্যে "আপনার আগের প্রশ্ন এই যে, মহানবী (স) তেইশ বছরের নবূওয়াতী জীবনে যে কাজ করেছেন তাতে তাঁর মর্যাদা কি ছিল? আমার উত্তর এই যে, মহানবী (স) যা কিছু করে দেখিয়েছেন তা একজন মানুষ হিসাবে। কিন্তু "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী করে দেখিয়েছেন। মহানবী (স)-এর রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদন ছিল ব্যক্তি হিসাবে। আমার এই উত্তর আমার নিজের মন-মগজ প্রসূত নয়, বরং আল্লাহর কিতাব থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স) বারংবার একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আমি তোমাদের মতই মানুষ)।"

উপরোক্ত বাক্যে আপনি আমার যে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তা মূলতঃ এই ছিল যে, এই নবূওয়াতী জীবনে রসূলুল্লাহ (স) কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়া ছাড়াও অন্যান্য যেসব কাজ করেছিলেন তা কি নবী হিসাবে করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি কুরআন মজীদের অনুরূপ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতেন? অথবা এসব কাজে কি তার পজিশন একজন সাধারণ মুসলমানের অনুরূপ ছিল? এই প্রশ্নের যে উত্তর আপনি দিয়েছেন তা এই যে, 'মহানবী (স) একাজ ব্যক্তি হিসাবে করেছেন, কিন্তু "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী করেছেন।' অন্য কথায় আপনি বলতে চান যে, মহানবী (স) শুধুমাত্র কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়ার সীমা পর্যন্তই নবী ছিলেন। এরপরে একজন নেতা ও পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, মুরুব্বী, আইন প্রণেতা, বিচারক এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে তিনি যা কিছু করেছেন তা নবী হিসাবে নয়, বরং একজন সাধারণ মসলমান হিসাবে করেছেন। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তিনি নবী ছিলেন না, বরং একজন সাধারণ মুসলমান ছিলেন, যিনি কুরআন অনুযায়ী আমল করেছিলেন। আপনি দাবী করছেন যে, কুরআন মজীদ মহানবী (স)-এর এই মর্যাদাই বর্ণনা করেছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি কুরআন পাকের যে সুস্পষ্ট আয়াত উধৃত করেছি তা পাঠ করার পর কোন বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই এটা মেনে নিতে পারে না যে, বাস্তবিকই কুরআন মজীদ মহানবী (স)-কে এই মর্যাদা দিয়েছে।

আপনি কুরআন মজীদ থেকে একটি অর্ধ সমাপ্ত কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, মহানবী (স) বারবার أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ (আমি তোমাদের মতই মানুষ) বলতেন। পূর্ণাংগ কথা যা কুরআন পাকে রয়েছে তা হচ্ছে–মুহাম্মাদ (স) এমন একজন মানুষ যাঁকে রসূল বানানো হয়েছে

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ـ "বল হে মুহাম্মাদ! পবিত্র আমার প্রতিপালক, আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল"–(ইসরাঃ ৯৩) এবং মহানবী (স) এমন একজন মানুষ যাঁর উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী আসে قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ـ "বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়"–(আল–কাহ্‌ফঃ ১১০)। আপনি কি একজন সাধারণ মানুষ এবং রিসালাতের অধিকারী ওহীপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছেন না? যে মানুষ আল্লাহ্‌র রসূল, তিনি তো অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর বার্তাবাহক, এবং যে মানুষের কাছে ওহী আসে তিনি তো সরাসরি আল্লাহর দেয়া পথনির্দেশনার অধীনে কাজ করেন। তাঁর মর্যাদা এবং একজন সাধারণ মানুষের মর্যাদা কি করে এক সমান হতে পারে?

আপনি যখন একথা বলেন যে, মহানবী (স) "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী কাজ করতেন, তখন আপনার মতে "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন"–এর অর্থ কুরআন মজীদ। তাই আপনি শব্দগতভাবে একটি সত্য কথা কিন্তু অর্থগতভাবে একটি ভ্রান্ত কথা বলেন। নিঃসন্দেহে মহানবী (স) "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর উপর শুধু সেই ওহীই নাযিল হত না যা কুরআনে পাওয়া যায়, বরং এ ছাড়াও তিনি ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ প্রাপ্ত হতেন। এর একটি প্রমাণ আমি আপনার চতুর্থ দফার জওয়াব দিতে গিয়ে পেশ করেছি। আরও প্রমাণ ইনশাআল্লাহ আপনার দশম দফা সম্পর্কে আলোচনাকালে পেশ করব।

৭. মহানবী (স)– এর ইজতিহাদী ভুলকে ভ্রান্ত প্রমাণ হিসাবে পশ করা হয়েছে

সপ্তম দফায় আপনি লিখেছেনঃ "কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মহানবী (স)–এর মর্যাদা ছিল একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং কখনও কখনও তাঁর ইজতিহাদী ভুল হয়ে যেত।

---

১. এক নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে শব্দটি يوحى নয়, বরং يُوحَىٰ হবে।

২. দুই নম্বরে উল্লেখিত আয়াতটি সূরা রূমের নয়, বরং সূরা সাবার ৩৪ নং আয়াত।

(১) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (سبا ٥٠)

দ্বীন ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করার মত ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার সংশোধনীও এসে যেত। যেমন এক যুদ্ধের প্রাক্কালে কতিপয় লোক যুদ্ধে যোগদান না করে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল এবং মহানবী (স)-ও অনুমতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়ঃ

(২) عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ـ (توبة ٤٣)

অনুরূপভাবে সূরা তাহ্‌রীমেও সংশোধনী এসেছেঃ

(৩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ـ

অনুরূপভাবে সূরা আবাসায়ঃ

(৪) عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۝ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۝ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۝ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ـ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কতটা অগভীর ও সামান্যতম অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে লোকেরা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয় সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে বসে। আপনার ধারণা কি এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, আবার স্বয়ং তিনিই তাঁকে অনির্ভরযোগ্য, ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট প্রমাণ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহও কুরআন মজীদে নাযিল করেছেন, যাতে লোকেরা যেন নিশ্চিন্ত মনে তাঁর আনুগত্য না করে? আফসোস! আপনি যদি কুরআনের পোষ্ট মর্টেম করার পূর্বে এসব আয়াতের উপর এতটা চিন্তা করে দেখে থাকতেন যতটা চিন্তাভাবনা একজন ডাকতার তার রোগীর এক্স-রে রিপোর্ট সম্পর্কে করে থাকেন।

প্রথম আয়াত قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ দ্বারা আপনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, স্বয়ং কুরআনের আলোকে রসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও পথভ্রষ্ট হয়ে

গেতেন এবং তাঁর জীবন মূলত পথভ্রষ্টতা ও হেদায়াতের সমষ্টি ছিল (আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি)। এটা প্রমাণ করার সময় আপনি একটুও চিন্তা করে দেখেননি যে, আয়াতটি কোন্ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফেররা মহানবী (স)-এর প্রতি যে আপবাদ আরোপ করত, আল্লাহ তাআলা সূরা সাবায় প্রথমে তা উল্লেখ করেনঃ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ

"এ ব্যক্তি সজ্ঞানে হয় আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করছে অথবা সে পাগল"-(আয়াত নং ৮)। অতপর এই অপবাদের উত্তর দিতে গিয়ে ৪৬-৫০ নং আয়াতে দুই নম্বর অপবাদ সম্পর্কে বলেন যে, তোমরা এককভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও জিদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নির্ভেজালভাবে চিন্তা কর। স্বয়ং তোমাদের অন্তরই সাক্ষ্য দেবে যে, এই ব্যক্তি যিনি তোমাদের ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর মধ্যে পাগলামীর লেশমাত্রও নেই। অতপর তাদের দ্বিতীয় অপবাদ (এ ব্যক্তি সজ্ঞানে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে)-এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, হে নবী! বল إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ - মূলত এই সত্য বাণী আমার প্রতিপালক নাযিল করেন, إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي - "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই (যেমন তোমরা অপবাদ দিচ্ছ) তবে আমার এই পথভ্রষ্টতার পরিণতি আমার উপর পতিত হবে", وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي - "আর আমি যদি সত্যপথে থাকি তবে তা আমার উপর আমার প্রতিপালকের নাযিলকৃত ওহীর ভিত্তিতে", إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ - "তিনি সবকিছু শ্রবণকারী নিকটবর্তী।" অর্থাৎ আমি পথভ্রষ্ট না তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত তা তাঁর নিকট গোপন নয়। এই প্রেক্ষাপটে যে কথা বলা হয়েছে, আপনি তার এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন মক্কার কাফেরদের সামনে তাঁর রসূলকে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যে, তিনি (স) বাস্তবিকই কখনও পথভ্রষ্ট হয়ে যান, আবার কখনও সোজা রাস্তায়ও চলে থাকেন। সুবহানাল্লাহ! কি আশ্চর্য ধরনের কুরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবন।

আপনার উধৃত দ্বিতীয় আয়াত থেকে আপনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মহানবী (স) কর্তৃক প্রদত্ত ফয়সালাসমূহে তিনি অনেক ভুলভ্রান্তি করেছেন যার

---

৩. নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে النَّبِيَّ - নয়, বরং - النَّبِيُّ হবে।

৪. নম্বরে উল্লেখিত আয়াতেও মারাত্মক ভুল রয়েছে। সঠিক আয়াত হবে لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ অনুরূপভাবে (৫) কুরআন মজীদে يَزَّكَّىٰ রয়েছে, يَتَزَكَّىٰ নয়।

কয়েকটি নমুনা আল্লাহ্ তাআলা এখানে তুলে ধরেছেন যাতে লোকেরা সাবধান হয়ে যায়। অথচ তা থেকে মূলত সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। তা থেকে তো জানা যায় যে, মহানবী (স)-এর গোটা নবুওয়াতী জিন্দেগীতে মাত্র ঐ কয়েকটি পদস্খলন ঘটেছিল যা আল্লাহ্ তাআলা সাথে সাথে সংশোধন করে দিয়েছেন। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে তাঁর প্রমাণিত সুন্নাতসমূহের উপর আমল করতে পারি। তার মধ্যে যদি আরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকত তবে আল্লাহ্ তাআলা সেগুলোরও সংশোধন করে দিতেন, যেভাবে তিনি ঐ কয়টি ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করে দিয়েছেন।

অতপর আপনি যদি কিছুটা চিন্তাভাবনা করে থাকতেন যে, এগুলো কি ধরনের ত্রুটি যার কারণে আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করে তাঁকে সতর্ক করেছেন! যুদ্ধের সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে কাউকে সামরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতিদান, কোন হালাল জিনিস না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা, এক বৈঠকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দানকালে বাহ্যত একজন সাধারণ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য না করা-এগুলো কি এতই বৃহৎ বিষয় যার প্রভাব দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর প্রতিফলিত হতে পারে? এমন কোন নেতা, রাষ্ট্রনায়ক, অথবা আপনার পরিভাষায় "জাতির কেন্দ্রবিন্দু" আছে কি যিনি জীবনে একাধিকবার এই ধরনের, বরং এর চেয়েও মারাত্মক ভুলের শিকার হননি? আর এসব ভুলের সংশোধনের জন্য কি সব সময় আসমান থেকে ওহী নাযিল হত? শেষ পর্যন্ত এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, এতটা সামান্য ভুল-ত্রুটি যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বারা হয়ে গেল তখন সাথে সাথে তার সংশোধনের জন্য ওহী এসে গেল এবং তাকে কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হল? আপনি বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করলে জানতে পারতেন যে, রিসালাতের পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা হৃদয়ংগম করতে গিয়ে আপনি কত বড় হোঁচট খেয়েছেন। কোন নেতা, সমাজ প্রধান বা জাতির কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্র বাণীবাহক নয়। তার নিয়োগকৃত আইন প্রণেতা এবং তার নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি অনুসরণীয় আদর্শও নয়। এজন্য তার কোন মারাত্মক ভুলও ইসলামী আইনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কারণ এর দ্বারা শরীআতের মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় ঘোষণা অনুযায়ী দুনিয়াবাসীর সামনে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঈমানদার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার আনুগত্য ও অনুসরণ কর, তিনি যা কিছু হালাল বলেন তাকে হালাল মেনে নাও এবং যা

কিছু হারাম বলেন তা হারাম হিসাবে বর্জন কর, তাই তাঁর কথা ও কাজে সামান্যতম ত্রুটিও মারাত্মক ছিল, আর তা কোন সাধারণ মানুষের ভুল ছিল না, বরং এমন একজন আইন প্রণেতার ভুল যাঁর প্রতিটি গতি ও স্থিতি আইনে পরিণত হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার, ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ রাখার এবং তাঁর সামান্যতম ত্রুটি হয়ে গেলেও ওহীর সাহায্যে এর প্রতিবিধানের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন।

৮. কাল্পনিক ভীতি

অষ্টম দফায় আপনি বলেছেন যে, মহানবী (স) যদি এসব কাজ মানুষ (অর্থাৎ একজন সাধারণ ও পাপ থেকে অমুক্ত ব্যক্তি) হিসাবে নয়, বরং নবী হিসাবে করে থাকতেন তবে তা থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে দুটি পরিণতির সৃষ্টি হয়। (এক) মহানবী (স)-এর পরে একাজ অব্যাহত রাখা অসম্ভব বিবেচিত হত এবং লোকেরা মনে করত যে, মহানবী (স) যে জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করে অব্যাহত রেখেছিলেন তা কায়েম করা ও অব্যাহত রাখা সাধারণ লোকদের সাধ্যের অতীত। (দুই) এই কাজ অব্যাহত রাখার জন্য লোকেরা মহানবী (স)-এর পরও নবীদের আগমনের প্রয়োজন অনুভব করবে।

এই দুটি পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আপনার মতে একমাত্র পন্থা হলো, কুরআনের প্রচার ব্যতীত মহানবী (স)-এর জীবনের অন্যসব কাজ রসূলের নয়, বরং একজন অ-নবী ব্যক্তির কাজ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই প্রসংগে আপনি আরও দাবী করেন যে, এগুলোকে রসূলের কাজ মনে করাটা খতমে নবুওয়াতের আকীদাকে নাকচ করে দেয়। কারণ রসূলুল্লাহ্ (স) যদি এসব কাজ ওহীর নির্দেশনায় করে থাকেন তবে এরপরও ঐসব কাজ করার জন্য সর্বকালে ওহী আসার প্রয়োজন অবশিষ্ট থেকে যাবে, অন্যথায় দীন কায়েম থাকবে না।

আপনি এই যা কিছু বলেছেন, তা কুরআন ও তার নাযিলের ইতিহাস থেকে চোখ বন্ধ করে নিজের কল্পনার জগতে উদ্‌ভ্রান্তের মত হাবুডুবু খেয়ে চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন। আপনার এসব কথায় আমার সন্দেহ হয় যে, আপনার দৃষ্টির সামনে কুরআন পাকের কেবল সেই সব আয়াত পতিত হয়েছে যেগুলো সুন্নাত-বিরোধীগণ তাদের সাহিত্যে একটি বিশেষ মতবাদ প্রমাণের জন্য নকল করেছে এবং সেগুলোকে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে জোড়াতালি দিয়ে তারা যে তাৎপর্য বের করেছে, আপনি তার উপর ঈমান এনেছেন। তাই যদি না হত এবং আপনি যদি একটি বারও গোটা কুরআন মজীদ বুঝে পাঠ করে থাকতেন তবে জানতে পারতেন যে, আপনার মতে সীরাতে পাককে

রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত মানার কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয়, এসব বিপদ কুরআন পাককে আল্লাহ্‌র ওহী মানার কারণেও সৃষ্টি হয়। স্বয়ং কুরআন মজীদ সাক্ষ্য যে, এই গোটা কিতাব একই সময়ে একটি আইন গ্রন্থ হিসাবে নাযিল হয়নি, বরং তা সেই সব ওহীর সংকলন যা একটি আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দানের জন্য তেইশ বছর ধরে আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হতে থাকে। তা অধ্যয়ন করতে গিয়ে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন মনোনীত ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং পদে পদে আল্লাহ্‌র ওহী তাঁকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর উপর অভিযোগের তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং আসমান থেকে এর জবাব আসছে। বিভিন্ন রকমের বাধাবিপত্তি চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে এবং তা অতিক্রমের পন্থা উপর থেকে বলে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রতিবন্ধকতা এভাবে দূর কর এবং ঐ বিরোধিতার এভাবে মোকাবিলা কর। অনুসারীরা বিচিত্র রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তার সমাধান উপর থেকে বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের এই অসুবিধা এভাবে দূর হতে পারে এবং অমুক অসুবিধা এভাবে দূর হতে পারে। অতপর এই আন্দোলন যখন অগ্রগতি লাভ করতে করতে একটি রাষ্ট্রের স্তরে প্রবেশ করে তখন নতুন সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র নির্মাণের সমস্যা থেকে শুরু করে মুনাফিক, ইহূদী এবং আরব মুশরিকদের সাথে দ্বন্দ্ব–সংঘাত পর্যন্ত যত সমস্যাই দশ বছর ধরে উদ্ভূত হতে থাকে সেসব ক্ষেত্রেই ওহী এই সমাজের নির্মাতা, এই রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং এই সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পথপ্রদর্শন করে। শুধু এতটুকুই নয় যে, এই নির্মাণ ও সংঘাতের প্রতিটি পর্যায়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধানের জন্য আসমান থেকে হেদায়াত আসে, বরং কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হলে সেজন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রধান সেনাপতির ভাষণও আসমান থেকে আসে। আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে কখনও দুর্বলতা দেখা দিলে তার প্রতিবিধানের জন্য আসমান থেকে উপদেশবাণী নাযিল হয়। নবীর স্ত্রীর উপর শত্রুরা অপবাদ আরোপ করলে তার প্রতিবাদ আসমান থেকে আসে। মুনাফিকরা ক্ষতিকর মসজিদ (মসজিদে দিরার) নির্মাণ করে, তা ধ্বংসের নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়। কিছু লোক যুদ্ধে যোগদান থেকে পালিয়ে থাকলে তাদের বিষয়টির ফয়সালা সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। কোন ব্যক্তি শত্রুপক্ষের নিকট গোপন পত্র লিখে পাঠালে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বাস্তবিকই যদি আপনার নিকট এগুলো হতাশাপূর্ণ কথা হয়ে থাকে যে, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে আন্দোলন উত্থিত হয় তার পথনির্দেশনা ওহীর

মাধ্যমে হোক, তবে এই হতাশার কারণ তো স্বয়ং কুরআন মজীদেও বর্তমান রয়েছে। এক ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিভংগী গ্রহণের পর তো বলতে পারে যে, যে দীন কায়েমের জন্য চেষ্টা–সাধনার প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে কৃতকার্যতার শেষ মনযিল পর্যন্ত প্রতিটি প্রয়োজনের এবং প্রতিটি সংকটপূর্ণ পর্যায়ে আন্দোলনের নেতার পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াতসমূহ নাযিল হতে থাকে, তাকে এখন কিভাবে কায়েম করা যেতে পারে যতক্ষণ একইভাবে দীনের ব্যবস্থা কায়েমের জন্য চেষ্টাসাধনাকারী "জাতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের" সাহায্যের জন্যও আল্লাহর তরফ থেকে আয়াত নাযিলের ধারা শুরু না হবে?

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর জন্য তো সঠিক কর্মপন্থা এই ছিল যে, মহানবী (স)–এর নবূওয়াতের প্রথম দিনই একটি পূর্ণাংগ আইনগ্রন্থ তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হত যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে নিজের সমস্ত নির্দেশনা একই সময় তাঁকে দিয়ে দিতেন। অতপর খতমে নবূওয়াতের ঘোষণা দিয়ে অবিলম্বে মহানবী (স)–এর স্বীয় নবূওয়াতও খতম করে দেয়া হত। এরপর তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ নন, বরং আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের কাজ ছিল যে, তিনি অ–নবী হিসাবে এই আইনের কিতাব নিয়ে চেষ্টা–সাধনা করতেন এবং "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন" তদনুযায়ী একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করে দেখাতেন। মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলা মোক্ষম সময়ে সঠিক পরামর্শ পাননি এবং তিনি এমন অনুপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন যা ছিল ভবিষ্যতে দীন কায়েমের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। বিপদ তো এই যে, তিনি এই পরিণামদর্শিতার কথা সেই সময়ও অনুধাবন করতে পারেননি যখন তিনি খতমে নবূওয়াতের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা সূরা আহ্যাবে প্রদান করা হয়েছে যা সেই যুগের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন হযরত যায়েদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন, অতপর মহানবী (স) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ করেন। এই ঘটনার পর কয়েক বছর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) 'জাতির কেন্দ্রবিন্দু' ছিলেন এবং খতমে নবূওয়াতের ঘোষণা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও না মহানবী (স)–এর নবূওয়াত খতম করা হয়েছিল, আর না ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দিকনির্দেশনা দানের অব্যাহত ধারা বন্ধ করা হয়েছিল।

আল্লাহ পাকের এই পরিকল্পনার সাথে আপনার ঐক্যমত বা বিরোধ যাই থাক না কেন, কুরআন মজীদ আমাদের বলে দিচ্ছে যে, প্রথম থেকেই তাঁর পরিকল্পনা এরূপ ছিল না যে, মানব জাতির হাতে একটি কিতাব তুলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এই কিতাব দেখে তোমরা নিজেরাই ইসলামী জীবন–ব্যবস্থা গড়ে তোল। এটাই যদি তাঁর পরিকল্পনা হত তবে একজন মানুষ

বেছে নিয়ে চুপে চুপে তাঁর হাতে কিতাব তুলে দেয়ার কি প্রয়েঅজন ছিল? এজন্য তো উত্তম পন্থা এই ছিল যে, একটি কিতাব মুদ্রিত আকারে আল্লাহ তাআলা সরাসরি গোটা মানব গোষ্ঠীর হাতে পৌছে দিতেন এবং ভূমিকায় এই কথা লিখে দিতেন যে, আমার এই কিতাব পাঠ কর এবং সত্য সঠিক ব্যবস্থা কায়েম কর। কিন্তু আল্লাহ পাক এই পন্থা পছন্দ করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হলো, তিনি একজন মানুষকে রসূল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করান এবং তাঁর মাধ্যমে সংস্কার ও বিপ্লবের একটি আন্দোলন পরিচালনা করান।

এই আন্দোলনে আসল কর্মকর্তা কিতাব ছিল না, বরং ছিলেন সেই জীবন্ত মানুষটি যাঁকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই মহামানবের সাহায্যে আল্লাহ তাআলা নিজের তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় একটি পরিপূর্ণ চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং ন্যায়-ইনসাফ, আইন-কানুন, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে এবং তা কার্যকর করে সর্বকালের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (اسوة حسنة) হিসাবে দুনিয়ার সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে কল্যাণকামী ও মুক্তিকামী যে কোন ব্যক্তি এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তদনুযায়ী নিজর জীবন ব্যবস্থা গঠন করার চেষ্টা চালাতে পারে। এই দৃষ্টান্তের মধ্যে ত্রুটি থাকার অর্থ হচ্ছে, হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনার মধ্যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যাওয়া। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই নমুনা সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে গঠন করেছেন, এর নির্মাতাকে নির্মাণ কাঠামোও দিয়েছেন এবং তার তাৎপর্যও নিজেই বুঝিযে দিয়েছেন, তাঁকে নির্মাণ কৌশলও শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রাসাদের এক একটি কক্ষ নির্মাণের সময় তার দেখাশুনাও করেছেন। নির্মাণকার্য চলাকালীন প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে পথনিদের্শনা দান করেছেন এবং পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমেও। কোথাও কোন ইটের গাঁথুনি দিতে গিয়ে সামান্য ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথেই তিনি তার সংশোধন করে দিয়েছেন, যাতে চিরকালের জন্য নমুনাস্বরূপ নির্মিত প্রাসাদে সামান্যতম ত্রুটিও না থাকতে পারে। অতপর এই নির্মাতা (রসূল) যখন নিজের মনিবের সঠিক মর্জি অনুযায়ী এই নির্মাণকার্য শেষ করেন তখন দুনিয়ার সামনে ঘোষণা দেয়া হলঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ তোমাদর জন্য তোমাদর দীন পূর্ণাংগ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম"-(সূরা মাইদাঃ ৩)।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য যে, এই কর্মপন্থা বাস্তবিকই উম্মাতের মধ্যে কোন নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর যখন ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল তখন খুলাফায়ে রাশেদীন একের পর এক ওহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই নমুনা স্বরূপ নির্মিত প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নমুনার আরও ব্যপ্তির জন্য কি চেষ্টাসাধনা করেননি? উমার ইবন্ আবদুল আযীয (রহ) কি তা একটি ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ নতুনভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেননি? যুগে যুগে সত ও নেককার শাসকগণ এবং মহান সংস্কারকগণও এই নমুনার অনুসরণের জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকাসমূহে আত্মপ্রকাশ করেননি? তাঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে এই কথা বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তো ওহীর সাহায্যে এই কাজ করে গেছেন এখন তা আমাদের সাধ্যাতীত? বাস্তবিকপক্ষে এটা তো আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ যে, তিনি মানবেতিহাসে তাঁর রসূলের বাস্তব অবদানকে আলোর মীনার হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা শত শত বছর ধরে মানব জাতিকে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থার নকশা প্রদর্শন করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে থাকবে। আপনার মন চাইলে আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন অথবা তা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখুন।

৯. খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি অপবাদ

আপনার নবম দফা হলোঃ "খলীফাগণ উত্তমরূপেই জানতেন যে, ওহী আল-কিতাব এর মধ্যে সংরক্ষিত আছে এবং অতপর মহানবী (স) যা কিছু করতেন তা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসতে পারেনি। রাজ্যের সীমা বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনের তালিকাও দীর্ঘ হতে থাকে। এজন্য সামনের দিনগুলোতে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এর সমাধানের জন্য পূর্বের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে এবং তার মধ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে খলীফাগণ তা হুবহু বহাল রাখতেন। আর পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এসব কিছুই কুরআনের আলোকে করা হত। এটাও ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রদর্শিত পন্থা এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তগণও তা কায়েম রাখেন। এরই নাম ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ।"

উপরোক্ত বক্তব্যে আপনি পরপর কয়েকটি ভ্রান্ত কথা বলেছেন। আপনার প্রথম ভ্রান্তি হলো, রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করতেন তা পারস্পরিক পরামর্শের

ভিত্তিতে করতেন। অথচ রসূলুল্লাহ (স) কেবল কাজ সমাধার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কেই পরামর্শ করেছেন এবং সেগুলোও ঐসব পন্থাপদ্ধতি যে সম্পর্কে ওহীর সাহায্যে তিনি কিছু প্রাপ্ত হননি। কুরআন পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তার কোন শব্দের বা বাক্যাংশের বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণে তিনি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের ব্যাখ্যাই ছিল চূড়ান্ত। অনুরূপভাবে তাঁর গোটা নবূওয়াতী জিন্দেগীতে কখনও লোকের জন্য কোন কিছু ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্য কোন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং সমাজে কি রীতিনীতি ও বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা হবে সে সম্পর্কেও এ ধরনের কোন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। মহানবী (স)-এর পবিত্র জিন্দেগীতে কেবলমাত্র তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর বাস্তব জীবনধারাই ছিল আইন পরিষদ। কোন ঈমানদার ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়ে মহানবী (স)-এর সামনে মুখ খোলার চিন্তাও করতে পারত না। আপনি কি এমন কোন উদাহরণ পেশ করতে পারেন যে, রিসালাত যুগে কুরআন পাকের কোন নির্দেশের ব্যাখ্যা পরামর্শের ভিত্তিতে করা হয়েছে, অথবা কোন আইন পরামর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে? অনেকগুলোর প্রয়োজন নাই, আপনি কেবল একটি দৃষ্টান্তই পেশ করুন।

দ্বিতীয়ত, বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী কথা আপনি এই বলেছেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন শুধুমাত্র কুরআন মজীদকে হেদায়াতের উৎস মনে করতেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কাজকে অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় আইনের উৎস মনে করতেন না। এটা তাঁদের প্রতি আপনার আরোপিত মারাত্মক অপবাদ যার সমর্থনে আপনি তাঁদের কোন কথা বা কার্যক্রম পেশ করতে পারবেন না। যদি এর কোন প্রমাণ আপনার নিকট থেকে থাকে তবে তা পেশ করুন। তাঁদের কার্যক্রমের যে সাক্ষ্য তাঁদের যুগের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা পেশ করেছেন তা তো নিম্নরূপঃ

ইব্‌নে সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, "আবু বাক্‌র (রা)-র সামনে যখন কোন বিষয় পেশ করা হত এবং তিনি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন সমাধান না পেতেন আর সুন্নাতেও না পেতেন তার কোন নযীর, তখন তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং বলতেনঃ এটা আমার ব্যক্তিগত মত, যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ্‌র-ই অনুগ্রহ"-(ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, ১খ, পৃ. ৫৪)।

মায়মূন ইবনে মিহ্‌রান (২৭-১০৭ হি.) বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কর্মনীতি এই ছিল যে, তাঁকে কোন বিষয়ের ফয়সালা করতে হলে তিনি প্রথমে

আল্লাহ্‌র কিতাবে অনুসন্ধান করতেন। যদি তাতে নির্দেশ না পাওয়া যেত তবে তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতে তালাশ করতেন। যদি তাতে হুকুম পাওয়া যেত তবে তিনি তদনুযায়ী ফয়সালা করতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি তাঁর কাছে সুন্নাতের জ্ঞান না থাকত তবে তিনি অন্যদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন যে, এ ধরনের কোন বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন ফয়সালা তোমাদের কারো জানা আছে কি?" -(ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৬২)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) পরিপূর্ণ পর্যালোচনার পর তাঁর গবেষণার ফল এভাবে ব্যক্ত করেন لا يحفظ للصديق خلاف نص واحد ابدا -
"আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র জীবনে
কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করার একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না"-(ঐ গ্রন্থ, ৪খ., পৃ. ১২০)।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এই যে, এক দাদী তার নাতির ওয়ারিশী স্বত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। মৃতের মা জীবিত ছিল না। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন হুকুম পাচ্ছি না যার ভিত্তিতে তোমাকে নাতির ওয়ারিশ বানানো যেতে পারে। অতপর তিনি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, মহানবী (স) এ জাতীয় ব্যাপারে কোন হুকুম দিয়েছিলেন কি না। একথা শুনে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন যে, মহানবী (স) দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ (অর্থাৎ মায়ের প্রাপ্য) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আবু বাক্‌র (রা) তদনুযায়ী ফয়সালা করে দেন (বুখারী ও মুসলিম সহ হাদীসের সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ আছে)।

ইমাম মালিক (রহ)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে নিজেন জীবদ্দশায় কিছু মাল দেয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্মরণ ছিল না যে, এই মাল তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা। মৃত্যুর কাছাকাছি সময় তিনি তাঁকে বলেন, যদি সেই মাল তুমি ইতিমধ্যেই হস্তগত করে নিয়ে থাক তবে তা তোমারই মালিকানায় থাকবে (কারণ তা দান বা হেবা হিসাবে গণ্য হবে)। আর তুমি যদি এখন পর্যন্ত তা হস্তগত না করে থাক তবে তা এখন আমার সকল ওয়ারিসের মধ্যে বন্টিত হবে। কারণ এখন আর তা হেবার পর্যায়ে নাই, বরং ওসীয়াতের পর্যায়ভুক্ত এবং "লা ওয়াসিয়্যাতা লি ওয়ারিছ" (ওয়ারিসদের জন্য কোন ওসিয়াত করা যাবে না) শীর্ষক হাদীসের আলোকে ওয়ারিসের জন্য কোন ওসীয়াত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কার্যকর হতে পারে না। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ প্রথম খলীফার জীবনে পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে,

তিনি রসূলুল্লাহ (স)–এর তরীকা থেকে চুল পরিমাণ দূরে সরে যাওয়াও জায়েয মনে করতেন না।

কে না জানে যে, খলীফা হওয়ার পর হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র সর্বপ্রথম ঘোষণা এই ছিল যেঃ

اَطِيْعُوْنِيْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَا طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكُمْ -

"তোমরা আমার আনুগত্য কর যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি।[১] আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করি তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।"

কে না জানে, তিনি মহানবী (স)–এর ইন্তেকালের পর উসামা বাহিনীকে কেবলমাত্র এজন্য অভিযানে পাঠাতে জোর দিয়েছেন, যে কাজের ফয়সালা স্বয়ং মহানবী (স) করেছেন তার পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর নেই বলেই তিনি মনে করতেন। আরবে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহাবায়ে কিরাম (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) এই মুহূর্তে সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানো যুক্তিসংগত মনে করেননি তখন হযরত আবু বাক্‌র (রা) এই জওয়াব দিয়েছিলেনঃ

لَوْ خَطَفَتْنِي الْكِلَابُ وَالذِّئَابُ لَمْ اَرُدَّ قَضَاءً قَضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)

"কুকুর ও নেকড়ে বাঘেরা যদি আমাকে ছিনিয়েও নিয়ে যায় তবুও আমি রসূলুল্লাহ (স)–এর কৃত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না।"

হযরত উমার ফারূক (রা) আকাংখা ব্যক্ত করেন যে, অন্তত উসামাকে এই বাহিনীর সেনাপতিত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হোক। কারণ অনেক প্রবীণ

---

১. হাদীস অস্বীকারকারীগণ বলে যে, কুরআন মজীদে যেখানেই "আল্লাহ্ ও রসূল" শব্দদ্বয় এসেছে তার অর্থ "জাতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব"। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বিষয়টি হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র বুঝে আসেনি। তিনি বেচারা বুঝেছেন যে, "জাতির কেন্দ্রীয় নেতা" হিসাবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকতে বাধ্য। প্রথম খলীফার শপথ গ্রহণের সময় হয়ত যদি "তুলূয়ে ইসলাম" প্রকাশিত হয়ে থাকত তবে তা তাঁকে বলে দিত যে, হে জাতির কেন্দ্রবিন্দু! আল্লাহ্ ও রসূল তো এখন তুমি নিজেই। তুমি আবার কোন্ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে যাচ্ছ!

সাহাবী এই যুবক ছেলের নেতৃত্বে কাজ করতে আগ্রহী নন। আবু বাক্‌র (রা) তাঁর দাড়ি ধরে বলেনঃ

ثَكَلَتْكَ اُمُّكَ وَعَدَمَتْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِسْتَعْمَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأْمُرُنِىْ اَنْ اَنْزِعَهُ -

"হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক এবং তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) নিয়োগ করেছেন, আর আমাকে বলছ আমি তাকে বরখাস্ত করি!"

উক্ত সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ إِنَّمَا اَنَا مُتَّبِعٌ لَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ -

"আমি তো অনুসরণকারী ও আনুগত্যকারী মাত্র, বিদআত সৃষ্টিকারী নই।"

তাছাড়া একথাই বা কে না জানে যে, হযরত ফাতিমা যোহ্‌রা (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)–র মীরাসের দাবী হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীসের ভিত্তিতেই মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন এবং এই "অপরাধের" জন্য তিনি আজও (শীআদের) গালি খাচ্ছেন। যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যখন জিহাদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখন হযরত উমার (রা)–র মত ব্যক্তিত্বের এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে এজন্য সংশয় ছিল যে, যেসব লোক কলেমা (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই)–এর প্রবক্তা তাদের বিরুদ্ধে কি করে অস্ত্র ধরা যেতে পারে? কিন্তু আবু বাক্‌র (রা) এর যে জওয়াব দিয়েছেন তা হলোঃ

وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ -

"আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি উট বাঁধার একটি রশিও এই যাকাত থেকে রেখে দেয় যা তারা রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে দিত, তবে আমি এজন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

এই কথা এবং এই কাজ ছিল সেই মহান ব্যক্তির যিনি মহানবী (স)–এর পরে সর্বপ্রথম উম্মাতের নেতৃত্বের লাগাম শক্ত হাতে তুলে নেন। আর আপনি বলছেন যে, মহান খলীফাগণ নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ (স)–এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকারী মনে করতেন!

হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র পরে হযরত উমার ফারূক (রা)-র এক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভংগি ছিল তা তিনি নিজেই কাযী সুরাইহ্ (রহ)-কে লিখিত এক পত্রে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"তুমি যদি কোন হুকুম আল্লাহ্র কিতাবে পেয়ে যাও তবে তদনুযায়ী ফয়সালা করবে এবং তার বর্তমানে অন্য কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আর যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যার মীমাংসা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তবে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতে যে মীমাংসা পাওয়া যায় তদনুযায়ী ফয়সালা কর। যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান কুরআনেও বর্তমান নেই এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতেও বর্তমান নেই, তবে তার সমাধান সেই আইন অনুযায়ী কর যার উপর ঐকমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত উভয়ই নীরব থাকে এবং তোমার পূর্বের এসম্পর্কিত কোন ঐক্যমত প্রসূত সিদ্ধান্তও বর্তমান না থাকে তবে তোমার এ অধিকার রয়েছে যে, সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমাধান পেশ কর অথবা মীমাংসা স্থগিত রেখে অপেক্ষা কর।[১] তবে আমার মতে তোমার জন্য অপেক্ষা করাই অধিক শ্রেয়"-(ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, ২খ, পৃ. ৬১-৬২)।

এটা হযরত উমার (রা)-র স্বলিখিত সরকারী নির্দেশনামা যা তিনি সমসাময়িক খলীফা হিসাবে বিচারালয়ের নীতিমালা সম্পর্কে কূফা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠিয়েছিলেন। এরপরও কি তাঁর দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে কারো ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার থাকে?

[হযরত উমার (রা)-র পরে তৃতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)।[২] শপথ অনুষ্ঠানের পর তিনি মুসলিম সর্বসাধারণের সামনে যে প্রকাশ্য ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেনঃ

"সাবধান! আমি আনুগত্যকারী ও অনুসরণকারী, বিদআত সৃষ্টিকারী নই। আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের আনুগত্য করার পর আমার উপর তোমাদের তিনটি অধিকার রয়েছে যার যিম্মাদারী আমি নিচ্ছি। (এক) আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণের আমলে তোমাদের ঐক্যমত অনুযায়ী যেসব সিদ্ধান্ত ও পন্থা গৃহীত হয়েছে আমি তার অনুসরণ করব। (দুই) উত্তম ও যোগ্য লোকদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এখন যেসব ফয়সালা হবে আমি তা কার্যকর করব। (তিন) তোমাদের উপর হস্তক্ষেপ থেকে আমি বিরত থাকব, যতক্ষণ

১. অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐক্যমত প্রসূত সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাক।
২. এই অংশ পরে সংযোজন করা হয়েছে।

পর্যন্ত তোমরা আইনের আওতায় গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য না হও"–(তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ৪৪৬)।

চতুর্থ খলীফা ছিলেন হযরত আলী (রা)। খলীফা হওয়ার পর তিনি মিসরবাসীদের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য স্বীয় গভর্নর কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদাকে প্রেরণের সময় তাঁর হাতে যে সরকারী ফরমান অর্পণ করেন তাতে তিনি বলেনঃ

"সাবধান! আমার উপর তোমাদের অধিকার এই যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করব, তোমাদের কিতাব ও সুন্নাহ প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করব, রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত কার্যকর করব এবং তোমাদের অজ্ঞাতেও তোমাদের কল্যাণ চিন্তা করব"–(তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ৫৫০)।

খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফার বক্তব্যই উপরে উল্লেখ করা হল, আপনি কোন্ খলীফাদের কথা বলেছেন যারা নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ্ (স)–এর সুন্নাতের অনুসরণ থেকে মুক্ত ছিল? তাদের সেই দৃষ্টিভংগী আপনি কি কি উপায়ে অবগত হলেন?

আপনার এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন কুরআন মজীদের হুকুম–আহ্‌কাম তো চূড়ান্তভাবে এবং অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় মনে করতেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)–এর সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যেগুলোকে তাঁরা বহাল রাখা যুক্তিসংগত মনে করতেন সেগুলোকে বহাল রাখতেন এবং যেগুলোর পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করতেন সেগুলো পরিবর্তন করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আপনি এর নযীর পেশ করুন যে, খিলাফতে রাশেদার সমগ্র যুগে মহানবী (স)–এর কোন্ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে, অথবা কোন্ খলীফা বা কোন্ সাহাবী মত ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁরা প্রয়োজনমত মহানবী (স)–এর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেয়ার অধিকার রাখতেন।

১০. মহানবী (স)–এর নিকট কুরআন ছাড়াও কি ওহী আসত?

এখন কেবল আপনার সর্বশেষ দফা অবশিষ্ট থাকল যা আপনি নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত করেছেনঃ "যদি ধরে নেয়া হয় যেমন আপনি মনে করেন যে, মহানবী (স) যা কিছু করতেন ওহীর আলোকে করতেন–তবে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে যে ওহী প্রেরণ করতেন তার

উপর (নাউযুবিল্লাহ) আশ্বস্ত না হতে পারায় আরেক প্রকারের ওহী নাযিল শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এই দুই রং–এর ওহী কেন? পূর্বকালে আগত নবীগণের উপর যে ওহী নাযিল হত তাতে কুরআন নাযিল হওয়ার ইংগিত থাকত। অতএব আপনি যে দ্বিতীয় প্রকার ওহী নাযিল হওয়ার কথা বলেছেন–কুরআন মজীদে তার প্রতি ইংগিত করাটা কি আল্লাহর জন্য খুব কঠিন ব্যাপার ছিল যিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান? কুরআনে তো এমন কোন জিনিস আমার নজরে পড়ছে না। আপনি যদি এ ধরনের কোন আয়াতের দিকে ইংগিত করতে পারেন তবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।”

খুবই সান্ত্বনার কথা। আপনার রায় অনুযায়ী মনে হয় আল্লাহ মিয়া বান্দাদের হেদায়াতের জন্য নয়, বরং নিজের সান্ত্বনার জন্য ওহী নাযিল করতেন এবং তাঁর সান্ত্বনার জন্য বাস এক ধরনের ওহী যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল।

আপনি তো দুই রং–এর ওহীর কথা শুনেই অস্থির। কিন্তু চোখ মেলে যদি আপনি কুরআন মজীদ পাঠ করে থাকতেন তবে জানতে পারতেন যে, এই কিতাব ছয় রং–এর ওহীর কথা উল্লেখ করেছে–যার মধ্যে শুধুমাত্র এক রং–এর ওহী কুরআন মজীদে সংকলন করা হয়েছে।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ
يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ـ

“কোন মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন বার্তাবাহক প্রেরণ ব্যতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়”–(সূরা শূরাঃ ৫১)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন মানুষের উপর নির্দেশনামা এবং হেদায়াত নাযিল হওয়ার তিনটি পন্থার কথা বলা হয়েছে। সরাসরি ওহী (ইলকা ও ইলহাম), অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কথোপকথন, অথবা আল্লাহর বার্তাবাহকের (ফেরেশতা) মাধ্যমে ওহী প্রেরণ। কুরআন মজীদে যেসব ওহী সংকলন করা হয়েছে তা উপরোক্ত তিন প্রকারের ওহীর মধ্যে কেবলমাত্র তৃতীয় প্রকারের ওহী। এর বিবরণী আল্লাহ তাআলা সরাসরি কুরআন মজীদেই পেশ করেছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ..... فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ـ

"(হে নবী) বল, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছে–যা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমার্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ--- আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফেরদের শত্রু"– (সূরা বাকারাঃ ৯৭, ৯৮)।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

"তা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নাযিলকৃত কিতাব। রূহুল আমীন তা নিয়ে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়–যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার"–(সূরা শুআরাঃ ১৯২–৯৪)।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন মজীদ কেবলমাত্র এক প্রকারের ওহীর সংগ্রহ। রসূলুল্লাহ (স) আর যে দুটি উপায়ে হেদায়াত লাভ করতেন যার উল্লেখ সূরা শূরার আয়াতে করা হয়েছে–তা উপরোক্ত ওহী থেকে স্বতন্ত্র। এখন স্বয়ং কুরআন মজীদ আমাদের বলে দিচ্ছে যে, এসব উপায়েও মহানবী (স) হেদায়াত লাভ করতেন।

(১) যেমন আমি আপনার চতুর্থ দফার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলে এসেছি–সূরা বাকারার ১৪৩–৪৪ নং আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মসজিদুল হারামকে কিবলা বানানোর পূর্বে মহানবী (স) ও মুসলমানগণ অন্য কোন কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। আল্লাহ্ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের হুকুম দিতে গিয়ে জোরালো ভাষায় বলেছেন, প্রথম যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া হত তাও আমার হুকুমে নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু কুরআন মজীদে এমন আয়াত কোথাও নাই যাতে ঐ কিবলার দিকে মুখ করার প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে–মহানবী (স)–এর উপর কুরআন ব্যতীত আর কোন প্রকারের ওহী না এলে তিনি কি উপায়ে এই হুকুম লাভ করেছিলেন? এ থেকে কি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় না যে, মহানবী (স) এমন নির্দেশও লাভ করতেন যা কুরআন মজীদে উল্লেখ নাই?

(২) রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি মক্কা মুআজ্জমায় প্রবেশ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের

নিকট এই স্বপ্নের কথা বলেন এবং চৌদ্দশত সাহাবী সাথে নিয়ে উমরা আদায়ের জন্য রওনা হয়ে যান। মক্কার কাফেররা তাঁকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধা দেয় এবং তার ফলশ্রুতিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন সাহাবীর মনে সংশয় ও অস্থিরতার সৃষ্টি হলে হযরত উমার (রা) প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল! "আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করব এবং তাওয়াফ করব? তিনি বলেনঃ "আমি কি বলেছিলাম, এই সফরেই তা হবে?" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে আয়াত নাযিল করেনঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ - مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ -
فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে–কেউ মাথা কামিয়ে, কেউ চুল ছোট করে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়"–(সূরা ফাত্হঃ ২৭)।

এ থেকে জানা গেল যে, মহানবী (স)–কে স্বপ্নের মাধ্যমে মক্কা মুআজ্জমায় প্রবেশের এই পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, কাফেররা বাধা দেবে এবং শেষে সন্ধি স্থাপিত হবে–যার ফলে পরবর্তী বছর উমরা করার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যত বিজয়ের পথও খুলে যাবে। এটা কি কুরআন মজীদ ছাড়াও ভিন্নতর পন্থায় পথনির্দেশনা লাভের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়?

(৩) মহানবী (স) তাঁর স্ত্রীদের কোন একজনের নিকট একটি একান্ত গোপন কথা বলেন। তিনি (স্ত্রী) তা অন্যদের নিকট ফাঁস করে দেন। মহানবী (স) এজন্য তাঁকে অভিযুক্ত করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন আমি অন্যদের নিকট একথা বলে দিয়েছি? মহানবী (স) জওয়াব দেন, আমাকে মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত সত্তা (আল্লাহ) অবহিত করেছেন।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ

اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ
هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ۔

"যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতপর সে তা যখন অন্যদের বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল, যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল, কে আপনাকে তা অবহিত করল? নবী বলল, আমাকে তিনি অবহিত করেছেন-যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত"-(সূরা তাহ্‌রীমঃ ৩)।

এখন বলুন, কুরআন মজীদে সেই আয়াতটি কোথায় যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে অবহিত করেছিলেন যে, তোমার স্ত্রী তোমার গোপন কথা অন্যদের নিকট ফাঁস করে দিয়েছে? যদি এরূপ কোন আয়াত না থেকে থাকে তবে কি প্রমাণিত হল না যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদ ছাড়াও মহানবী (স)-এর নিকট পয়গাম পাঠাতেন?

(৪) মহানবী (স)-এর মুখডাকা পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) নিজ স্ত্রীকে তালাক দেন। অতপর মহানবী (স) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ্ করেন। এটাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক ও কাফেররা মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে প্রপ্রাগান্ডার এক ভয়ংকর তুফান উত্থিত করে এবং অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করায়। আল্লাহ্ তাআলা এই অভিযোগের জবাব সূরা আহ্‌যাবের একটি পূর্ণ রুকূতে দান করেন এবং এই প্রসঙ্গে লোকদের বলেন, আমার নবী স্বয়ং এই বিবাহ করেননি, বরং আমার নির্দেশে করেছেন।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔

"অতপর যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে তাদের বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়"-(সূরা আহ্‌যাবঃ ৩৭)।

এ আয়াতে তো উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মহানবী (স)-কে হুকুম করা হয়েছিল, তুমি যায়েদের তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ্ কর, তা কুরআনের কোথায় উল্লেখ আছে?

(৫) মহানবী (স) বানূ নাদীর গোত্রের একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনার সংলগ্ন তাদের বসতি এলাকায় সৈন্য পরিচালনা করেন এবং অবরোধ চলাকালীন ইসলামী ফৌজ আশপাশের বাগানসমূহের অনেক গাছগাছালী কেটে ফেলেন যাতে আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিরুদ্ধবাদীরা অপপ্রচার চালায় যে, বাগানসমূহ বিরান করে এবং ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলে মুসলমানরা জমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ -

"তোমরা খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ–তা তো আল্লাহ্‌র–ই অনুমতিক্রমে–" (সূরা হাশরঃ ৫)।

আপনি কি বলতে পারেন–এই অনুমতি কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল?

(৬) বদরের যুদ্ধ শেষে গনীমাতের মাল বন্টনের প্রশ্ন দেখা দিলে সূরা আল–আনফাল নাযিল হয় এবং তাতে গোটা যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা এই পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন সেই সময় থেকে যখন মহানবী (স) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওনা হয়ে যান এবং এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেনঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ -

"এবং আল্লাহ্ তাআলা যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে–দুই দলের (ব্যবসায়ী কাফেলা এবং কুরাইশ সেনাবাহিনী) একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি (অর্থাৎ ব্যবসায়ী কাফেলা) তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের নির্মূল করেন–" (সূরা আনফালঃ ৭)।

এখন আপনি কি সমগ্র কুরআন মজীদ থেকে এমন কোন আয়াতের উল্লেখ করতে পারেন যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হে মদীনা থেকে বদরের দিকে অভিযাত্রীগণ! আমি দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেব?

(৭) ঐ বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ -

"তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন–আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য একাধারে এক হাজার ফেরেশতা পাঠাব"– (সূরা আনফালঃ ৯)।

আপনি কি বলতে পারেন যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের দোয়ার এই উত্তর কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল?

আপনি মাত্র একটি উদাহরণ চাচ্ছিলেন। আমি আপনার সামনে কুরআন মজীদ থেকে সাতটি উদাহরণ পেশ করলাম যার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স)–এর নিকট কুরআন মজীদ ছাড়াও ওহী আসত। এরপর আরো আলোচনার সূত্রপাত করার পূর্বে আমি দেখতে চাই যে, আপনি সত্যের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত কি না?

তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৬০ খৃ.। বিনীত

আবুল আ'লা

সুন্নাত সম্পর্কে আরও কতিপয় প্রশ্ন

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ডক্টর আবদুল ওয়াদূদ সাহেব ও গ্রন্থকারের মধ্যেকার পত্রালাপ পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সাহেবের আরও একটি পত্র হস্তগত হয়েছে, যা গ্রন্থকারের উত্তরসহ নিম্নে উল্লেখ করা গেলো]।

ডক্টর সাহেবের চিঠি

মুহতারাম মাওলানা,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার ১৭ আগস্টের চিঠি আপনার প্রদত্ত জবাবসহ তরজমানুল কুরআন পত্রিকার অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায় ডাক মারফত হস্তগত হয়েছে। এই উত্তরমালার শেষ ভাগে আপনি বলেছেন, পুনরায় ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আপনি দেখতে চান যে, আমি সত্যের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত আছি কি না।

মুহতারাম! একজন সাচ্চা মুসলমানের মত আমি সব সময় সত্যের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত। কিন্তু যেখানে সত্য বর্তমান নেই, বরং কোন মূর্তির সামনে অবনত হওয়া উদ্দেশ্য, সেখানে আমি অন্তত মাথা নত করতে পারি না। কারণ ব্যক্তিপূজা আমার আদর্শ নয়। আমি আপনাকে বারবার এজন্য কষ্ট দিচ্ছি যে, আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাক এবং একই দেশে বসবাসকারী এবং একই মনযিলে মাকসূদের দিকে ধাবিত ব্যক্তিগণ পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন না করুক। আর আপনি তো কেবল বাকচাতুর্য ও আবেগের সমাবেশ ঘটিয়ে কলমের সমস্ত শক্তি শেষ করে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, আমি অবনত হয়ে যাব। এত দীর্ঘ জবাব তৈরী করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনার উত্তর পাঠে আমার মধ্যে আরও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

আপনি যথার্থই বলেছেন যে, আমার অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কুরআন অধ্যয়নও অন্তর্ভুক্ত এবং আপনি আপনার জীবন এর এক একটি শব্দের উপর চিন্তা ভাবনায় ও তার অন্তর্নিহিত ভাব উদঘাটনে ব্যয় করেছেন। কিন্তু আমাকে দুঃখজনকভাবে বলতে হচ্ছে যে, আপনার জীবনভর এই পরিশ্রম নিজের জন্য হয়ে থাকলে আমার কোন কথা নেই। কিন্তু মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য তা সামান্য পরিমাণও লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে না। আপনার চিঠিতে অনেকগুলো দ্ব্যর্থবোধক কথা রয়েছে। আবার কতগুলো কথা কুরআনের পরিপন্থী। আর কতগুলো কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপনি কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য বিস্তারিত জবাবের

প্রয়োজন রয়েছে। ইনশাআল্লাহুল আযীয আমি প্রথম অবসরেই তার পূর্ণাঙ্গ জবাব তৈরী করব। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এমন দুই একটি কথা রয়েছে যা সুস্পষ্ট হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। এই সময় আমি কেবল সেগুলোই পেশ করতে চাই।

আমি মনে করি, গোটা আলোচনা ঘুরেফিরে একটি স্থানেই এসে জড়ো হয়েছে যে, আল্লাহর তরফ থেকে রসূলুল্লাহ (স)–এর উপর যে ওহী নাযিল হয়েছে তার সবটাই কি কুরআন মজীদে আছে না বাইরে অন্য কোথাও আছে? আপনার দাবী এই যে, কুরআন ব্যতীতও ওহীর একটি অংশ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(১) ঈমান আনা ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ওহীর মর্যাদা কি সমান?

(২) কুরআন মজীদ যেখানে مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ "যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে") বলেছে তার দ্বারা কি শুধু কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, না এর মধ্যে ওহীর উল্লেখিত প্রধান অংশও অন্তর্ভূক্ত আছে?

(৩) ওহীর এই দ্বিতীয় অংশ কোথায়? কুরআনের মত তার সংরক্ষণের দায়িত্বও কি আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন?

(৪) কুরআনের কোন স্থানে আরবী শব্দের পরিবর্তে একই অর্থ প্রকাশক ভিন্ন শব্দ স্থাপন করলে তাকে কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মনে করা হবে? ওহীর উল্লেখিত দ্বিতীয় অংশের অবস্থাও কি তাই?

(৫) কতিপয় লোক বলে যে, মহানবী (স) নবুওয়াত লাভের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু করেছেন তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী। আপনি কি তাদের সাথেও একমত? যদি একমত না হন তবে এ ক্ষেত্রে আপনার আকীদা বিশ্বাস কি?

(৬) আপনি যদি মনে করেন যে, মহানবী (স)–এর কতিপয় বাণী ওহীর সমষ্টি আর কতগুলো বাণী ওহী ছিল না তবে আপনি কি বলবেন যে, মহানবী (স)–এর যেসব বাণী ওহী তার সংকলন কোথায় আছে?

অন্তত তাঁর যেসব বাণী ওহী ছিল না–মুসলমানদের ঈমান ও আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তার মর্যাদা কি? (৭) কোন ব্যক্তি যদি কুরআন পাকের কোন আয়াত সম্পর্কে বলে, "তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়," তবে আপনি কি এ কথার সাথে একমত হবেন যে, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়? যদি কোন ব্যক্তি হাদীসের বর্তমান সংগ্রহসমূহের কোন হাদীস

সম্পর্কে বলে যে, তা আল্লাহর ওহী নয় তবে সেও কি ইসলামের গন্ডি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে?

(৮) রসূলুল্লাহ (স) দীন ইসলামের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য যেসব পন্থার প্রস্তাব করেছেন, কোন যুগের চাহিদা ও সার্বিক কল্যাণের দিক থেকে তার আংশিক পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি না? কুরআনের বিধানের ক্ষেত্রেও এরূপ আংশিক পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি না? ওয়াসসালাম।

বিনীত

আবদুল ওয়াদুদ

গ্রন্থকারের জওয়াব

মুহতারামী ও মুকাররমী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। ৫ নবেম্বর, ১৯৬০ খৃ. আপনার পত্র পেয়েছি। কিছুটা স্বাস্থ্যগত কারণে এবং কিছুটা ব্যস্ততার কারণে উত্তরদানে বিলম্ব হলো। এজন্য ওজর পেশ করছি।

আপনি পূর্বের ন্যায় আবার একই পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং একটি আলোচনা পরিষ্কার করে আসা থেকে গা বাঁচিয়ে পুনরায় কতগুলো নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। অথচ নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করার পূর্বে আপনার বলা দরকার ছিল যে, পূর্বের চিঠিতে আমি আপনার দশটি বিষয়ের উপর যে আলোচনা করেছি তার মধ্যে কোন্ জিনিসটি আপনি মানেন আর কোন্ জিনিসটি মানেন না এবং যে জিনিসটি মানেন না তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আপনার নিকট কি যুক্তিপ্রমাণ আছে। আমার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীরও কোন উত্তর দেয়া আপনার উচিত ছিল, যা আমি আমার চিঠিতে আপনাকে করেছি। কিন্তু এসব প্রশ্নের মোকাবিলা করা থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে এখন আবার নতুন করে আপনি কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এবং আমার নিকট তার উত্তর দাবী করছেন। এটা শেষ পর্যন্ত আলোচনার কি ধরনের পন্থা? আমার পূর্বেকার চিঠি সম্পর্কে আপনার পর্যালোচনা কিছুটা অদ্ভুত প্রকৃতির। এই আলোচনায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে এবং যেসব মৌলিক বিষয়ের উপর আমি আলোকপাত করেছি তার সবগুলো উপেক্ষা করে সর্বপ্রথম আপনার দৃষ্টি পড়েছে আমার সর্বশেষ বাক্যের উপর এবং তার জওয়াবে আপনি বলছেন যে, "আমি সত্যের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রতিমার সামনে আমি অবনত হতে পারি না এবং

ব্যক্তিপূজা আমার আদর্শ নয়।” প্রশ্ন হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সেই “প্রতিমাটি” কি যার সামনে আপনাকে অবনত হতে বলা হয়েছিল এবং কোন্ “ব্যক্তিপূজার” দাওয়াত আপনাকে দেয়া হয়েছিল?

আমি তো কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট আয়াতের সাহায্যে প্রমাণ করেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তাআলার নিযুক্ত রাষ্ট্রনায়ক, আইন প্রণেতা, বিচারক, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ্ তাআলারই নির্দেশের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর ফরজ। এই সত্যের সামনে অবনত হওয়ার জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম। এর উপর আপনার উপরোক্ত বক্তব্য সন্দেহের সৃষ্টি করে যে, সম্ভবত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণই সেই “প্রতিমা” যার সামনে অবনত হতে আপনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন এবং এটাই সেই “ব্যক্তিত্বপূজা” যার প্রতি আপনি রুষ্ট। আমার এই সন্দেহ্ যদি সঠিক হয় তবে আমি আবেদন করবো যে, আপনি মূলত ব্যক্তিত্ব পূজা প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং আল্লাহর পূজাকে অস্বীকার করছেন এবং একটি প্রকান্ড প্রতিমা আপনার নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে যার সামনে আপনি সিজদাবনত। যেখানে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, সেখানে অবনত হওয়াটা প্রতিমার সামনে অবনত হওয়া নয়, বরং আল্লাহর সামনেই অবনত হওয়া এবং পূজা নয় বরং আল্লাহর উপাসনা। অবশ্য যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে সে মূলত আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার পরিবর্তে নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিমার সামনে অবনত হয়।

তাছাড়া আপনি আমার সমস্ত যুক্তি প্রমাণ এমনভাবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, “তুমি বাকচাতুর্য ও আবেগের সমাহারে কলমের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছ।” “আপনি ইচ্ছা করলে সন্তুষ্ট চিত্তে এই মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু এর মীমাংসা এখন হাজারো পাঠক করবেন যাদের চোখের সামনে দিয়ে এই পত্র যোগাযোগ চলছে। তারাই বিচার করবেন যে, আমি যুক্তিপ্রমাণ পেশ করেছি না শুধু বাকচাতুর্য প্রদর্শন করেছি? আর তারা এ বিচার করবেন যে, আপনি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছেন নাকি সত্যের উপাসনা করছেন?

আপনি আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করছেন যে, আমার উত্তরমালায় আপনার মনের জটিলতা ও সংশয়–সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য আমারও আক্ষেপ হয়। কিন্তু এই সন্দেহ ও জটিলতার উৎস বাইরে কোথাও নয়, আপনার নিজের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। আপনি এই পত্রালাপ বাস্তবিকই যদি বক্তব্য বিষয়

হৃদয়ঙ্গম করার জন্য করে থাকতেন তবে সোজা কথা সোজাভাবে আপনার বুঝে এসে যেত। কিন্তু আপনার পরিকল্পনা তো ছিল ভিন্ন কিছু। আপনার প্রথম দিককার প্রশ্নাবলী আমার নিকট পাঠানোর সাথে সাথে আপনি তা আরও কতিপয় আলেমের নিকট এই আশায় প্রেরণ করেছেন যে, তাদের নিকট থেকে ভিন্নতর জওয়াব পাওয়া যাবে।[১] অতপর তার সবগুলো প্রকাশ করে এই প্রোপাগান্ডা করা যাবে যে, সুন্নাতের প্রবক্তা আলেমগণই তো সুন্নাত সুন্নাত করেন, কিন্তু দুইজন আলেমও সুন্নাতের ব্যাপারে একমত নন। এই একই কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত আমরা মুনীর রিপোর্টেও দেখতে পাই। এখন আমার উত্তরমালার মাধ্যমে আপনার এই পরিকল্পনা আপনার ঘাড়েই গিয়ে উল্টে পড়েছে। তাই আমি আপনাকে বুঝানোর যতই চেষ্টা করি না কেন আপনার মনের জটিলতা ও সংশয় বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এই ধরনের জটিলতার শেষ পর্যন্ত আমি কি চিকিৎসা করতে পারি? এর চিকিৎসা তো আপনার নিজের হাতেই রয়েছে। সত্য কথা বুঝার এবং তা মেনে নেয়ার অকৃত্রিম আকাংখা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন এবং একটি বিশেষ চিন্তাধারার সপক্ষে প্রচারণার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সরবরাহেরও চিন্তা ত্যাগ করুন। এরপর ইনশা আল্লাহ্ প্রতিটি যুক্তিসংগত কথা সহজে আপনার বুঝে এসে যাবে।

অতপর আপনি একটি ভ্রান্ত দাবী আমার প্রতি আরোপ করেছেন যে, "আমি আমার জীবন কুরআনের এক একটি শব্দ নিয়ে চিন্তা করে এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ব্যয় করে দিয়েছি।" অথচ আমার সম্পর্কে কখনও আমি এরূপ দাবী করিনি। আমার পূর্বেকার চিঠিতে আমি যা বলেছি তা তো এই ছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে যার দৃষ্টান্ত আজও পাওয়া যায়–যাঁরা নিজেদের জীবন এ কাজে ব্যয় করেছেন। উপরোক্ত কথা থেকে আপনি কিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আমি নিজের সম্পর্কে এই দাবী করছি?

এতটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার পর আপনি আমার চিঠির মূল আলোচনা সম্পর্কে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, "আপনার চিঠির মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে, কয়েকটি কথা কুরআনের পরিপন্থী এবং আরও এমন কয়েকটি কথা রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, আপনি সঠিকভাবে কুরআনের তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।" প্রশ্ন হচ্ছে আপনার এ বক্তব্যের চেয়ে

---

১. পরে আমি মাওলানা দাউদ গযনবী ও মুফতী সিয়াহুদ্দীন কাকাখীল এবং আরও কয়েকজন লোকের মাধ্যমে জানতে পারি যে, আপনি তাদের নিকটও একই প্রশ্নমালা পাঠিয়েছেন।

অধিক দ্ব্যর্থবোধক কোন কথা হতে পারে কি? আপনি যদি কিছু দেখিয়ে দিতেন যে, আমার ঐ চিঠিতে কি দ্ব্যর্থবোধক কথা ছিল, কোন্ জিনিস কুরআনের পরিপন্থী ছিল এবং কুরআনের কোন্ আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি? এই সমস্ত কথাই আপনি ভবিষ্যতের অবসরের জন্য তুলে রেখে দিয়েছেন এবং এখনকার হাতের সময় কতগুলো নতুন প্রশ্ন রচনায় ব্যয় করেছেন। অথচ এই সময়টা পূর্বেকার প্রশ্নাবলীর উপর বক্তব্য রাখতে ব্যবহার করা উচিত ছিল।

এই পত্র বিনিময়ে যদি শুধুমাত্র আপনাকে "কথা বুঝিয়ে দেয়া" আমার উদ্দেশ্য হত তবে আপনার পক্ষ থেকে "কথা বুঝার" চেষ্টার এই নমুনা দেখে আমি ভবিষ্যতের জন্য অপারগতা পেশ করতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে উপলক্ষ করে অন্যান্য বহু রোগীর চিকিৎসার চিন্তা করছি, যাদের মনমগজকে ঐ ধরনের প্রশ্নাবলী নিক্ষেপ করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। ইনশাআল্লাহ এজন্য আমি আপনার এই সদ্য প্রাপ্ত প্রশ্নগুলোরও জবাব দেব এবং আপনি যদি এ ধরনের আরো প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তার জবাবও দেব। এর ফলে যাদের মনে এরূপ পথভ্রষ্টতার জন্য এখনও হঠকারিতা ও জেদ সৃষ্টি হয়নি তারা যেন সুন্নাতের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি দিক উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তাদেরকে সহজে পথভ্রষ্ট করা না যায়।

ওহীর উপর ঈমান আনার কারণ

আপনার প্রথম প্রশ্ন হলো, "ওহীর সাথে ঈমান ও আনুগত্যের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে–এ ক্ষেত্রে ওহীর উভয় অংশের মর্যাদা কি সমান?"

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন ব্যক্তির বুঝে উত্তমরূপে আসতে পারে না যতক্ষণ সে প্রথমে হৃদয়ঙ্গম না করবে যে, ওহীর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার অনুসরণের আসল ভিত্তি কি? সুস্পষ্ট কথা হলো, ওহী যে ধরনেরই হোক না কেন তা সরাসরি আমাদের নিকট আসেনি যে, আমরা স্বয়ং তা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হওয়ার বিষয়টি জানতে পারি এবং তার অনুসরণ করতে পারি। তা তো আমরা রসূলুল্লাহ (স)–এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি এবং তিনিই আমাদের বলেছেন যে; এই হেদায়াত বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট এসেছে। ওহীর (আল্লাহর তরফ থেকে আসার) উপর ঈমান আনার পূর্বে আমরা রসূলের উপর ঈমান আনি এবং তাঁকে আল্লাহ তাআলার সত্য বাণীবাহক বলে স্বীকার করি। আমরা রসূলের বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করার পরই তাঁর ওহীকে আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো ওহী হিসাবে মেনে নেয়ার এবং তার অনুসরণ করার পালা আসে। অতএব আসল জিনিস ওহীর উপর ঈমান নয়, বরং

রসূলুল্লাহ (স)–এর উপর ঈমান এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়া। তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা ওহীকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী বলে মেনে নেই। অন্য কথায় বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, রসূলের রিসালাতের উপর ঈমান আনার কারণ কুরআন নয়, বরং কুরআনের উপর আমাদের ঈমানের কারণ রসূলের রিসালাতের উপর ঈমান। ঘটনাসমূহের ক্রমবিন্যাস এই নয় যে, প্রথমে আমাদের নিকট কুরআন এসেছে, তা আমাদেরকে মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (স)–এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং এর বক্তব্য সঠিক মনে করে আমরা রসূলুল্লাহ্ (স)–কে আল্লাহর রসূল হিসাবে মেনে নিয়েছি। বরং ঘটনার সঠিক ক্রমবিন্যাস এই যে, প্রথমে মুহাম্মাদ (স) এসে রিসালাতের দাবী পেশ করেছেন, অতপর যে ব্যক্তিই তাঁকে সত্যবাদী রসূল বলে মেনে নিয়েছে সে তাঁর এই কথাও সত্য সঠিক বলে মেনে নিয়েছে যে, এই যে কুরআন তিনি পেশ করছেন তা মুহাম্মাদ (স)–এর কালাম নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলার কালাম।

এটা এমন একটি স্বতঃসিদ্ধ মর্যাদা যা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এই পজিশন যদি আপনি স্বীকার করেন তবে নিজ স্থানে চিন্তা করে দেখুন, যে রসূলের বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে আমরা কুরআনকে ওহী হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই রসূলই যদি আমাদের বলেন যে, তিনি কুরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে হেদায়াত ও বিধান লাভ করে থাকেন তবে তা বিশ্বাস না করার শেষ পর্যন্ত কি কারণ থাকতে পারে? যখন রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন–ই ওহীর উপর ঈমান আনয়নের মূল ভিত্তি–তখন আনুগত্যকারীর জন্য এতে কি পার্থক্য সৃষ্টি হয় যে, রসূল (স) আল্লাহর আদেশ কুরআনের কোন আয়াতের আকারে আমাদের নিকট পৌঁছে দেন অথবা কোন নির্দেশ বা কাজের আকারে? দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সর্বাবস্থায় আমাদের উপর ফরজ এবং কুরআনের কোন আয়াতে "হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ করা হয়েছে" এরূপ নির্দেশ না আসা সত্ত্বেও উম্মাত তা ফরজ হিসাবে মান্য করে। প্রশ্ন হলো কুরআন মজীদে যদি এই হুকুমও এসে যেত তবে এর ফরজিয়াতের মধ্যে এবং এর গুরুত্বের মধ্যে কি শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো? তখনও তা ঠিক সেভাবেই ফরজ হত যেভাবে এখন রসূলুল্লাহ (স)–এর বক্তব্যের মাধ্যমে ফরজ আছে।

'মা আনযালাল্লাহু' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো "কুরআন মজীদ যেখানে مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ (যা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে) বলেছে, তার দ্বারা কি শুধুমাত্র

কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, না তার মধ্যে ওহীর উল্লেখিত প্রধান অংশও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে?" এর জওয়াব এই যে, কুরআন মজীদে যেখানে "নাযিল করা"-র সাথে "কিতাব" অথবা "যিক্র" অথবা "কুরআন" ইত্যাদি শব্দ এসেছে কেবলমাত্র সেখানে مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)-এর দ্বারা কুরআন মজীদ বুঝানো হয়েছে। আর যেসব স্থানে কোন সম্বন্ধপদ উক্ত বাক্যকে কুরআনের জন্য নির্দিষ্ট করে না সেখানে উক্ত বাক্য দ্বারা আমরা মহানবী (স)-এর নিকট থেকে যেসব শিক্ষা ও হেদায়াত লাভ করেছি সেগুলো সবই বুঝায়, তা কুরআনের আয়াতের আকারেই হোক অথবা অন্য কোন আকারে। এর প্রমাণ স্বয়ং কুরআন মজীদেই বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন আমাদের বলে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মহানবী (স)-এর উপর শুধুমাত্র কুরআনই নাযিল হয়নি, বরং আরো কিছু নাযিল হয়েছে। সূরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

"আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন"-(আয়াত নং ১১৩)।

অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত সূরা বাকারায়ও রয়েছে। যেমনঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ -

"এবং তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতসমূহের এবং তিনি তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমাত থেকে যা নাযিল করেছেন, যার সাহায্যে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন-" (আয়াত নং ১৩১)।

এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সূরা আহ্‌যাবে, যেখানে মহানবী (স) এর স্ত্রীগণকে উপদেশ দান করা হয়েছে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ -
(يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ)

"আল্লাহর আয়াতসমূহ ও জ্ঞানের কথা-যা তোমাদের ঘরসমূহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে"-(আয়াত নং ৩৪)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, মহানবী (স)-এর উপর কিতাব ছাড়াও একটি জিনিস "হিকমাহ"ও নাযিল করা হয়েছিল যার শিক্ষা

তিনি লোকদের দান করতেন। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, মহানবী (স) যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে কুরআন মজীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করতেন এবং নেতৃত্ব ও পথনির্দেশের দায়িত্ব পালন করতেন তা শুধুমাত্র তাঁর স্বাধীন ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং তাও আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর নাযিল করেন। অনন্তর তা এমন কোন জিনিস ছিল যা স্বয়ং তিনিই ব্যবহার করতেন না, বরং লোকদেরও শিক্ষা দিতেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই শিখানোর কাজ কথার আকারেও হতে পারে কিংবা বাস্তব কর্মের আকারেও হতে পারে। তাই উম্মাত মহানবী (স)–এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত দুটি জিনিস লাভ করেছিলঃ একটি কিতাব এবং দ্বিতীয়টি হিকমাহ (কর্মকৌশল)। আর এই হিকমাহ তারা লাভ করেছে তাঁর বাণীসমূহের আকারেও এবং বাস্তব কার্যাবলীর আকারেও।

পুনশ্চ কুরআন মজীদ আরও একটি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছে যা আল্লাহ তাআলা কিতাবের সাথে নাযিল করেছেনজ

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ـ

"আল্লাহ–ই নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব ও তুলাদন্ড"–(সূরা শূরাঃ ১৭)।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

"নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও তুলাদন্ড দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে"–(সূরা হাদীদঃ ২৫)।

এই মীযান (তুলাদন্ড) যা কিতাবের সাথে নাযিল করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবেই দোকানে দোকানে রক্ষিত দাঁড়িপাল্লা নয়, বরং এর দ্বারা এমন কোন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তাআলার হেদায়াত অনুযায়ী মানবীয় জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, তার বিকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে দেয় এবং বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা দূরীভূত করে মানব চরিত, আচার–আচারণ ও আদান–প্রদানকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করে। কিতাবের সাথে এই জিনিস নবী–রসূলগণের উপর নাযিল করার পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নবীগণকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে পথ প্রর্দশনের এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যার সাহায্যে তাঁরা আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ

ও রাষ্ট্রে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এই কাজ তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদী ক্ষমতা ও রায়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত তুলাদন্ডের সাহায্যে মেপে মেপে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন যে, মানব জীবনের বিভিন্ন উপাদানের কোন্ অংশের কত ওজন হওয়া উচিত।

পুনশ্চ কুরআন মজীদ একটি তৃতীয় জিনিসের খবর দেয় যা কিতাবের অতিরিক্ত নাযিল করা হয়েছে।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا-

"অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যা আমি নাযিল করেছি"–(সূরা তাগাবুনঃ ৮)।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"অতএব যারা এই রসূলের প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম"– (সূরা আরাফঃ ১৫৭)।

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ- يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ-

"আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের নিকট এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসে গেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় এর দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন" (সূরা মাইদাঃ ১৫–১৬)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তা ছিল কিতাব থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস যেমন তৃতীয় আয়াতের শব্দসমূহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে। এই নূরও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর রসূলের উপর নাযিল করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)–কে যে জ্ঞান, বুদ্ধিবিবেক, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি জীবনের চলার পথসমূহের মধ্যে সঠিক ও ভ্রান্ত পথ চিহ্নিত করেছেন, জীবন সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন এবং যার আলোকে কাজ করে তিনি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, সভ্যতা–সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এবং আইন ও রাজনীতির জগতে মহান বিপ্লব সাধন করেছেন– এই নূর বলতে স্পষ্টতই সেইসব শক্তিকেই বুঝায়। এটা

কারো ব্যক্তিগত কাজ ছিল না যে, সে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে নিজের বুঝ অনুযায়ী চেষ্টা সাধনা করে থাকবে। বরং এটা ছিল আল্লাহ তাআলার সেই মহান প্রতিনিধির কাজ যিনি কিতাব লাভের সাথে সাথে সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার নূরও লাভ করেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মজীদ যখন আমাদেরকে অন্য সব জিনিস ত্যাগ করে শুধুমাত্র مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)–এর অনুসরণের নির্দেশ দেয় তখন এর অর্থ কেবলমাত্র কুরআনেরই অনুসরণ বুঝায় না, বরং সেই নূর, হিকমাহ ও মীযানেরও অনুসরণ করা বুঝায় যা কুরআনের সাথে মহানবী (স)–এর উপর নাযিল করা হয়েছিল এবং যার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে মহানবী (স)–এর জীবনাচার, নৈতিকতা, কাজ ও কর্মের মধ্যেই হয়েছিল। তাই কুরআন মজীদ কোথাও বলে, مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)–এর আনুগত্য কর (যেমন ৩ঃ ৩১, ৩৩ঃ ২১ এবং ৭ ঃ ১৫৬ নং আয়াত)। তা যদি স্বতন্ত্র দুটি জিনিস হত তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের হেদায়াত পরস্পর বিপরীত হয়ে যেত।

সুন্নাত কোথায় আছে?

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, "ওহীর এই দ্বিতীয় অংশ কোথায়? কুরআনের মত তার সংরক্ষণের দায়িত্বও কি আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন?"

এই প্রশ্নের দুটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ "ওহীর এই দ্বিতীয় অংশ কোথায়?" হুবহু এই প্রশ্নই আপনি পূর্বে আমাকে করেছিলেন এবং আমিও তার বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আপনি তা পুনর্বার এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেন আপনি মূলত এর কোন উত্তরই পাননি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার প্রথম চিঠি তুলে নিয়ে দেখুন, যার মধ্যে দুই নম্বর প্রশ্নের বিষয়বস্তু তাই ছিল যা আপনার বর্তমান প্রশ্নের বিষয়বস্তু। অতপর আমার দ্বিতীয় পত্রখানি তুলে পড়ে দেখুন যার মধ্যে আমি আপনাকে এই প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছি। এখন আপনার উক্ত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা এবং আমার পূর্বেকার জওয়াব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি হয় আপনার কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন এবং অন্যের কথা আপনার মগজ পর্যন্ত পৌঁছার কোন পথ পায় না, অথবা আপনি এই বিতর্ক শুধুমাত্র বিতর্ক হিসাবেই করছেন।

সুন্নাতের হেফাজতও কি আল্লাহ করেছেন?

আপনার এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জওয়াব শুনার পূর্বে এ কথার উপর সামান্য চিন্তা করুন যে, কুরআন মজীদের হেফাজতের যে দায়িত্ব আল্লাহ

তাআলা গ্রহণ করেছেন তা কি তিনি সরাসরি হেফাজত করছেন না মানুষের মাধ্যমে হেফাজত করছেন? এর উত্তর আপনি এছাড়া আর কিছুই দিতে পারবেন না যে, তার হেফাজতের জন্য মানুষকেই মাধ্যম বানানো হয়েছে। আর কার্যত তার হেফাজত এভাবে হয়েছে যে, মহানবী (স)–এর নিকট থেকে লোকেরা যে কুরআন লাভ করছিল তা সমসাময়িক কালে হাজারো ব্যক্তি অক্ষরে অক্ষরে মুখস্ত করে নেন, অতপর হাজার থেকে লাখ এবং লাখ থেকে কোটি কোটি মানুষ বংশ পরম্পরায় তা গ্রহণ করেছে এবং মুখস্ত করে আসছে। এমনকি কুরআনের কোন শব্দ দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, অথবা কখনও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হওয়া এবং সাথে সাথে তা দৃষ্টিতে না পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে গেছে। হেফাজতের এই অসাধারণ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য কোন পুস্তকের জন্য সম্ভবপর হয়নি এবং তা প্রমাণ করে যে, এটা আল্লাহ তাআলার পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

আচ্ছা এখন নিরীক্ষণ করে দেখুন যে, সর্বকালের জন্য যে রসূলকে গোটা দুনিয়াবাসীর রসূল বানানো হয়েছিল এবং যাঁর পরে নবুওয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে তার জীবনের কর্মকান্ডের হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এমনভাবে করেছেন যে, মানব জাতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিগত কোন নবী, কোন পথপ্রদর্শক, নেতা, পরিচালক, বাদশাহ অথবা বিজয়ী বীরের ইতিহাস এভাবে সংরক্ষিত নেই। এই হেফাজতের ব্যবস্থাও সেইসব উপায়–উপকরণের সাহায্যে করা হয়েছে যে সবের মাধ্যমে কুরআনের হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির ঘোষণার অর্থ স্বয়ং এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিযুক্ত সর্বশেষ রসূলের পথপ্রদর্শন এবং তাঁর পদাংক কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত রাখার যিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন, যাতে তাঁর জীবন সর্বকালে মানব জাতিকে পথপ্রদর্শন করতে পারে এবং তাঁর পরে কোন নতুন নবীর আগমনের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট না থাকে। এখন আপনি নিজেই দেখে নিন যে, আল্লাহ তাআলা বাস্তবিকই পৃথিবীর পরতে পরতে এই পদচিহ্ন কিভাবে মজবুত করে দিয়েছেন যে, আজ কোন শক্তি তা বিলীন করতে সক্ষম না।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, এই যে উযু, পাঁচ ওয়াক্তের এই নামায, এই আযান, জামাআত সহকারে মসজিদের এই নামায, ঈদের নামায, হজ্জের অনুষ্ঠান, ঈদুল আযহার কুরবানী, যাকাত, খাতনা, বিবাহ ও তালাক, উত্তরাধিকারের নীতিমালা, হালাল–হারামের নিয়মকানুন এবং ইসলামী তাহযীব–তমদ্দুনের আরও অসংখ্য মূলনীতি ও পন্থা–পদ্ধতির যে দিন মহানবী

(স) সূচনা করলেন সেদিন থেকে তা মুসলিম সমাজে ঠিক সেভাবে প্রচলিত হল যেভাবে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ মানুষের মুখে আবৃত্ত হচ্ছে। অতপর হাজার থেকে লাখ এবং লাখ থেকে কোটি কোটি মুসলমান পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায় বংশ পরম্পরায় ঠিক সেইভাবে তার অনুসরণ করে আসছে যেভাবে তারা বংশ পরম্পরায় কুরআন বহন করে আসছে। আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদী কাঠামো রাসূলে পাকের যেসব সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সঠিক ও যথার্থ হওয়ার প্রমাণ হুবহু তাই–যা কুরআন পাকের সংরক্ষিত থাকার প্রমাণ হিসাবে গণ্য। এটাকে যে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করে সে মূলত কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করার পথ ইসলামের দুশমনদের দেখিয়ে দেয়।

পুনরায় দেখুন যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবনাচার এবং তাঁর যুগের সমাজের কেমন বিস্তারিত নকশা, কেমন খুঁটিনাটি বর্ণনা সহকারে, কেমন নির্ভরযোগ্য রেকর্ডের আকারে আজ আমরা পাচ্ছি। এক একটি ঘটনা এবং প্রতিটি কথা ও কাজের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) বর্তমান রয়েছে যা যাচাই করে যে কোন সময় জানা যেতে পারে যে, বর্ণনা হাদীস কতটা নির্ভরযোগ্য? শুধুমাত্র এক ব্যক্তির অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য সেই যুগের প্রায় ছয় লাখ লোকের অবস্থা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে কোন্ ব্যক্তি এই মহামানবের নামে কোন্ কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব বিচার–বিশ্লেষণ করে রায় কায়েম করা যেতে পারে যে, আমরা তাঁর বর্ণনার উপর কতটা নির্ভর করতে পারি। ঐতিহাসিক সমালোচনার একটি ব্যাপক বিষয় একান্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হলো যে, এই অনুপম ব্যক্তিত্বের সাথে যে কথাই সংশ্লিষ্ট হবে তা যে কোন দিক থেকে পর্যালোচনা করে যেন তার যথার্থতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর গোটা ইতিহাসে এমন আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, কোন ব্যক্তির সার্বিক অবস্থার সংরক্ষণের জন্য মানবীয় হাতের সাহায্যে এইরূপ চেষ্টা বাস্তব রূপ লাভ করেছে? যদি না পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও না, তবে তা কি এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এই চেষ্টার পেছনেও সেই মহান আল্লাহর অভিসন্ধি কার্যকর রয়েছে যা কুরআন পাকের হেফাজতের জন্য কার্যকর রয়েছে?

ওহী বলতে কি বুঝায়?

আপনার চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, "কুরআনের কোন স্থানে আরবী শব্দের পরিবর্তে একই অর্থ প্রকাশক ভিন্ন শব্দ স্থাপন করলে তাকে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মনে করা হবে? ওহীর উল্লেখিত দ্বিতীয় অংশের অবস্থাও কি তাই?"

এটা আপনি এমন একটা অর্থহীন প্রশ্ন করেছেন যে, আমি কোন শিক্ষিত লোকের নিকট থেকে এরূপ প্রশ্নের আশা করতাম না। শেষ পর্যন্ত আপনাকে কে বলেছে যে, রসূলুল্লাহ (স) কুরআন পাকের ভাষ্যকার এই অর্থে যে, তিনি তাফসীরে বায়দাবী অথবা জালালাইনের মত কোন তাফসীর লিখেছিলেন, যার মধ্যে কুরআনের আরবী শব্দসমূহের ব্যাখ্যায় সমার্থবোধক কতিপয় আরবী শব্দ লিখে দিয়েছিলেন এবং এই ব্যাখ্যামূলক অংশকে এখন কোন ব্যক্তি "আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী" বলছে? যে কথা আপনাকে পুনপুন বলা হচ্ছে তা এই যে, রসূলুল্লাহ (স) পয়গাম্বর হিসাবে যা কিছুই করেছেন এবং বলেছেন তা ওহীর ভিত্তিতেই। তাঁর গোটা নবুওয়াতী কার্যক্রম তিনি ব্যক্তি হিসাবে করেননি, বরং আল্লাহর নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে করেছেন। নবী হিসাবে তিনি কোন কাজই আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে অথবা তাঁর ইচ্ছা ছাড়া করতে পারেন না। একজন শিক্ষক, মুরব্বী, নৈতিক সংস্কারক, সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাতা, বিচারক, আইন প্রণেতা, পরামর্শদাতা, সেনাপতি এবং একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তিনি যত কাজই করেছেন তার সবই মূলতঃ আল্লাহর রসূল হিসাবে তাঁর কাজ ছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ওহী তাঁর পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান করত। কোথাও সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে আল্লাহর ওহী যথা সময়ে তার সংশোধন করে দিত। এই ওহীকে আপনি যদি এ অর্থে গ্রহণ করেন যে, কুরআনের শব্দাবলীর ব্যাখ্যায় আরবী ভাষার কতিপয় সমার্থবোধক শব্দ নাযিল হয়ে যেত, তবে আমি এছাড়া আর কি বলতে পারি যে-بَرین عقل و دانش بباید کریست- "বুদ্ধিজ্ঞানের বহর যাদের এই তাদের থেকে দুরে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

আপনার জানা উচিত যে, ওহী অপরিহার্যরূপে কেবল শব্দসমষ্টির আকারেই আসত না, তা একটি ধারণার আকারেও হতে পারে যা অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। তা মনমগজ ও চিন্তার জন্য পথ নির্দেশনার আকারে হতে পারে। তা কোন একটি বিষয়ের সঠিক বোধশক্তির আকারে, কোন সমস্যার যথার্থ সমাধানের আকারে অথবা কোন অবস্থা বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত কৌশল হৃদয়ঙ্গম করানোর আকারেও হতে পারে। তা শুধুমাত্র একটি আলোকবর্তিকাও হতে পারে যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি তার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। তা একটি সত্য স্বপ্নও হতে পারে। তা পর্দার আড়াল থেকে একটি আওয়াজ অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে আগত একটি বার্তাও হতে পারে। আরবী ভাষায় "ওহী" শব্দের অর্থ "সুক্ষ্ম ইংগিত"। ইংরেজী ভাষায় এর কাছাকাছি শব্দ হলো Revelation. আপনি যদি আরবী না জানেন তবে ইংরেজী ভাষারই কোন অভিধানে উপরোক্ত শব্দের অর্থ দেখে নিন। এরপর আপনি নিজেই জানতে

পারবেন যে, কোন শব্দের পরিবর্তে তদস্থলে সমার্থবোধক শব্দ স্থাপন করার এই অদ্ভুত ধারণা–যাকে আপনি ওহীর অর্থে গ্রহণ করেছেন কতটা শিশু সুলভ ধারণা!

আপনার পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, "কোন কোন লোক বলে যে, মহানবী (স) নবুওয়াত লাভের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু করেছেন তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী। আপনি কি তাদের সাথে একমত? যদি একমত না হন তবে এক্ষেত্রে আপনার আকীদা–বিশ্বাস কি?

এই প্রশ্নের উত্তর চার নম্বর প্রশ্নের উত্তরে এসে গেছে এবং উপরে আমি যে আকীদা বর্ণনা করেছি তা "কোন কোন লোকের" নয়, বরং ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আকীদা।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি মাত্র

আপনার ষষ্ঠ প্রশ্ন হলো, "আপনি যদি মনে করেন মহানবী (স)–এর কতিপয় বাণী ওহীর সমষ্টি এবং কতিপয় বাণী ওহী ছিল না তবে আপনি কি বলবেন যে, মহানবী (স)–এর যেসব বাণী ওহী ছিল তার সংকলন কোথায় আছে? অনন্তর তাঁর যেসব বাণী ওহী ছিল না, মুসলমানদের ঈমান ও আনুগত্যের বিচারে তার মর্যাদা কি?"

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রথম অংশে আপনি আপনার তিন নম্বর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এর জওয়াবও তাই যা উপরে ঐ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আপনি আপনার দুই নম্বর চিঠিতে যে কথা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আমি তার জওয়াবও দিয়েছি। সন্দেহ হচ্ছে, আপনি আমার উত্তরসমূহ মনোনিবেশ সহকারে পড়েনও না এবং একই ধরনের পশ্নের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন।

ঈমান ও কুফরের মাপকাঠি

আপনার সপ্তম প্রশ্ন এই যে, "কোন ব্যক্তি যদি কুরআন পাকের কোন আয়াত সম্পর্কে বলে, "তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়" তবে আপনি কি একমত হবেন যে, সে ইসলামের গন্ডী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে? যদি কোন ব্যক্তি হাদীসের বর্তমান সংগ্রহসমূহের কোন হাদীস সম্পর্কে বলে যে, তা আলাহ্র ওহী নয় তবে সেও কি ইসলামের গন্ডি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে?"

উপরোক্ত প্রশ্নের জওয়াব এই যে, হাদীসের বর্তমান সংগ্রহসমূহ থেকে যেসব সুন্নাতের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। এক প্রকারের

সুন্নাত হলো, উম্মাত শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেগুলোর সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে আসছে, অর্থাৎ অন্য কথায় তা মুতাওয়াতির (ধারাবহিকভাবে প্রাপ্ত) সুন্নাতসমূহ এবং তার উপর উম্মাতের ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে কোনটি মানতে যে ব্যক্তিই অস্বীকার করবে সে ঠিক সেভাবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে যেমন কুরআনের কোন আয়াত অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। দ্বীতিয় প্রকারের সুন্নাত হল– যেগুলো সম্পর্কে মতভেদ আছে, অথবা মতভেদ হতে পারে। এই প্রকারের সুন্নাতের মধ্য থেকে কোনটি সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তার সার্বিক পর্যালোচনা অনুযায়ী অমুক সুন্নাতটি প্রমাণিত নয়, তাই আমি তা গ্রহণ করছি না, তবে এই কথায় তার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। ইলমী দিক থেকে তার অভিমত আমাদের সঠিক অথবা ভ্রান্ত মনে করাটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু সে যদি বলে যে, তা বাস্তবিকই রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত হলেও আমি তার আনুগত্য করতে প্রস্তুত নই, তবে তার ইসলামের গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ সে রসূলুল্লাহ (স)–এর কর্তৃত্ব (authority)–কে চ্যালেঞ্জ করছে, যার সুযোগ ইসলামের গন্ডিতে নাই।

সুন্নাতের বিধানের কি পরিবর্তন হতে পারে?

আপনার আট নম্বর প্রশ্ন এই যে, "রসূলুল্লাহ (স) দীন ইসলামের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য যেসব পন্থার প্রস্তাব করেছেন, কোন যুগের চাহিদা ও সার্বিক কল্যাণের বিবেচনায় তার আংশিক পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি না? কুরআনের বিধানের ক্ষেত্রেও এরূপ আংশিক পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি না?"

উপরোক্ত প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কুরআনিক বিধানের অংশবিশেষ হোক অথবা রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রমাণিত সুন্নাতের কোন বিধানের অংশবিশেষ, উভয় ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই অবস্থায় এবং সেই সীমা পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে– যখন এবং যে সীমা পর্যন্ত বিধানের মূল পাঠ কোন পরিবর্তনের সুযোগ দেয়, অথবা এমন অন্য কোন নস (কুরআনের আয়াত ও প্রমাণিত সুন্নাত) পাওয়া যায় যা কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন বিশেষ ধরনের বিধানে পরিবর্তন সাধনের অনুমতি দেয়। এছাড়া কোন মুমিন ব্যক্তি নিজেকে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানে পরিবর্তন সাধনের অধিকারী বা উপযুক্ত বলে চিন্তাও করতে পারে না। অবশ্য যেসব লোক ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়েও মুসলমান থাকতে চায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের কর্মপন্থা হলো, প্রথমে তারা

আল্লাহর রসূল (স)–কে আইন–কানুন থেকে বেদখল করে "মুহাম্মাদ বিহীন কুরআন" অনুসরণের অদ্ভুত মতবাদ আবিষ্কার করে, অতপর কুরআন থেকে গা বাঁচানোর জন্য তার এমন পছন্দসই ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে যা দেখে ইবলীস শয়তানও তাদের পরাকাষ্ঠার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

বিনীত

আবুল আ'লা

অভিযোগ ও তার জওয়াব

[পূর্বোক্ত পত্রালাপের পর ডঃ আবদুল ওয়াদূদ সাহেবের যে দীর্ঘ চিঠি হস্তগত হয়েছিল তা তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় 'মানসাবে রিসালাত' সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে। এই সুদীর্ঘ পত্রের এখানে পুনরুক্তি সম্পূর্ণ নিস্প্রোয়জন যা অনেক অনর্থক কথায় পরিপূর্ণ। তাই সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য পত্রলেখকের অপ্রাসংগিক বক্তব্যগুলো পরিহার করে শুধুমাত্র তার আপত্তিসমূহ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে এবং সাথে সাথে প্রতিটি অভিযোগের জওয়াবও দেয়া হচ্ছে, যাতে পাঠকগণ হাদীস অস্বীকারকারীদের অস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক হয়ে যান এবং সাথে সাথে জানতে পারেন যে, তাদের অস্ত্র কতই না দুর্বল]।

১. বাযমে তুলূ–ই ইসলাম পত্রিকার সাথে সম্পর্ক

অভিযোগঃ "আপনি পত্রালাপের সূচনায় আমাকে 'বাযমে তুলূ–ই ইসলাম' পত্রিকার অন্যতম সদস্য বলেছেন। এ সম্পর্কে আমি আপনাকে লিখেছিলাম, উক্ত পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া তো দূরের কথা, আমি তার প্রাথমিক অথবা সাধারণ সদস্যও নই এবং জোর দিয়ে বলেছিলাম যে, আপনি আমার একথা পত্রিকায় ছেপে দিন। কিন্তু আপনি তা ছাপেননি, বরং ছাপানো চিঠিতে এর প্রতি সামান্য ইংগিতও করেননি। অথচ সততা ও সুবিচারের দাবী অনুযায়ী আপনার ভুল স্বীকার করা এবং অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিৎ ছিল।"

উত্তরঃ ডকটর সাহেবের এই আপত্তির জওয়াব স্বয়ং তুলূ–ই ইসলাম–এর পাতায় অন্য কারো মুখে নয়, বরং পারভেয সাহেবের মুখ থেকে শুনাই অধিক উত্তম। ১৯৬০ সনের ৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল লাহোরে তুলূ–ই ইসলাম কনোনেশনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে ডকটর আবদুল ওয়াদূদ সাহেবের ভাষণের পূর্বে পারভেয সাহেব তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ

"ডকটর সাহেবের বন্ধুত্ব আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় এবং আমাদের উপর তাঁর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমার কুরআনের দরস ও

ইতিহাসের ক্লাসের প্রতিটি ভাষণের এক একটি শব্দ লেখার আওতায় নিয়ে এসেছেন। একাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য যা তিনি এতটা আনন্দের সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছেন"-(তুলূ-ই ইসলাম, মে-জুন সংখ্যা, ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২৫)।

এখন যদি ডকটর সাহেব বলেন যে, তিনি বাযমে তুলূ-ই ইসলামের প্রাথমিক সদস্যও নন তবে তা গান্ধীজির অনুরূপ কথাই হবে। কারণ তিনি বলতেন, আমি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নই। তুলূ-ই ইসলামের প্রচারণা সম্পর্কে অবহিত যে কোন ব্যক্তিই এই পত্রালাপ পাঠ করে দেখতে পারেন যে, ডকটর সাহেবের মুখ দিয়ে স্বয়ং তুলূ-ই ইসলাম কথা বলছে না অন্য কেউ?

২. দুর্মুখ প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য কি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ছিল?

অভিযোগঃ আপনি লিখেছেন, "আপনি এই পত্রালাপ বাস্তবিকই যদি কথা বুঝার উদ্দেশ্যে করে থাকতেন তবে সোজা কথা সহজভাবে আপনার বুঝে এসে যেত। কিন্তু আপনার পরিকল্পনাই তো ছিল ভিন্ন কিছু। আপনি আপনার প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশ্নাবলী আমার নিকট পাঠানোর সাথে সাথে তা অপর কতিপয় আলেমের নিকটও এই আশায় পাঠিয়েছিলেন যে, তাদের নিকট থেকে ভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া যাবে। অতপর এসব উত্তর পত্রস্থ করে অপপ্রচার করা যাবে যে, সুন্নাতের দাবীদার আলেমগণ সুন্নাত সুন্নাত তো করেন, কিন্তু দুইজন আলেমেরও সুন্নাত সম্পর্কে ঐক্যমত পাওয়া যায় না"-(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬০ খৃ.)।

আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, আপনি আমার এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কিভাবে জ্ঞাত হলেন? আপনি যে উদ্দেশ্য আমার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তাই যে আমার উদ্দেশ্য এর সপক্ষে আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ মানুষের অন্তরের নিয়াত সম্পর্কে তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য মানুষ যেসব জিনিসের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিয়াত (উদ্দেশ্য) সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান করে থাকে তা হচ্ছে, তার কার্যকলাপ এবং যেসব লোকের সাথে একত্রিত হয়ে সে কাজ করে তাদের সামগ্রিক কার্যকলাপ। ডকটর সাহেব হাদীস-বিরোধী লোকদের যে দলের সাহায্য-সহযোগিতা করছেন তারা আপাদমস্তক সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, হাদীস একটি সংশয়পূর্ণ ও বিতর্কিত জিনিস। এই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে যে ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার সাক্ষী প্রমাণ তুলূ-ই ইসলামের পৃষ্ঠাগুলো এবং এই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত

পুস্তকাদি। এসব কাজ দেখে খুব কষ্টেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে, সেই দলেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডকটর আবদুল ওয়াদূদ সাহেবের পক্ষ থেকে উলামায়ে কিরামগণের নামে যে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল তা অকৃত্রিমভাবেই বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের জন্যই ছিল।

৩. রসূলুল্লাহ (স)—এর ব্যক্তিসত্তা ও নববী সত্তা

অভিযোগঃ "আপনার তাফহীমাত গ্রন্থে আপনি বলেছিলেন যে, কুরআন মজীদের কোথাও সামান্যতম অস্পষ্ট ইংগিতও পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে মহানবী (স)–এর ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়েছে। অথচ এখন আপনি বলছেন, মহানবী (স) রসূল হিসাবে যা কিছু করেছেন তা সুন্নাত এবং অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়। আর যা কিছু তিনি ব্যক্তি হিসাবে করেছেন তা সুন্নাত নয় এবং অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় নয়। এভাবে আপনি দুইটি বিপরীতধর্মী কথা বলেছেন।"

উত্তরঃ উক্ত পত্রালাপ চলাকালে ডকটর সাহেব এই বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন এবং তাকে এর জওয়াবও দেয়া হয়েছে? আমি তার নিকট আবেদন করেছিলাম যে, তিনি যদি বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে চান তবে আমার "রসূলুল্লাহ (স)–এর ব্যক্তিসত্তা ও নববী সত্তা" শীর্ষক প্রবন্ধ তরজমানুল কুরআন পত্রিকার ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় পড়ে নিন। তাতে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ডকটর সাহেব তা পাঠ করার কষ্ট স্বীকার করেননি। যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্ন পন্থায় লোকদের মনমগজে ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপন করার চেষ্টায় রত আছে তার মধ্যে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (স)–এর আনুগত্য করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর কোনো ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে নয়, বরং তার ভিত্তি এই যে, তিনি তাঁকে তাঁর রসূল বানিয়েছেন। এই দিক থেকে একটি মতাদর্শ হিসাবে তাঁর ব্যক্তি মর্যাদা ও নববী মর্যাদার মধ্যে নিশ্চিতই পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যেহেতু একই সত্তার মধ্যে কার্যত ব্যক্তি মর্যাদা ও নববী মর্যাদার সম্মিলন ঘটেছে এবং আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই আমরা স্বয়ং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নই যে, আমরা মহানবী (স)–এর অমুক কথা মানব, কারণ তিনি রসূল হিসাবে তা করেছেন বা বলেছেন এবং অমুক কথা মানব না, কারণ এর সম্পর্ক রয়েছে তাঁর

ব্যক্তিসত্তার সাথে। এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)–এর কাজ ছিল। ব্যক্তিগত ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি লোকদের কেবল স্বাধীনতাই প্রদান করেননি, বরং স্বাধীন মত প্রদানের প্রশিক্ষণও দিতেন এবং রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি তাদের বিনা বাক্য ব্যয়ে আনুগত্য করাতেন। এক্ষেত্রে আমাদে যতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে তা রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত, যার মূলনীতি ও সীমা রসূলুল্লাহ (স) নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের একচ্ছত্র স্বাধীনতা নয়। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমি এ প্রসংগে বলেছিলামঃ

যেগুলো স্পষ্টতই ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন এক ব্যক্তির পানাহার, পোশাক পরিধান, বিবাহ, পুত্র–পরিজনের সাথে বসবাস, সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদন, গোসল, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা অর্জন, পায়খানা–পেশাব ইত্যাদি সব কাজও মহানবী (স)–এর জীবনে একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ভূক্ত নয়, বরং তার মধ্যেও শরীআতের সীমা ও পন্থা এবং নিয়ম–কানূনের শিক্ষাও শামিল রয়েছে।.....যেমন মহানবী (স)–এর পোশাক–পরিচ্ছদ ও পানাহারের বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করুন। এর একটি দিক তো এই ছিল যে, তিনি একটি বিশেষ মাপকাঠির পোশাক পরিধান করতেন, যা তৎকালীন আরবে প্রচলিত ছিল এবং যা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগত রুচিও যুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে সমসাময়িক আরব পরিবারগুলোতে যে ধরনের খাদ্য পাকানো হত, তিনি সেই ধরনের খাবারই খেতেন। এই খাদ্য নির্বাচনেও তাঁর রুচির দিকটিও যুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দিকটি এই ছিল যে, এই খাদ্য ও পরিধানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের কাজ ও কথার মাধ্যমে শরীআতের সীমা এবং ইসলামী শিষ্টাচারের শিক্ষা দিতেন। এখন একথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)–এর শিখানো শরীআতের মূলনীতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এর মধ্যে একটি জিনিস তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় দিকটি তাঁর নববী সত্তার সাথে জড়িত ছিল। কারণ যে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন, লোকেরা কিভাবে নিজেদের পোশাক সেলাই করবে, নিজেদের খাদ্য কিভাবে রান্না করবে–শরীআত তা নিজ কার্যসীমার আওতাভুক্ত করেনি। অবশ্য পানাহার ও পরিধানের ক্ষেত্রে হারাম–হালাল ও জায়েয–নাজায়েযের সীমা নির্দিষ্ট করার বিষয়টি এবং ঈমানদার লোকদের নীতি–নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার–ব্যবহার ও শিষ্টাচারের শিক্ষা শরীআত তার আওতাভুক্ত করেছে।"

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করতে গিয়ে আমি উপসংহারে যে কথা বলেছি তা হলো, "মহানবী (স)–এর ব্যক্তিসত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে যে পার্থক্যই থাক তা আল্লাহ্ তাআলার নিকট এবং রসূলুল্লাহ

(স)–এর নিকট রয়েছে এবং আমাদেরকে এ সম্পর্কে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে অবহিত করা হয়েছে যে, আমরা যেন কোথাও আকীদা–বিশ্বাসের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (স)–কে আল্লাহর পরিবর্তে আনুগত্য পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী মনে না করে বসি। কিন্তু উম্মাতের জন্য তো কার্যত তাঁর একটিই মর্যাদা বা সত্তা রয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূল হওয়ার মর্যাদা। এমনকি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (স)–এর ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোন স্বাধীনতা থেকেই থাকে তবে তাও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার কারণেই; এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–ই তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর এই স্বাধীনতা প্রয়োগের প্রশিক্ষণও আমাদেরকে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স)–ই দিয়েছেন।

যে ব্যক্তিই হঠকারিতা মুক্ত হয়ে উপরোক্ত বক্তব্য পাঠ করবে সে নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হবে যে, হাদীস অস্বীকারকারীরা যে জটিলতায় ভুগছে তার আসল কারণ কি আমার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে না তাদের মনমগজে?

৪. সুন্নাতের শিক্ষায় স্তর বিন্যাস

অভিযোগঃ "যেসব বিষয় সম্পর্কে আপনি স্বীকার করেন যে, মহানবী (স) সেগুলো রসূল হিসাবেই বলেছেন বা করেছেন, তার অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও প্রথমে আপনি পার্থক্য করেছেন। অতএব আপনি তাফহীমাত গ্রন্থের ১ম খন্ড, ২৭৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, 'যেসব বিষয় সরাসরি দীন ও শরীআতের সাথে সম্পর্কিত সে ক্ষেত্রে মহানবী (স)–এর কার্যক্রম ও বক্তব্যের পদেপদে আনুগত্য করা অপরিহার্য। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ। এসব ক্ষেত্রে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যেভাবে স্বয়ং কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন তার হুবহু অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এরপর যেসব জিনিস সরাসরি দীনের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং সমাজের আনুষংগিক বিষয়াদি, এসব ক্ষেত্রে এমন কতগুলো জিনিস রয়েছে যা করার নির্দেশ মহানবী (স) দান করেছেন, অথবা যা থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এমন কতগুলো জিনিসও রয়েছে যেখানে তিনি হিকমত ও উপদেশের কথা বলেছেন এবং এমন কিছু জিনিসও রয়েছে যেখানে আমরা মহানবী (স)–এর কর্মনীতির মধ্যে উন্নত নৈতিকতা, খোদাভীতি ও পবিত্রতার শিক্ষা পেয়ে থাকি এবং আমরা তাঁর চলার পথ দেখে দেখে অবহিত হতে পারি যে, কাজের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন্ পন্থাটি ইসলামের প্রাণসত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ"। কিন্তু এখন আপনার বক্তব্য হলো, এ ধরনের পার্থক্য সঠিক নয়।

জওয়াবঃ এ আলোচনায় যা বলা হয়েছে তা শুধু এই যে, সুন্নাত থেকে আমরা যা কিছু শিক্ষা পাই তার সবই একই পর্যায়ভুক্ত ও সমান মর্যাদা সম্পন্ন নয়, বরং তার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন কুরআন মজীদের শিক্ষার মধ্যে স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। হেদায়াতের এই দুটি উৎস থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি তার সবই সমভাবে ফরজ বা ওয়াজিব নয় এবং প্রতিটি নির্দেশের বক্তব্যকে যেনতেনভাবে যে কোন পরিস্থিতিতে কার্যকর করাও উদ্দেশ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বয়ং কুরআন মজীদে দেখে নিন যে, একদিকে ا الصلوٰ وَاٰتُوا الزَّكوٰةَ (তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও) বলা হয়েছে যা নিশ্চিতই ফরজ এবং বাধ্যতামূলক। কিন্তু একইভাবে আমর–এর সীগায় (Imperative Mood) কুরআনে বলা হয়েছেঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ـ

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আমর–এর সীগা ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এখানে শুধু বৈধতা প্রকাশ করে (বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রকাশ করে না)। ডকটর সাহেব যদি বিতর্কের উদ্দেশ্যে এই কথোপকথন না করে থাকতেন তবে তার জন্য বক্তব্য হৃদয়ংগম করা এতটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। তাফহীমাত গ্রন্থের যে প্রবন্ধ (রিসালাত ও তার বিধান) থেকে তিনি এই কথা উধৃত করেছেন তা বের করে পড়ে নিন। তাতে উপরোক্ত বক্তব্যের সংলগ্নেই নিম্নোক্ত বক্তব্য বর্তমান রয়েছেঃ

"অতএব কোন ব্যক্তি যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মহানবী (স)–এর অনুসরণ করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সুন্নাতের অধ্যয়ন করে তবে তার জন্য এটা জানা মোটেই কষ্টকর নয় যে, কোন্ সব বিষয়ে তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করতে হবে, কোন্ সব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলী থেকে মূলনীতি বের করে আইন প্রণয়ন করতে হবে আর কোন্ সব কাজে তাঁর সুন্নাত থেকে নৈতিকতা ও কৌশল এবং কল্যাণ ও সংস্কার–সংশোধনের সাধারণ মূলনীতি বের করতে হবে।"

আমি পাঠকদের নিকট আরজ করব, তাঁরা যদি আমার এ গ্রন্থটি (তাফহীমাত ১ম খন্ড) সংগ্রহ করতে পারেন তবে যেন এই গোটা প্রবন্ধটি পড়ে নেন। তাহলে হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের মন–মানসিকতার সেই আসল অবস্থা তাদের সামনে উম্মোচিত হয়ে যাবে যার কারণে তারা ঐ প্রবন্ধটির মধ্যে নিজেদের সংশয়–সন্দেহের উপকরণ অনুসন্ধান করেছে যা তাদের পূর্বেকার

সংশয় দূর করতে পারত। অবশ্য এই প্রবন্ধ পাঠের সময় মনে রাখতে হবে যে, তার মধ্যে যে পারভেয সাহেবের উল্লেখ আছে তিনি আজকের নয়, বরং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পারভেয সাহেব। ঐ সময় তিনি পথভ্রষ্টতার সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তরে ছিলেন এবং আজকে তিনি সুস্পষ্ট গোমরাহির স্তর অতিক্রম করে পথভ্রষ্টতার নেতৃত্বের আসন পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।

৫. জ্ঞানানুসন্ধান না বিতর্কপ্রিয়তা?

অভিযোগঃ "একদিকে আপনি তাফহীমাত গ্রন্থে বলেন, নামায, রোযা ইত্যাদি এমন বিষয় যার সম্পর্ক রয়েছে সরাসরি দীন ও শরীআতের সাথে, কিন্তু সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির সম্পর্ক সরাসরি দীনের সাথে নয়। অপর দিকে আপনার দাবী হলো, "ইকামাতে দীন অর্থাৎ দীনের প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে–ইসলাম অনুযায়ী সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা।" আশ্চর্য হতে হয় যে, এসব বিষয়ের সম্পর্ক যদি সরাসরি দীনের সাথে না থাকে তবে ইকামতে দীন বলতে ঐসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা কায়েম কিভাবে হতে পারে! চিন্তা করে দেখুন, দেশের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব বিষয়ের উপর আলোচনা হবে, দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয় ইত্যদির সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। এসব বিষয়ের সম্পর্ক যদি সরাসরি দীনের সাথে না থাকে তবে দেশের আইন–বিধান ধর্মীয় ভিত্তিতে অথবা ধর্ম বহির্ভূত হওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। তাছাড়া এসব বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের অনুসরণ যদি এমন প্রকৃতির না হয়ে থাকে যে প্রকৃতিতে সুন্নাতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক (যা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সরাসরি দীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন নামায ইত্যাদি) তবে এসব ব্যাপারে এই প্রশ্ন উথাপনের কি গুরুত্ব আছে যে, তা সুন্নাত অনুযায়ী কি না?"

উত্তরঃ আমার তাফহীমাত গ্রন্থের বক্তব্যে কোন কোন বিষয়ের দীনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ার এবং কোন কোন বিষয়ের সরাসরি সম্পর্কিত না হওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে তাকে গোটা প্রবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ডকটর সাহেব এই ভুল অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করেছেন যে, আমি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে দীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলেছি। অথচ সেখানে যেসব বিষয়কে আমি "সরাসরি" দীনের সাথে সম্পর্কিত বলেছি তার দ্বারা আমি সেই সব ইবাদত বুঝাচ্ছি, যেগুলোকে আইন প্রণেতা (রসূলুল্লাহ) "ইসলামের রুকন" (ভিত্তি)–এর মর্যাদা দিয়েছেন, অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। অপর দিকে যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি বলেছি যে, দীনের সাথে তা "সরাসরি" সম্পর্কিত নয় তার অর্থঃ ইসলামের রুকনসমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়। এর

অর্থ কখনও এই নয় যে, দীনের সাথে তা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। যদি বাস্তবিকই তা সম্পর্কহীন হত তবে এগুলো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাতে শরীআতী বিধান কেন পাওয়া যাচ্ছে?

ডকটর সাহেব আমার যে বক্তব্যের এই অর্থ বের করেছেন তার শুধুমাত্র দুইটি বাক্যাংশ ("সরাসরি সম্পর্কিত" এবং "সরাসরি সম্পর্কিত নয়") তিনি বেছে নিয়েছেন এবং তার উপর নিজের কল্পনার গোটা ইমারত নির্মাণ শুরু করে দিয়েছেন। অথচ স্বয়ং ঐ বাক্যেই তার এই অর্থের প্রতিবাদ বর্তমান রয়েছে। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়াবলী সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা মহানবী (স)-এর নিকট থেকে পেয়েছি। "তার মধ্যে এমন কতিপয় জিনিস রয়েছে যার নির্দেশ মহানবী (স) দিয়েছেন অথবা যা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কতিপয় জিনিস এরূপ যে...।" এসব বাক্যাংশ থেকে কি এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, মহানবী (স) যেসব কাজের হুকুম দিয়েছেন অথবা যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো সম্পর্কে মহানবী (স)-এর নির্দেশের বিরোধিতা কারা জায়েয, অথবা তাঁর অন্যান্য নির্দেশ উপেক্ষা করা যেতে পারে?

অবশিষ্ট থাকল সেইসব শব্দ যা থেকে ডকটর সাহেব আজ অবৈধ ফায়দা লুটার চেষ্টা করছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি অনেক পূর্বেই অনুভব করেছিলাম, কোন ফেতনাবাজ লোক এগুলো ভুল অর্থে প্রয়োগ করতে পারে। অতএব তাফহীমাত গ্রন্থের ১ম খন্ডের পঞ্চম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খৃ.) দেখে নিন। তাতে পূর্বোক্ত বাক্যের স্থানে নিম্নোক্ত বাক্য লিখে দেয়া হয়েছেঃ "যেসব কাজ ফরজ, ওয়াজিব এবং ইসলামী শরীআতের আকীদা-বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত....থাকল সেইসব কাজ যা ইসলামী জিন্দেগীর সাধারণ নির্দেশসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট।" এই সংশোধন আমি এজন্য করেছিলাম যাতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহ দীনের সাথে সম্পর্কহীন মনে করার ধারণা-যা আমার পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে বের করা যেত, দূর হয়ে যায়। উপরোক্ত একটি প্রবন্ধের পূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তার দুটি বাক্যাংশ থেকে তো গ্রহণ করা যায় না। গোটা প্রবন্ধটি কোন ব্যক্তি পাঠ করলে তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর লক্ষ্য ডকটর সাহেবের দুটি বাক্যাংশ থেকে গৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বিতর্ক করে সে কারো গোটা বক্তব্য শুনার পর তার সামগ্রিক অর্থের উপর বক্তব্য রাখে। কোথাও থেকে একটি বা দুইটি শব্দ নিয়ে তাকে মন্থন করা বিতর্কপ্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. রসূলুল্লাহ (স) এর দ্বিবিধ সত্তার মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি ও পন্থা

অভিযোগঃ "মহানবী (স)–এর নববী সত্তা ও ব্যক্তি সত্তার মধ্যে যদি পার্থক্য করা হয় তবে তা থেকে আপরিহার্যরূপে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, তার মধ্যে কে পার্থক্য করবে? এজন্য ভবিষ্যতে উম্মাতকে যদি বিশেষজ্ঞ আলেমগণের দ্বারস্ত হতে হয় তবে তাদের মধ্যে রয়েছে চরম মতোবিরোধ। তাদের মধ্যে কার বক্তব্য সঠিক মনে করা যাবে আর কার বক্তব্য ভ্রান্ত? এই অবস্থান কতই না দুর্বল। এটা আপনি নিজেও স্বীকার করবেন। অতএব আপনি লিখেছেনঃ

"হাদীসসমূহ কতিপয় লোকের মাধ্যমে অপর কতিপয় লোকের নিকট হস্তান্তর হতে হতে এসেছে। তার দ্বারা সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত যদি কিছু লাভ করা যায় তবে তা সঠিক ধারণা, নিশ্চিত জ্ঞান তার দ্বারা লাভ হয় না। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের এই আশংকার মধ্যে নিক্ষেপ করা কখনও পছন্দ করতে পারেন না যে, যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে দীন ইসলামে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য সৃষ্টি হয় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাত্র কতিপয় লোকের রিওয়ায়াতের উপর সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই প্রকৃতির বিষয়সমূহের দাবীই এই যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে এগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিবেন। আল্লাহ্র রসূল এগুলোকে তাঁর নবূওয়াতী মিশনের মূল কাজ মনে করে তার ব্যাপক প্রচার করবেন এবং তা সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত পন্থায় প্রত্যেক মুসলমানের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে –(রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, পৃ. ৬৭)।

উত্তরঃ আপনার এই অভিযোগটি মূলত অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মহানবী (স)–এর ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে পার্থক্য কে নির্ণয় করবে? মহানবী (স) আমাদেরকে শরীআতের যে নীতিমালা দান করেছেন তার ভিত্তিতে এটা জ্ঞাত হওয়া কোন কষ্টকর ব্যাপারই নয় যে, তাঁর পবিত্র জীবনাচারের মধ্যে কোন্ জিনিসটি তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট আর কোন্ জিনিসটি তাঁর নববী সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় তার জন্য শর্ত এই যে, তাকে কুরআন ও সুন্নাতের এবং ইসলামী ফিক্হের মূলনীতি ও আনুষংগিক বিষয়াদি অধ্যয়নে জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হবে। এটা অন্তত সাধারণ লোকদের করার মত কাজ নয়। এখন বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতপার্থক্যের ব্যাপারে বলা যায় যে, এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা উচিৎ যে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যখনই কোন জিনিসকে

সুন্নাত সাব্যস্ত করা বা না করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেন তখন তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে অবশ্যই দলীল পেশ করেন। তাঁরা গায়ের জোরে কোন দাবী করে বসেন না। তাদেরকে অবশ্যই বলে দিতে হয় যে, শরীআতের মূলনীতিসমূহের মধ্যে কোন্ নীতি–পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁরা কোন জিনিসকে সুন্নাত প্রমাণ করছেন, অথবা তার সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছেন। এই অবস্থায় যেটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে তাই টিকে থাকতে পারবে এবং যে কথাই টিকে যাবে সে সম্পর্কে সকল বিশেষজ্ঞ আলেম জ্ঞাত হবেন যে, তা কোন্ দলীল–প্রমাণের ভিত্তিতে টিকে গেছে। এই প্রকৃতির মতবিরোধ যদি অবশিষ্টও থাকে তবে তা আতংকিত হওয়ার মত কোন জিনিস নয়। তাকে অযথা হাওয়া দিয়ে ফাপিয়ে তোলার চেষ্টা কেন করা হচ্ছে?

এখন আমার রাসাইল ওয়া মাসাইল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এর অর্থ স্বয়ং উধৃত বাক্যেই স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার তা বুঝবার বিন্দু মাত্র চেষ্টা করা হয়নি এবং স্বভাবজাত বিতর্কের উদ্দেশ্যে তা এখানে তুলে দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত বক্তব্যে তো আলোচনা এই বিষয়ের উপর করা হয়েছে যে, যেসব আকীদা–বিশ্বাসের উপর কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া বা না হওয়া নির্ভরশীল সেগুলোর প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র খবরে ওয়াহেদ যথেষ্ট নয়। তার জন্য হয় কুরআনের প্রমাণ থাকতে হবে, অথবা মুতাওয়াতির হাদীস থেকে অথবা কমপক্ষে এমন রিওয়ায়াত থেকে যা মুতাওয়াতির বিল–মানীর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ অসংখ্য রাবীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (স) অমুক আকীদা–বিশ্বাসের শিক্ষা দিতেন। আনুষংগিক বিধানের প্রমাণের জন্য খবরে ওয়াহেদও যথেষ্ট হতে পারে যদি তা সহীহ্ (বিশুদ্ধ) সনদসূত্রে বর্ণিত হয়। কিন্তু ঈমান ও কুফরের ফয়সালা প্রদানকারী বিষয়ের জন্য খুব শক্তিশালী সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হত্যা মামলায় কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার জন্য খুবই শক্তিশালী সমর্থন ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে করা যেতে পারে।

৭. কুরআনের মত হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর ব্যবস্থা করা হল না কেন?

অভিযোগঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ওহী মাতলূ অর্থাৎ প্রকাশ্য ওহী এবং অপরটি ওহী গায়র মাতলূ অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ওহী, এই দুই ধরনের ওহী এসে থকলে তবে এটা কি মহানবী (স)–এর রিসালাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যে,

তিনি ওহীর এই দ্বিতীয় অংশও স্বয়ং সংকলন করিয়ে সংরক্ষিত আকারে উম্মাতকে দিয়ে যেতেন, যেভাবে তিনি ওহীর প্রথম অংশ (কুরআন) উম্মাতকে দান করেছেন?”

উত্তরঃ হাদীস অস্বীকারকারীগণ সাধারণত এই প্রশ্নটি খুবই জোরেশোরে উত্থাপন করে থাকে এবং তাদের ধারণায় তারা এটাকে নিরুত্তর করে দেয়ার মত প্রশ্ন মনে করে। তাদের ধারণা হলো, কুরআন যেহেতু লিখিতভাবে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছিল তাই তা সুরক্ষিত। আর হাদীস যেহেতু মহানবী (স) স্বয়ং লিখিয়ে সংকলনাবদ্ধ করাননি তাই তা অরক্ষিত। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, মহানবী (স) যদি কুরআন মজীদ শুধুমাত্র লিখিত আকারেই রেখে দিতেন এবং হাজার হাজার লোক তা মুখস্ত করার পর পরবর্তী বংশধরদের নিকট মৌখিকভাবে পৌছিয়ে না দিতেন তবে এই লিখিত দস্তাবেয কি পরবর্তী কালের লোকদের জন্য এই কথার চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারত যে, এটা সেই কুরআন যা মহানবী (স) লিখিয়েছিলেন? তাও তো স্বয়ং সাক্ষ্য-প্রমাণের মুখাপেক্ষী হত। কারণ যতক্ষণ না কতিপয় লোক এই সাক্ষ্য দিত যে, মহানবী (স) তাদের সামনে এই কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন ততক্ষণ ঐ লিপিবদ্ধ গ্রন্থখানির নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যেত।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল, কোন জিনিসের নির্ভরযোগ্য হওয়াটা শুধুমাত্র তার লিখিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং জীবিত লোকেরা যতক্ষণ এর অনুকূলে সাক্ষ্য না দেয় ততক্ষণ তা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয় না। মনে করুন কোন বিষয় সম্পর্কে লিখিত কিছু বর্তমান নাই, কিন্তু জীবিত লোকদের সাক্ষ্য বর্তমান আছে। এখন এ সম্পর্কে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, এর সপক্ষে লিখিত কিছু না পাওয়া পর্যন্ত এসব জীবিত লোকদের সাক্ষ্য কি প্রত্যাখ্যাত হবে? খুব সম্ভব আপনি আইনকানূন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন একজন লোকও পাবেন না যিনি এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিতে পারেন। আজ পৃথিবীর কোথাও মহানবী (স)-এর উদ্যোগে লিখিত কুরআন মজীদের কপি বর্তমান নাই, কিন্তু তার ফলে কুরআন পাকের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতার উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে না। ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন বাচনিক বর্ণনার মাধ্যমে তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ (স) যে কুরআন মজীদ লিখিয়েছিলেন তাও স্বয়ং বাচনিক বর্ণনার ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অন্যথায় মূল দস্তাবেজ এই দাবীর সমর্থনে পেশ করা যেত না। আর তা যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে এটা প্রমাণ করা যেত না যে, এটাই সেই সহীফা যা মহানবী (স) লিখিয়েছিলেন। অতএব এসব লোক লেখার উপর

যত জোর দেয় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহানবী (স) নিজের সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাংগ সমাজ রেখে যান যার জীবনের প্রতিটি দিকের উপর তাঁর সুন্নাতের সীলমোহর লাগানো ছিল। এ সমাজে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন, তাঁর কাজকর্ম দেখেছেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এমন হাজার হাজার লোক বর্তমান ছিলেন। এই সমাজ পরবর্তী বংশধরদের নিকট এই সব চিহ্ন পৌছে দিয়েছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় তা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। দুনিয়ার কোন সর্বজন স্বীকৃত সাক্ষ্যের মূলনীতি অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অতপর একথা বলাও ঠিক নয় যে, এসব নিদর্শন কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং এসব নিদর্শন সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া মহানবী (স)–এর যুগেই শুরু হয়েছিল। প্রথম হিজরী শতকে এদিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিসগণ জীবন্ত সাক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য–উভয়ের সাহায্যে এই গোটা স্মৃতি সংকলনের আওতায় নিয়ে আসেন।

৮. ধোঁকা ও প্রতারণার একটি নমুনা

অভিযোগঃ "ওহীর দ্বিতয়ি অংশ–যার সংরক্ষণ সম্পর্কে আপনি এখন বলছেন যে, এর পশ্চাতেও আল্লাহ তাআলর সেই ব্যবস্থাপনা কার্যকর রয়েছে যা কুরআন মজীদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে যে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করে সে মূলত কুরআনের যথার্থতা চ্যালেঞ্জ করার পথ ইসলামের শত্রুদের দেখিয়ে দিচ্ছে।" এর ধরনটা কি? এ সম্পর্কে আমার থেকে নয়, স্বয়ং আপনার বক্তব্য থেকে জেনে নিন। আপনি রাসায়েল ওয়া মাসায়েল গ্রন্থের ২৭০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

"রসূলুল্লাহ (স)–এর কথা এবং যেসব রিওয়ায়াত হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় তা অপরিহার্যরূপে একই জিনিস নয়। আর এসব রিওয়ায়াতকে সনদসূত্রের ভিত্তিতে কুরআনের আয়াতের সমকক্ষ সাব্যস্ত করা যায় না। কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে রিওয়ায়াত সম্পর্কে এই সন্দেহের অবকাশ আছে যে, যে কথা বা কাজকে মহানবী (স)–এর কথা বা কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা বাস্তবিকই মহানবী (স)–এর সাথে সম্পর্কিত কি না?"

উত্তরঃ সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত সামান্য দেখে নিন যে, উল্লেখিত বক্তব্যের পরপরই যে বক্তব্য রয়েছে তা জ্ঞাতসারেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যাদের

নিকট রাসায়েল ওয়া মাসায়েল প্রথম খন্ড রয়েছে তারা তার পৃষ্ঠা খুলে নিন, উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে সাথে নিম্নোক্ত বক্তব্যও বর্তমান রয়েছেঃ

যেসব সুন্নাত (হাদীস) মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) সূত্রে মহানবী (স)–এর নিকট থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, অথবা যেসব রিওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃত মুতাওয়াতির সনদের শর্তবলীর মানদন্ডে টিকে গেছে তা নিশ্চিতই প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য দলীল হিসাবে গৃহীত। কিন্তু যেসব রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়নি তার সাহায়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না, বরং নিশ্চয়তার প্রবল ধারণা জন্মে। এ কারণে উসূলবিদ আলেমগণের নিকট একথা সর্ববাদী স্বীকৃত যে, যেসব হাদীস মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত নয়, সেগুলো আইন–কানূনের উৎস হতে পারে বটে, কিন্তু ঈমানের (অর্থাৎ যার সাহায্যে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য সৃষ্টি হয়) উৎস হতে পারে না।”

এই নৈতিক দুঃসাহস বাস্তবিকই আশীর্বাদযোগ্য যে, আমাকে স্বয়ং আমার বক্তব্যের সাহায্যে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৯. হাদীসের ভান্ডারে কি জিনিস সন্দেহজনক এবং কি জিনিস সন্দেহমুক্ত

অভিযোগঃ “কুরআন মজীদ সম্পর্কে তো আল্লাহ তাআলা প্রথমেই বলে দিয়েছেন যেঃ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ “এই গ্রন্থে সন্দেহ–সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।” আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহীর অবস্থা এই যে, তাতে এরূপ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, যে কথা বা কাজকে রসূলুল্লাহ (স)–এর সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে তা বাস্তবিকই মহানবী (স)–এর কথা বা কাজ কি না? এরই নাম কি আল্লাহর হেফাজত?”

উত্তরঃ সত্য কথা হলো, হাদীস অস্বীকারকারীগণ হাদীস শাস্ত্রের সামান্যতম অধ্যয়নও করেনি। এজন্য তারা বারবার এই বিষয়টি নিয়ে সংশয়ে পতিত হয়েছে যে বিষয়টি সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও সহজেই বুঝতে পারে। আসলে এসব লোককে বুঝানো আমার সাধ্যের বাইরে। কারণ তাদের মধ্যে হৃদয়ংগম করার আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের বুঝবার জন্য আমার আরজ এই যে, লোকেরা দুটি জিনিস যদি উত্তমরূপে জেনে নেয় তবে তাদের মনে কোন সংশয় সৃষ্টি হতে পারে না।

এক, ওহীর দুটি বৃহৎ বিভাগ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে যা আল্লাহ তাআলার নিজের বাক্যে মহানবী (স)–এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যেন

তিনি সৃষ্টিকুলের নিকট তা হুবহু সেই বাক্যেই পৌঁছিয়ে দেন। এর নাম ওহী মাতলূ (যা তিলাওয়াত করা হয়) এবং এই ধরনের সমস্ত ওহী সেই গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে যাকে সমগ্র বিশ্ব কুরআন নামে জানে। দ্বিতীয় প্রকারের ওহী ছিলো তা যা রসূলুল্লাহ (স)–কে দিকনির্দেশনা দানের জন্য নাযিল করা হত। যেন তার আলোকে তিনি সৃষ্টিকুলের পথপ্রদর্শন করতে পারেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নির্মাণ করতে পারেন এবং ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। এই ওহী জনগণের নিকট অক্ষরে অক্ষরে পৌঁছানোর জন্য ছিল না, বরং তার প্রভাবসমূহ মহানবী (স)–এর কথা ও কাজের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ও অবয়বে প্রকাশ পেত। মহানবী (স)–এর গোটা জীবনাচার এই নূরের প্রকাশক ছিল। এই জিনিসকেই সুন্নাত ও ওহী গায়রে মাতলূ বলা হয়–অর্থাৎ যে ওহী তিলাওয়াতের জন্য নয়।

দুই, যেসব উপায়–উপকরণের মাধ্যমে আমরা দীনের জ্ঞান লাভ করেছি তার ক্রমিক বর্ণনা এই যে, সর্বপ্রথমে আল–কুরআন, অতপর যেসব সুন্নাত অব্যাহত আমলের মাধ্যমে অর্থাৎ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে মহানবী (স)–এর নিকট থেকে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যেসব কাজের উপর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাতের মধ্যে অব্যাহত অনুশীলন হয়ে আসছে।

অতপর যেসব নির্দেশ এবং তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত মুতাওয়াতির ও মশহূর রিওয়ায়াতের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে।

অতপর যেসব খবরে ওয়াহিদ–যার সনদও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, যা কুরআন ও মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পরের সমর্থন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

অতপর যেসব খবরে ওয়াহিদ–সনদের দিক থেকেও সহীহ্ এবং কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনার সাথেও সাংঘর্ষিক নয়।

এসব উপায়ে আমরা মহানবী (স)–এর নিকট থেকে যা কিছুই লাভ করেছি তা সংশয়–সন্দেহের উর্ধে। অতপর পরবর্তী স্তরে গিয়ে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কথা বা কাজ যা মহানবী (স)–এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে তা বাস্তবিকই তাঁর কথা বা কাজ কি না? এই প্রশ্ন মূলত নিম্নোক্ত প্রকারের রিওয়ায়াতসমূহের বেলায় উঠতে পারেঃ

১. যেসব হাদীসের সনদ শক্তিশালী, কিন্তু তার বিষয়বস্তু অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোন জিনিসের বিপরীত দেখা যায়।

২. যেসব হাদীসের সনদ শক্তিশালী, কিন্তু সেগুলো পরস্পর বিপরীত এবং এই বৈপরিত্য দূর করা কষ্টকর মনে হয়।

৩. যেসব হাদীসের সনদ শক্তিশালী, কিন্তু সেগুলো একক (মুনফারিদ) বর্ণনা এবং অর্থগত দিক থেকে তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা অনুভূত হয়।

৪. যেসব হাদীসের সনদের মধ্যে কোন প্রকারের দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন দোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এবং

৫. যেসব হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু উভয়ের ব্যাপারে আপত্তি তোলার সুযোগ রয়েছে।

এখন যদি এই দ্বিতীয় প্রকারের রিওয়ায়াতসমূহের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয় তবে তাকে এরূপ দাবী করার অনুকূলে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না যে, প্রথমোক্ত উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর নিকট থেকে আমরা যা কিছু লাভ করেছি তাও সন্দেহপূর্ণ।

উপরন্ত একথাও জেনে রাখা দরকার যে, দীন ইসলামে যেসব বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ তার সবই প্রথমোক্ত মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং দ্বিতীয় স্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ অধিকাংশই শুধু প্রাসংগিক, আনুষংগিক ও অপ্রধান (যদিও প্রয়োজনীয়), যে ক্ষেত্রে একাধিক মতের মধ্যে যে কোন একটি মত গ্রহণ করলে মূলত কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি এর মধ্যে কোন একটি রিওয়ায়াত সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করলে এবং অপরজন তা গ্রহণ না করলেও উভয়ই মহানবী (স)-এর অনুসারী গণ্য হবে। অবশ্য যেসব লোক বলে, মহানবী (স)-এর কথা ও কাজ প্রকৃতই তাঁর কথা ও কাজ প্রমাণিত হলেও তা আমাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখে না-এরা মহানবী (স)-এর অনুসারী নয়।

১০. আরও একটি প্রতারণা

অভিযোগঃ "হাদীসসমূহের হেফাজত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায়" যে দুর্বলতা রয়েছে তা আপনি নিজেও স্বীকার করেন। আপনি লিখেছেনঃ "প্রথম দৃষ্টিতেই একথা সম্পূর্ণ সঠিক মনে হয় যে, যেসব কাওলী (বাচনিক) ও ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস শ্রবণকারী ও দর্শণকারীর সংখ্যা অনেক, সেগুলোকে মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদা দেয়া উচিৎ। তার মধ্যে মতবিরোধ থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণ বিবেচনায় একথা বুঝতে সক্ষম যে, যে ঘটনা বহু সংখ্যক লোক দেখেছে অথবা আলোচনা বহু সংখ্যক লোক শুনেছে,

সেগুলো বর্ণনা করার বেলায় অথবা তদনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে সব লোকের মধ্যে এতোটা মতৈক্য পাওয়া সম্ভব নয় যে, তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও নেই। যেমন ধরুন আজ আমি একটি বক্তৃতা করলাম এবং কয়েক হাজার লোক তা শুনলো। সভা শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই (মাস অথবা বছর নয়, মাত্র কয়েক ঘন্টা পর) লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যে, বক্তা কি বলেছে? আপনি দেখবেন যে, বক্তৃতার বিষয়বস্তু উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সকলের বর্ণনা হুবহু এক রকম হবে না। কেউ বক্তৃতার কোন অংশ বর্ণনা করবে, কেউ অন্য অংশ, কেউ কোন বাক্য হুবহু বর্ণনা করবে, কেউ তার সারসংক্ষেপ নিজ বোধশক্তি অনুযায়ী নিজের বাক্যে বর্ণনা করবে। ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বক্তৃতা সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করে তার যথার্থ সারসংক্ষেপ বর্ণনা করবে। কারো বোধশক্তি খুব ভালো না হওয়ায় সে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিজের কথায় সঠিক ভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। কারো মুখস্ত শক্তি প্রখর হওয়ার কারণে আলোচনাটির বেশীরভাগ হুবহু বর্ণনা করতে সক্ষম হবে। কারো স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করবে" (তাফহীমাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩০)।

উত্তরঃ প্রথম কথা হলো, উপরোক্ত উধৃতির ঠিক মাঝখানের রেখা টানা একটি অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং পড়ে দেখতে পারে যে, কতটা সৎ উদ্দেশ্যে তা বাদ দেয়া হয়েছে। পরিত্যক্ত অংশটুকু নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

"এই ঘটনা বা এই বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশের উপর তো অবশ্যি সকলের মতৈক্য পাওয়া যাবে, কিন্তু আনুষংগিক ও অপ্রধান অংশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতপার্থক্যও পাওয়া যাবে এবং এই মতপার্থক্যের দ্বারা কখনও প্রমাণিত হয় না যে, বর্ণিত ঘটনা মূলতই সংঘটিত হয়নি।"

তারপর এই উধৃতির পরবর্তী গোটা আলোচনাই ছিল যেহেতু ডঃ সাহেবের সন্দেহ–সংশয়ের জওয়াব এবং তার মাধ্যমে সন্দেহ দূর হতে পারত, এজন্য ডঃ সাহেব তার উল্লেখ বর্জন করেছেন, কারণ তিনি তো সন্দেহ–সংশয়ের অনুসন্ধানেই আছেন। একটি আলোচনার যতখানি অংশ সন্দেহপ্রবণ হতে এবং সন্দেহপ্রবণ করতে প্রয়োজন তিনি ততটুকু গ্রহণ করেন এবং যে অংশের সাহায্যে জট খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে তা তিনি কেটেছেটে ফেলে দেন। আরো মজার ব্যাপার হলো, একজন লেখককে তাঁরই গ্রন্থের সাহায্যে এই ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি পাঠকদের নিকট আরজ করব, তাঁরা যদি 'তাফহীমাত' গ্রন্থের প্রথম খন্ড পেয়ে যান তাহলে সেখানে "হাদীস কে

সুন্নাতাআল্লাহ চানদ সোয়ালাত” (হাদীস সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন) শীর্ষক প্রবন্ধটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন, যেখান থেকে উধৃত অংশ পেশ করা হয়েছে। তথাপি উল্লেখিত উধৃতাংশের পরপরই আমার যে বক্তব্য রয়েছে তা এখানে উল্লেখ করাই ভালো মনে হয়, তাহলে গ্রন্থখানি যারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন না, তারাও ডকটর সাহেবের ভেল্কীবাজির সমুচিত জবাব দিতে পারবেন। বাদ দেয়া বাক্যাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

"এখন যদি কোন ব্যক্তি এই মতবিরোধ দেখে বলে যে, আমি মূলত কোন বক্তৃতাই করিনি, অথবা বক্তৃতার আদ্যপান্ত ভুল নকল করা হয়েছে, তাহলে তা সঠিক নয়। পক্ষান্তরে বক্তৃতা সম্পর্কে যদি সমস্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয় তবে জানা যাবে যে, বর্ণনাকারীদের মধ্যে একটি বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, আমি বক্তৃতা করেছি, অমুক স্থানে করেছি এবং অমুক সময়ে করেছি। সেখানে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিল এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তু এই ছিল। অতপর বক্তৃতার যে যে অংশ সম্পর্কে আক্ষরিক ও অর্থগত দিক থেকে অধিক মতৈক্য পরিলক্ষিত হবে তা অধিক নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে এবং এসব তথ্য একত্র করে বক্তৃতার একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রণয়ন করা যায়। আর বক্তৃতার যেসব অংশের বর্ণনা একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পাওয়া যাবে তা তুলনামূলকভাবে কম নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে, কিন্তু তাকে মনগড়া অথবা ভ্রান্ত বলা ঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বক্তৃতার পূর্ণ ভাবধারার পরিপন্থী না হয়, অথবা তার মধ্যে এমন কোন কথা না থাকে যার কারণে তার যথার্থতা সন্দেহপূর্ণ হয়ে পড়ে, যেমন বক্তৃতার নির্ভরযোগ্য অংশের বিপরীত হওয়া, অথবা বক্তার চিন্তাধারা, প্রকাশ ভংগী ও মেজাজ–প্রকৃতি সম্পর্কে লোকদের মধ্যে পূর্ব থেকে যে সঠিক পরিচয় বর্তমান রয়েছে তার পরিপন্থী হওয়া।"

১১. উম্মাতের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ কোন জিনিস কি নেই?

অভিযোগঃ "আপনি বলছেনঃ সুন্নাত সুরক্ষিত হওয়ার প্রমাণ এই যে, উযু, পাঁচ ওয়াক্তের নামায, আযান, দুই ঈদের নামায, বিবাহ, তালাক উত্তরাধিকারের বিধান ইত্যাদি মুসলিম সমাজে ঠিক সেইভাবে প্রচলিত আছে যেভাবে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে।" আপনি কি বলতে পারবেন যে, নামায, আযান, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গোটা উম্মাত একই পন্থায় আমল করছে?"

উত্তরঃ নামায, আযান, বিবাহশাদি, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে যতখানি অংশের উপর উম্মাতের ঐক্যমত রয়েছে তা একদিকে জমা করুন,

এবং অপরদিকে যেসব বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় তা একত্র করুন। আপনি স্বয়ং জানতে পারবেন যে, কত বেশী পরিমাণ মতৈক্য রয়েছে এবং খুব কমই মতানৈক্য আছে। মৌলিক বিষয়ের প্রায় সবগুলোতেই মতৈক্য রয়েছে এবং মতানৈক্য হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আনুষংগিক ব্যাপারে। কিন্তু যেহেতু মতৈক্যের বিষয়গুলো নিয়ে কখনো বিতর্ক হয় না, বরং মতভেদের বিষয়গুলো নিয়েই সব সময় বিতর্কের সূচনা হয়, ফলে বিতর্ক বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে চোখে পড়ার মতো করে রেখেছে। এই কারণে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা ভ্রান্তির শিকার হয়ে মনে করে যে, উম্মাতের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ কিছুই নেই। উদাহরণ স্বরূপ নামাযের কথাই মনে করুন। গোটা বিশ্বের মুসলমান একমত যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ, এর ওয়াক্তসমূহ নির্দিষ্ট, নামায পড়তে হলে দেহ এবং পরিচ্ছদ পাক হতে হবে এবং উযু করতে হবে, কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে হবে, নামাযে কিয়াম (দন্ডায়মান অবস্থা), রুকূ-সিজদা ও বৈঠকাদি পর্যায়ক্রমে হতে হবে, প্রতি ওয়াক্তে এত এত রাকআত নামায ফরজ , তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু করতে হবে। নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় অমুক জিনিস, রুকূ অবস্থায় অমুক জিনিস, সিজদা অবস্থায় অমুক জিনিস এবং বসা অবস্থায় অমুক জিনিস পড়তে হবে। মোটকথা নামাযের গোটা কাঠামোতেই সামগ্রিকভাবে মতৈক্য রয়েছে। মতানৈক্য কেবল এমন সব বিষয়ে যে, হাত বেঁধে রাখবে না ছেড়ে দিতে হবে, বাঁধলে তা বুকের উপর বাঁধবে না নাভির উপর, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বে কি না, সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' সশব্দে বলতে হবে না নিঃশব্দে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদগুলোকে ভিত্তি করে এই দাবী করা ঠিক হবে কি যে, নামাযের বিষয়ে উম্মাত মূলতই কোন ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? আযানের মধ্যে এতটুকু মতভেদ আছে যে, শীআ সম্প্রদায় "হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল" বলে থাকে, এবং সুন্নীগণ তা বলে না। আযানের অবশিষ্ট সকল বাক্যে ও সংশ্লিষ্ট মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। এই সামান্য মতবিরোধকে কি এই কথার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে যে, আযান স্বয়ং একটি বিতর্কিত বিষয়?

১২. সুন্নাত মতবিরোধ কমিয়েছে না বৃদ্ধি করেছে?

অভিযোগঃ "আপনি যদি বলেন, হাদীসের ভিত্তিতে সৃষ্ট মতভেদসমূহ আনুষংগিক ও অপ্রধান বিষয়াবলীর সাধারণ প্রকৃতির মতবিরোধ, এর দ্বারা দীনের উপর কোন প্রভাব পড়ে না, তাহলে একথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আনুষংগিক ও অপ্রধান যেসব বিষয় (আপনার বক্তব্য অনুযায়ী) আল্লাহর ওহীর

মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে সামান্যতম মতবিরোধও কি পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না? উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা কুরআনে উধৃত ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিয়েছেন যে, উযুর মধ্যে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। যদি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় নিজের হাত শুধুমাত্র কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে তবে তাও কি আপনার মতানুযায়ী কনুই পর্যন্ত হাত ধৌতকারী ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের আমলের অনুরূপ আল্লাহর হুকুম পালন হিসাবে গণ্য হবে?"

উত্তরঃ এতো কেবল একটি মোটা ভুল। কুরআনের নির্দেশের খোলাখুলি বিরোধিতার নাম মতানৈক্য নয়। বরং মতানৈক্য এই জিনিসের নাম যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে এই কথা বিতর্কিত যে, শরীআতের হুকুম কি? এর সঠিক উদাহরণ, স্বয়ং কুরআন মজীদে বিদ্যমান। কুরআনের তাইয়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যেঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ -

"তা (মাটি) দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও উভয় হাত মাসেহ কর"–(সূরা মাইদাঃ ৭)।

এখন দেখুন, এক ব্যক্তি 'হাত' অর্থ 'কব্জি পর্যন্ত' মনে করে ততটুকু মাসেহ করে। অপর ব্যক্তি কনুই পর্যন্ত মনে করে ততখানি মাসেহ করে। তৃতীয় ব্যক্তি মনে করে যে, হাত বলতে তো গোটা বাহুই বুঝায়, তাই সে গোটা হাতই মাসেহ করে। বলুন, কুরআনের বাক্যে এই মতভেদের সুযোগ আছে কি না। পরন্তু এই মতবিরোধ কি পাপের কারণে পরিণত হয়?

হাদীস অস্বীকারকারীগণ যদি কিছুটা মাথা খাটাত তবে তারা স্বয়ং দেখতে পেত যে, সুন্নাত মতবিরোধের ক্ষেত্র অনেকটা সীমিত করে দিয়েছে। অন্যথায় সুন্নাতের অস্তিত্ব না থাকলে কুরআন মজীদ থেকে হুকুম–আহ্কাম বের করতে গিয়ে এতটা মতবিরোধ হয়ে যেত যে, দুইজন মুসলমানও একত্রিত হয়ে কোন সামগ্রিক আমল করতে পারত না। যেমন, কুরআন মজীদ বারবার নামাযের নির্দেশ দিচ্ছে। সুন্নাত যদি তার কাঠামো ও পন্থা নির্দিষ্ট করে না দিত তবে লোকেরা কখনও সিদ্ধান্তে পৌছতে পারত না যে, এই হুকুম কিভাবে পালন করা যায়। কুরআন মজীদ যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। সুন্নাত যদি এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করে না দিত তবে কখনো এ বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না যে, এই ফরজ কিভাবে সমাধা করা যেতে পারে। কুরআন মজীদের অন্যান্য হুকুম–আহ্কামের বেলায়ও এই একই অবস্থা যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন কর্তৃত্ব সম্পন্ন শিক্ষক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এসব নির্দেশ

পালনের কাঠামো বলে দিয়ে এবং কার্যত দেখিয়ে দিয়ে মতবিরোধের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। যদি এই জিনিস না হত এবং উম্মাত শুধুমাত্র কুরআন মজীদ তুলে নিয়ে অভিধানের সাহায্যে কোন জীবন ব্যবস্থা গঠন করতে চাইত তবে মৌলিক বিষয়েও এতটা মতৈক্য পাওয়া যেত না যার ভিত্তিতে কোন অভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হত। সুন্নাতের মাধ্যমেই সমস্ত সম্ভাব্য মতবিরোধ কুঞ্চিত হয়ে ইসলামী দুনিয়ায় আজ মাত্র আটটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, এবং তার মধ্যে বৃহৎ ফেরকা মাত্র পাঁচটি যার মধ্যে কোটি কোটি মুসলমান এক এক ফিকহের উপর সমবেত হয়েছে।[১] এভাবে সুসংগঠিত হওয়ার কারণেই তাদের একটি জীবন ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীরা সুন্নাতের বিরুদ্ধে যে খেলা খেলছে তাতে যদি তারা কৃতকার্য হয়ে যায় তবে তার ফল এই হবে না যে, কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সব একমত হয়ে যাবে। বরং তার ফল এই হবে যে, আজ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে সেগুলোতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

১৩. হাদীস অস্বীকারকারী ও খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের মধ্যে সাদৃশ্য

আপত্তিঃ আপনি বলছেন, "সুন্নাতের মূল পাঠে যদি এতটা মতভেদ থেকে থাকে তবে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায়ও অসংখ্য মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছেও। কুরআনের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ যদি আইনের ভিত্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয় তাহলে সুন্নাতের মূল পাঠের বিভিন্নতা এই ব্যাপারে কিভাবে প্রতিবন্ধক হতে পারে।" আপনার এই যুক্তি হুবহু কাদিয়ানীদের যুক্তির অনুরূপ। কাদিয়ানীদের যদি বলা হয় যে, গোলাম আহ্‌মাদ কাদিয়ানীর চরিত্র ও কার্যকলাপে অমুক দোষত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তাহলে তারা অবলিলায় বলে দেয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ (স)-এর অমুক কথা কি এরূপ ছিল না?

---

১. বর্তমান দুনিয়ায় কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ফেরকাগুলো দেখা যায়ঃ হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী, আহ্‌লে হাদীস, ইসনা আশারী (শীআ), যায়দী (শীআ) এবং খারিজীদের ইবাদিয়া ফিরকা। এদের মধ্যে যায়দী, আহলে হাদীস ও ইবাদীদের সংখ্যা খুবই কম। কতিপয় লোক অযথা ৭৩ ফেরকার মনগড়া কাহিনী বহুল পরিচিত করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা কেবল কিতাবেই পাওয়া যায়, জমীনের বুকে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

উত্তরঃ এই উপমা মৌলিকভাবেই ভ্রান্ত। কারণ মিথ্যুক দাজ্জাল নবী ও সত্যবাদী নবীর মধ্যে মূলতই কোন তুলনা হতে পারে না। সত্য নবী এবং তাঁর আনীত কিতাবের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রয়েছে, তদ্রূপ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক না মিথ্যুক দাজ্জাল নবী ও সত্য নবীর মধ্যে হতে পারে, আর না তার ও আল্লাহর কিতাবের মধ্যে হতে পারে।

ডকটর সাহেবের এই উদাহরণ স্বয়ং তার উপর এবং তার সম্প্রদায়ের উপর প্রযোজ্য হয়। কাদিয়ানীরা যেভাবে একজন জাল ও ভুয়া নবীর নবুওয়াত প্রমাণের জন্য রসূলুল্লাহ (স)-কে মাঝখানে টেনে আনে, অনুরূপভাবে হাদীস অস্বীকারকারীরাও রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত ও আল্লাহর কিতাবের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যবহার করছে। কাদিয়ানীরা যেভাবে গোটা উম্মাতের সম্মিলিত আকীদা "খতমে নবুওয়াত"-এর বিরুদ্ধে এক নতুন নবুওয়াতের ফেতনা দাঁড় করিয়েছে, অনুরূপভাবেই হাদীস অস্বীকারকারীরাও সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা চ্যালেঞ্জ করে দ্বিতীয় আরেকটি ভয়ংকর ফেতনা দাঁড় করিয়েছে। অথচ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মুসলমান প্রতিটি যুগে ঐক্যমত পোষণ করে আসছে যে, কুরআনের পরেই সুন্নাত হচ্ছে আইনের দ্বিতয়ী উৎস, এমনকি অমুসলিম আইনজ্ঞগণও ঐক্যবদ্ধভাবে একথা স্বীকার করেন। কাদিয়ানীরা যেভাবে খতমে নবুওয়াতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে এক নতুন নবী দাঁড় করিয়েছে, অনুরূপভাবে হাদীস অস্বীকারকারীরা সুন্নাতের অনুসরণের ভুল ব্যাখ্যা করে এই রাস্তা বের করেছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর গোটা হেদায়াত ও শিক্ষার দফতর গুটিয়ে রেখে দিতে হবে এবং "মিল্লাতের কোন কেন্দ্র"-কে প্রতি যুগে উম্মাতের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী বানাতে হবে। কাদিয়ানীরা তাদের মিথ্যা নবীর পথ পরিষ্কার করার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর সত্তার মধ্যে ত্রুটি নির্দেশ করে এবং হাদীস অস্বীকারকারীরা তাদের "মিল্লাতের কেন্দ্রের" জন্য পথ তৈরীর উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের সমালোচনা ও ত্রুটি নির্দেশ করে।

আমার যুক্তির উপর ডকটর সাহেব যে অভিযোগ উথাপন করেছেন তার জবাবে বলা যায় যে, তা বাস্তবিকই ভিত্তিহীন। আমার যুক্তি এই নয় যে, আপনি সুন্নাতের মধ্যে যে ত্রুটি নির্দেশ করেছেন তা কুরআন মজীদেও বর্তমান রয়েছে। পক্ষান্তরে আমার যুক্তি হলো, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়ার সুযোগ থাকাটা মূলতই কোন আইন-কানূনের জন্য ত্রুটি বা অপূর্ণতা নয়। অতএব এই সুযোগের ভিত্তিতে না কুরআনকে আইনের ভিত্তি বানানো অস্বীকার করা যেতে পারে, আর না সুন্নাতকে।

১৪. যে জিনিসের মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা নেই তা কি আইনের উৎস হতে পারে?

অভিযোগঃ "মূল পাঠ ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুটি স্বতন্ত্র জিনিস। কুরআন মজীদের মূল পাঠে কোন একটি অক্ষর সম্পর্কেও সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা যায় যে, তা মানুষের কাজ যা অপর কারো জন্য দীনের সনদ ও প্রমাণ হতে পারে না। পক্ষান্তরে হাদীসের ব্যাখ্যা সেরূপ নয়, তার মূল পাঠেই মতভেদ আছে। এই মতভেদের উপস্থিতিতে সুন্নাতকে ইসলামী আইনের উৎস কিভাবে বানানো যেতে পারে?"

উত্তরঃ আসল বিবেচনাযোগ্য প্রশ্ন তো এই যে, কিতাবের মূল পাঠে যদি মতৈক্য থাকে, কিন্তু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ হয় তবে তা আইনের ভিত্তি কিভাবে হতে পারে? স্বয়ং ডকটর সাহেব বলেন যে, "ব্যাখ্যা একটি মানবীয় কাজ যা অন্য কারো জন্য হুজ্জাত ও সনদ হতে পারে না।" এই অবস্থায় তো অপরিহার্যরূপে মূল পাঠ সনদ ও হুজ্জাত (দলীল-প্রমাণ) হতে পারে এবং অর্থের মধ্যে মতভেদ হয়ে যাওয়ার পর তার হুজ্জাত ও সনদ হিসাবে পরিগণিত হওয়াটা অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা বাস্তবে যে জিনিস কার্যকর হয় তা কিতাবের মূল পাঠ নয়, বরং তার সেই অর্থ যা কোন ব্যক্তি মূল পাঠ অধ্যয়নপূর্বক অনুধাবন করেন। তাই আমি আমার দ্বিতীয় পত্রে তার নিকট আরজ করেছিলাম, আপনি প্রথমে আপনার এই দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করুন যে, "আইনের ভিত্তি কেবল সেই জিনিসই হতে পারে যার মধ্যে মতভেদ হওয়া সম্ভব নয়।" অতপর এই কথা এভাবে মীমাংসা হতে পারে যে, কুরআন মজীদ স্বয়ং আইনের উৎস এবং তার বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে যে ব্যাখ্যাটি বিবেক-বুদ্ধির নিরপেক্ষ বিচারে অধিকতর বিশুদ্ধ তাই কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে এরূপ সিদ্ধান্তেও পৌঁছা যেতে পারে যে, স্বয়ং সুন্নাতকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে এবং যে কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সেই সুন্নাত কার্যকর হবে যা নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত সাব্যস্ত হবে। কুরআনের মূল পাঠকে আইনের ভিত্তি মেনে নেয়ার উপকারিতা এই হবে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যে মতভেদ দেখা দিবে তা কুরআনের মূল পাঠের সীমার মধ্যে আবর্তিত হবে। এ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। অনুরূপভাবে "সুন্নাত"-কে আইনের ভিত্তি হিসাবে মেনে নেয়ার উপকারিতা এই হবে যে, আমরা নিজেদের কার্যক্রমের জন্য সেই সব হেদায়াত ও শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারব, যা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আমরা যতক্ষণ না অনুসন্ধানের ভিত্তিতে জানতে পারব যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সুন্নাত প্রমাণিত নাই। এই সোজা কথাটা বুঝতে শেষপর্যন্ত কি অসুবিধা আছে?

১৫. কুরআন ও সুন্নাত উভয়ের বেলায় মতভেদ দূর করার পন্থা একই

অভিযোগঃ "কুরআনের মূল পাঠ থেকে বিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে তখনই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যখন দীন ইসলাম একটি সামাজিক সামগ্রিক জীবন বিধানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ দীনের সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েম ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে উম্মাতের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। আপনি কি বলতে পারেন যে, হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) অথবা হযরত উমার ফারূক (রা)-এর যুগে উম্মাতের সদস্যগণ কুরআনের কোন নির্দেশের উপর বিবিধ পন্থায় আমল করতেন? আবার সেই ব্যবস্থা কায়েম হলে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মতভেদ অবশিষ্ট থাকবে না। তা এই অবস্থায়ই সম্ভব ছিল যখন কুরআনের মূল পাঠ সুরক্ষিত অবস্থায় বহাল থাকে। কুরআনের মূল পাঠ যদি সুরক্ষিত না থাকত এবং বিভিন্ন ফিরকার নিকট হাদীসের অনুরূপ কুরআনেরও পৃথক পৃথক সংকলন থাকত, তাহলে উম্মাতের মধ্যে বাস্তব অখন্ডতার সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকত না, যতক্ষণ না আরেকজন রসূল আবির্ভূত হয়ে ওহীর মূল পাঠসমূহ সুরক্ষিতভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতেন।"

উত্তরঃ কোন বিষয় হৃদয়ংগম না করেই সে সম্পর্কে বক্তব্য পেশের এটা একটা চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার ফারূক (রা)-র যুগেও লোকেরা কুরআন মজীদের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতেন এবং তাদের মধ্যে তাৎপর্য অনুধাবন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ হত। কিন্তু সে সময় সৎপথপ্রাপ্ত খলীফা ও মজলিসে শূরার স্বাধীন সংস্থাও বর্তমান ছিল যার কর্তৃত্বও ছিল এবং তার জ্ঞান ও তাকওয়া সম্পর্কে উম্মাত আশ্বস্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে সার্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনার পর কুরআনিক বিধানের যেই ব্যাখ্যার অনুকূলে গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হত তা-ই আইন হিসাবে কার্যকর হয়ে যেত। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের ক্ষেত্রেও সে সময় যথারীতি অনুসন্ধান চালানো হত এবং যখন আশ্বস্ত হওয়া যেত যে, কোন বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স) এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন অথবা এভাবে কাজ করেছিলেন, তখন সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। আজও যদি এরূপ কোন সংস্থা বর্তমান থাকে তবে তাও কুরআনের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ঠিক ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করবে, একইভাবে তা হাদীসের ভান্ডারের মধ্য থেকে সর্বাধিক সহীহ হাদীস অনুসন্ধান করবে।

১৬. একটি চিত্তাকর্ষক ভ্রান্তি

অভিযোগঃ "আপনি বলছেন, বৃটেনের আইন লিখিত আকারে বিদ্যমান

নেই। তারপরও তাদের কাজকর্ম কিভাবে চলছে। আপনার কি জানা আছে যে, বৃটেনের আইনে নিত্য নতুন কত পরিবর্তন হচ্ছে? তাদের এখানকার সংসদের অধিকাংশ সদস্য যে কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করে নিতে পারে। আপনার দৃষ্টিতে দীন ইসলামের অবস্থাও কি তাই? দীন ইসলামের আইন লিখিত আকারে না থাকায় যদি কোন পার্থক্য সূচীত না হত তবে কুরআন মজীদকে কেন লিখিত রূপ দেয়া হল এবং এই লিখিত সংকলনের হেফাজতের দায়িত্বই বা আল্লাহ কেন গ্রহণ করলেন?"

উত্তরঃ এটা আরেকটি চিত্তাকর্ষক ভ্রান্তি। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তার লিখিত সংকলনের হেফাজতের দায়িত্ব নেননি, যা রসূলুল্লাহ (স) স্বীয় যুগে ওহী লেখক সাহাবীগণের সাহায্যে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কুরআন মজীদ তো আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিশ্চিত সুরক্ষিত আছে। কিন্তু মহানবী (স)–এর নির্দেশে লিখিত মূল পান্ডুলিপিও কি বর্তমান আছে? হাদীস অস্বীকারকারীদের জানামতে তা যদি কোথাও বর্তমান থেকে থাকে তবে অবশ্যই যেন তারা তার খোঁজ বলে দেয়। মজার ব্যাপার হলো, হাদীস অস্বীকারকারী সকলেই বারবার তাদের যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তি কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হওয়া এবং হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ না হওয়ার উপর স্থাপন করে থাকে। কিন্তু মহানবী (স) যে তাঁর যুগে ওহী লেখক সাহাবীগণের সাহায্যে প্রতিটি ওহী লিপিবদ্ধ করে নিতেন, এবং এই লিখিত দস্তাবেজ থেকে নকল করে হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র যুগে কুরআনকে একটি পুস্তকের রূপ দেয়া হয়, এবং পরবর্তী কালে হযরত উসমান (রা) তারই নকলকৃত কপিসমূহ ছড়িয়ে দেন, এসব কিছু কেবল হাদীসের রিওয়ায়াতসমূহের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পারে। কুরআনে এর কোন উল্লেখ নাই। হাদীসের বর্ণনা ব্যতীত এর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী দুনিয়ায় বর্তমান নেই। এখন হাদীসের বর্ণনাসমূহ যদি একেবারেই গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এরপর কোন্ জিনিসের মাধ্যমে আপনি দুনিয়াবাসীকে নিশ্চিত করবেন যে, কুরআন বাস্তবিকই মহানবী (স)–এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?

১৭. ব্যক্তিগত আইন ও জাতীয় আইনের মধ্যে বিভক্তি কেন?

অভিযোগঃ আপনি বলছেন, প্রমাণিত সুন্নাতসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য বহাল রেখে (পাকিস্তানে সঠিক ইসলামী আইন অনুযায়ী) আইন প্রণয়নের সমস্যাটির সমাধান এভাবে করা যায়ঃ

"ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) সীমা পর্যন্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

অন্য কুরআনিক বিধানের তাদের অনুসৃত ব্যাখ্যা ও প্রমাণিত সুন্নাতের সংকলন নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। আর জাতীয় আইনের (Public Law) ক্ষেত্রে তা কুরআনের সেই ব্যাখ্যা এবং প্রমাণিত সুন্নাত মোতাবেক হবে যার উপর অধিকাংশের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।”

আমি কি একথা জিজ্ঞেস করার দুসাহস দেখাতে পারি যে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় আইনের এই পার্থক্য মাহনবী (স) অথবা তাঁর সৎপথ প্রাপ্ত খলীফাদের আমলেও ছিল? আর এই পার্থক্যের সমর্থনে কুরআন মজীদ থেকে কোন যুক্তিপ্রমাণ পাওয়া যাবে কি?

উত্তরঃ এসব প্রশ্ন কেবলমাত্র এই কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, ডকটর সাহেব না ব্যক্তিগত আইন ও জাতীয় আইনের তাৎপর্য ও সীমারেখা অনুধাবন করতে পেরেছেন, আর না পাকিস্তানে আমরা যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন। ব্যক্তিগত আইন বলতে জগণের পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত আইন বুঝানো হয়েছে। যেমন বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার। আর জাতীয় আইন বলতে রাষ্ট্রীয় সাধারণ সংগঠন, প্রশাসন ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বুঝানো হয়েছে। যেমন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন। প্রথমোক্ত প্রকারের আইন সম্পর্কে বলা যায় যে, একই দেশে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্তমান থাকে তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অনুসৃত আইন স্বস্ব ক্ষেত্রে কার্যকর করা হবে। তাহলে তাদের পারিবারিক জীবন নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আইনের বেলায় পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে না। তা অবশ্যম্ভাবীরূপে সকলের জন্য একরূপ হওয়া উচিৎ।

কুরআন মজীদ নাযিলের যুগে মুসলমানরা তো একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে ইহূদী, খৃষ্টান এবং অগ্নি উপাসকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের ব্যক্তিগত আইন মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআন মজীদ তাদের জন্য জিয্য়া (যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য অমুসলিমদের দেয় কর) প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিল। তার অর্থ এই ছিল যে, তাদের ধর্ম এবং তাদের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অবশ্য ইসলামের জাতীয় আইন তাদের উপর মুসলমানদের মত সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব মহানবী (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সরকার এই নীতির অনুসরণ করে।

এখন পাকিস্তানে আমরা যে যুগে বেঁচে আছি তা কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ নয়, বরং তা থেকে চৌদ্দশত বছর পরের যুগ। গত শতাব্দীগুলোতে

মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উদ্ভব হয়েছে এবং কয়েক শত বছরে তার ভিত মজবুত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও মতভেদ আছে এবং সুন্নাতের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও। আমরা যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তাদের মাযহাব সংক্রান্ত এবং পারিবারিক ব্যাপারসমূহে তাদের অনুসৃত ফিক্‌হ অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে এবং শুধুমাত্র জাতীয় বিষয়সমূহে তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, তাহলে তারা ইসলামী মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু যদি "জাতির কেন্দ্রবিন্দু"তে সমাসীন কোন ব্যক্তি কুরআনের নাম নিয়ে তাদের নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত এবং পারিবারিক বিষয়সমূহে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে আর এই সমস্ত ফেরকার বিলুপ্তি ঘটাতে চায় তবে তা একটি মারাত্মক হত্যাকান্ড ছাড়া সম্ভব হবে না।

নিসন্দেহে এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক পরিবেশ হবে যে, মুসলমানগণ পুনরায় একই জামাআতের রূপ ধারণ করবে যেখানে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য যাবতীয় আইন-কানূন খোলাখুলি ও স্বাধীন আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তমূলক পরিবেশ না আগে ডান্ডার জোরে সৃষ্টি হয়েছিল, আর না বর্তমানে তা ডান্ডার জোরে সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৮. রসূলের মর্যাদা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকরী বক্তব্য থেকে পশ্চাদপসরণ

অভিযোগঃ "আপনি তরজমানুল কুরআন পত্রিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পৃষ্ঠা এই আলোচনায় নষ্ট করেছেন যে, মহানবী (স)-কে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান অথবা মুসলমানদের নেতা বা বিচারক কে বানিয়েছিল? আল্লাহ্ তাআলা না মুসলমানগণ নির্বাচনের মাধ্যমে? বুঝে আসে না যে, শেষ পর্যন্ত আপনার এই আলোচনার উদ্দেশ্য কি ছিল? রসূলুল্লাহ (স) কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। একটি শিশুও একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, এই রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সরকার প্রধান এবং মুসলমানদের পথপ্রদর্শক এবং যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, যার ফয়সালার বিরুদ্ধে কোথাও আপিল চলে না, তিনি রসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত আর কে হতে পারে?"

উত্তরঃ যে প্রশ্নটিকে একটি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন সাব্যস্ত করে তার মোকাবিলা করার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণ করা হচ্ছে তা মূলত এই আলোচনার একটি সিদ্ধান্তকরী প্রশ্ন ছিল। মহানবী (স) যদি আল্লাহ্ তাআলার নিযুক্ত

রাষ্ট্রনায়ক, বিচারক ও পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন তবে একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে, মহানবী (স)–এর সিদ্ধান্ত এবং তাঁর শিক্ষা ও পথনির্দেশ এবং তাঁর দেয়া বিধানসমূহ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল এবং এ কারণে তা অপরিহার্যরূপে ইসলামে সনদ ও হুজ্জাত (Authority) হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি মহানবী (স)–এর এসব জিনিসকে সনদ ও হুজ্জাত না মানে তবে তাকে দুটি কথার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি কথা বলতে হবে। হয় সে বলবে যে, মহানবী (স) স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক ও পথপ্রদর্শক বনে গিয়েছিলেন। অথবা সে বলবে যে, মুসলমানরা নিজেদের মর্জি অনুযায়ী তাঁকে এসব পদের জন্য নির্বাচন করেছিল এবং তারা মহানবী (স)–এর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাঁর পরিবর্তে অপর কাউকে নির্বাচন করার অধিকারী ছিল এবং তাঁকে অপসারণের অধিকারও তাদের ছিল।

হাদীস অস্বীকারকারীগণ প্রথমোক্ত কথা মানতে চায় না। কারণ মেনে নিলে তাদের মতবাদের শিকড় কেটে যায়। কিন্তু শেষোক্ত দুটি কথার কোন একটি কথা পরিষ্কার বলে দেয়ার মত সৎসাহসও তাদের নেই। কারণ তারা মুসলমানদের যে ধোঁকার জালে জড়াতে চায়, একথা বলার পর তাদের সেই জালের প্রতিটি সূতা ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই এসব লোক উক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার পরিবর্তে পলায়নে তৎপর হয়। পাঠকগণ এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে "জাতির কেন্দ্রবিন্দু" শীর্ষক আলোচনাটি পুনরায় দেখে নিন এবং তারপর দেখুন যে, আমার উথাপিত প্রশ্নাবলী পাশ কাটিয়ে গিয়ে কিভাবে পশ্চাদপসরণের পথ অবলম্বন করা হচ্ছে।

১৯. কোন অ—নবী কি নবীর যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে?

অভিযোগঃ কুরআন নাযিল হওয়াকালে পৃথিবীতে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি পৃথক বিভাগে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণ করা হত এবং রাজনৈতিক অথবা পার্থিব বিষয়ে সরকারের অনুসরণ করা হত। কুরআন মজীদ এই দ্বৈততার মূলোৎপাটন করেছে এবং মুসলমানদের বলেছে যে, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকই নন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেও তোমাদের পথপ্রদর্শক। এজন্য উল্লেখিত সব ব্যাপারেই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। রসূলুল্লাহ (স)–এর পর এই সকল পদে (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ওহী প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া অন্যান্য পদ্য) মহানবী (স)–এর স্থলাভিষিক্ত (খলীফাতুর রসূল) ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার অর্থ এমন একটি ব্যবস্থার আনুগত্য করা যা

"খিলাফাত আলা মিনহাজিন-নুবূওয়াহ" (নবুওয়াতের পন্থায় খিলাফত পরিচালন ব্যবস্থা) পরিভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। তাকেই আমি "জাতির কেন্দ্রবিন্দু" পরিভাষায় ব্যক্ত করেছিলাম-যা নিয়ে আপনি বিদ্রূপ করছেন।

উত্তরঃ এই দাবীর অনুকূলে কি প্রমাণ আছে যে, ওহীর বাহক হওয়া ব্যতীত ইসলামী ব্যবস্থায় মহানবী (স)-এর যতগুলো পদমর্যাদা ছিল তার সবগুলোই তাঁর পরে খলীফা অথবা "জাতির কেন্দ্রবিন্দুর" নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে? কুরআন মজীদের কোথাও কি একথা বলা হয়েছে? অথবা রসূলুল্লাহ (স) কি এরূপ কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন? অথবা খুলাফায়ে রাশেদীন কি কখনও এই দাবী করেছেন যে, তাঁরা এই পদমর্যাদার অধিকারী? অথবা রিসালাতের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মাতের আলেমগণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কি এ মত পোষণ করেছেন? কুরআন মজীদ যা কিছু বলে তা আমি এই গ্রন্থের "রসূলুল্লাহ (স) শিক্ষক ও মুরব্বি হিসাবে" শীর্ষক অনুচ্ছেদ থেকে "রসূল (স) বিচারক ও রাষ্ট্রপ্রধান" শীর্ষক অনুচ্ছেদের আওতায় উল্লেখ করে এসেছি। এরা মহানবী (স)-এর কোন হাদীসই মানে না, অন্যথায় আমি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য সনদসূত্রে বর্ণিত মহানবী (স)-এর প্রচুর হাদীস পেশ করতাম যার সাহায্যে এই দাবী চূড়ান্তভাবে বর্জিত হয়ে যেত। খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে হাদীস অস্বীকারকারীদের দাবী হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের উক্ত পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত মনে করতেন। কিন্তু আমি এই গ্রন্থের "খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি অপবাদ" শীর্ষক অনুচ্ছেদে হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা), উমার ফারূক (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) প্রমুখ খলীফাগণের নিজস্ব বক্তব্য হুবহু পেশ করেছি যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ প্রমাণিত হয় না। এখন তারা অন্তত বলে দিক, গত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কখনও কোন আলেমে দীন কি একথা বলেছেন?

২০. ইসলামী ব্যবস্থায় 'আমীর' এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের "জাতির কেন্দ্রবিন্দু"-র মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

অভিযোগঃ এই যে আমি বলেছি, "আল্লাহ এবং রসূল" বলতে "ইসলামী ব্যবস্থা" বুঝায়-তা আমার মনগড়া কথা নয়। এই অপরাধে আপনিও অপরাধী। আপনি আপনার তাফহীমুল কুরআন শীর্ষক তাফসীরে সূরা মাইদার ৩৩ নং আয়াতঃ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ ....

-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার অর্থ সেই সুষ্ঠু ও কল্যাণকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যা ইসলামের রাষ্ট্রীয় সংগঠন দেশের মধ্যে কায়েম করে রেখেছে। এরূপ ব্যবস্থা যখন পৃথিবীর বুকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা ধ্বংস করার চেষ্টা মূলত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"–(১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৫)।

উত্তরঃ এখানে আবারো আমার সামনে আমারই বক্তব্য ছিন্নভিন্ন করে পেশ করার দুঃসাহস দেখানো হয়েছে। মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"এরূপ ব্যবস্থা যখন পৃথিবীর বুকে কায়েম হয়ে যায় তখন তা ধ্বংসের চেষ্টা করা, চাই তা ক্ষুদ্রাকারে নরহত্যা, লুটতরাজ, ছিনতাই ও চুরি–ডাকাতির সীমা পর্যন্তই হোক অথবা বৃহদাকারে এই সুষ্ঠ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তার পরিবর্তে বিপর্যয়কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হোক, মূলত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। এর দৃষ্টান্ত এই যে, ভারতীয় দন্ডবিধিতে ভারতে বৃটিশ সরকারের উৎখাত প্রচেষ্টায় জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরাধে (Waging War against the king) অপরাধী গণ্য করা হত। চাই তার তৎপরতা দেশের অভ্যন্তরভাগে দূর–দূরাঞ্চলে অবস্থিত একজন সাধারণ সৈনিকের বিরুদ্ধেই হোক না কেন এবং সম্রাট তার হস্তক্ষেপ থেকে যত দূরেই হোক না কেন।"

এখন একজন সাধারণ বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বয়ং দেখতে পারে যে, সম্রাটের প্রতিনিধিত্বকারী সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ গণ্য করা এবং স্বয়ং সিপাহীকে সম্রাট গণ্য করার মধ্যে কত বড় পার্থক্য বিদ্যমান! ঠিক অনুরূপ বিরাট পার্থক্য রয়েছে নিম্নোক্ত দুটি কথার মধ্যেঃ এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে তৎপরতা সাব্যস্ত করে এবং অপর ব্যক্তি দাবী করে যে, এই সরকারই স্বয়ং আল্লাহ এবং রসূল।

আপনি এই দুটি কথার পরিণতি সম্পর্কে যতক্ষণ সামান্য চিন্তাভাবনা না করছেন ততক্ষণ এই পার্থক্যের সুক্ষ্মতা ও নাজুকতা পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করতে পারবেন না। মনে করুন, ইসলামী সরকার কখনও একটি ভুল নির্দেশ দিয়ে বসল যা কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী। এ অবস্থায় আমার ব্যাখ্যা অনুযায়ী তো মুসলিম জনসাধারণ উঠে একথা বলার অধিকার রাখে যে, "আপনি আপনার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিন। কারণ আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন পাকে একথা বলেছেন। রসূলুল্লাহ্ (স)–এর সুন্নাত থেকে একথা প্রমাণিত। আর আপনি তা থেকে বিচ্যুত হয়ে এ নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব আপনি এব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূলের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেননি।”

হাদীস অস্বীকারকারীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বয়ং ইসলামী সরকার আল্লাহ এবং রসূল। অতএব মুসলমানগণ তাদের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে উপরোক্ত যুক্তিপ্রমাণ পেশের অধিকার রাখে না। সে যখনই এরূপ যুক্তি পেশ করবে তৎক্ষণাত সরকার একথা বলে তার মুখ বন্ধ করে দেবে যে, আমরাই তো স্বয়ং আল্লাহ এবং রসূল, আমরা যা কিছু বলব এবং করব তাই কুরআন এবং সুন্নাত।

হাদীস অস্বীকারকারীরা দাবী করে যে, কুরআনের যে যে স্থানে "আল্লাহ এবং রসূল" শব্দ এসেছে সেখানে তার অর্থ ইসলামী সরকার। আমি পাঠকদের নিকট আবেদন করব, তারা যেন কুরআন মজীদ একটু খুলে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো বের করে দেখে নেন, যেখানে আল্লাহ এবং রসূল শব্দদ্বয় একসাথে এসেছে সেখানে উক্ত শব্দদ্বয়ের সরকার অর্থ গ্রহণের পরিণতি কি দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াত কয়টি দেখা যেতে পারে।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ -

"হে নবী! তাদের বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। অতপর তারা যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না”–(সূরা আল–ইমরানঃ ৩২)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -

"হে লোকসকল যারা ঈমান এনেছ–(সর্বান্তকরণে) ঈমান আন আল্লাহ ও রসূলের উপর”–(সূরা নিসাঃ ১৩৬)।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

"প্রকৃত মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান এনেছে অতপর কখনো সন্দেহে পতিত হয়নি”–(হুজুরাতঃ ১৫)।

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا -

"আর যারা আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান আনেনি তবে এ ধরনের কাফেরদের জন্য আমরা জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি”–(ফাত্হঃ ১৩)।

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا - خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا - يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ

يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۔

"নিশ্চিত আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন–যার মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে। তারা সেদিন কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনে উলোট–পালট করা হবে। তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম"–(আহ্যাবঃ ৬৪–৬৬)।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ

"তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে"–(তওবাঃ ৫৪)।

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔

"হে নবী! তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে"–(তওবাঃ ৮০)।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۔

"আর তাদের মধ্যে যে কেউ মারা যাক তুমি তার জানাযা কখনও পড়বে না, আর না তার কবরের নিকট দন্ডায়মান হবে। কারণ তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে নাফরমানী করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায় মারা গেছে"–(তওবাঃ ৮৪)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ ۔

"হে লোকসকল যারা ঈমান এনেছ–আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কাজ বিনষ্ট কর না"–(মুহাম্মাদঃ ৩৩)।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۔

"আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন অপেক্ষমান। তারা তার মধ্যে অনন্তকাল থাকবে"–(জিনঃ ২৩)।

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهُ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا فِيْهَا۔

"তারা কি জানে না যে, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন অপেক্ষমান? তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে"–(তওবাঃ ৬৩)।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ۔

"আল্লাহ এবং তার রসূল এর অধিক হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে–যদি তারা মুমিন হয়"–(তওবাঃ ৬২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো যে ব্যক্তিই মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে–ই জানতে পারবে যে, আল্লাহ ও রসূলের অর্থ যদি কোথাও 'সরকার' হয়ে যায় তাহলে দীন ইসলামের কাঠামো বিকৃত হয়ে যাবে এবং এমন এক নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার কায়েম হবে যার সামনে ফেরাউন, চেংগীয, হিটলার, মুসোলিনি ও স্টালিনের স্বৈরাচার নগণ্য মনে হবে। এর অর্থ তো এই যে, সরকারই মুসলমানদের দীন ও ঈমান। তা মান্যকারী মুসলমান থাকবে এবং অমান্যকারী কাফের হয়ে যাবে। এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী পৃথিবীতেই শুধু জেলে যাবে না, বরং আখেরাতেও চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার সাথে মতবিরোধ করলে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই সরকারকে সন্তুষ্ট করা ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত হবে এবং যে ব্যক্তি তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে তার নামায, রোযা, যাকাত এবং সমস্ত সৎ আমল নস্যাত হয়ে যাবে। তার জানাযা পড়াও মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে না এবং তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনাও করা যাবে না। বিশেষ কোনো স্বৈরাচারের এই ধরনের সরকারের সাথে কোনো তুলনা হয় কি?

অতপর এদিকটি সম্পর্কেও কিছুটা চিন্তা করুন যে, উমাইয়্যা রাজবংশের পর থেকে আজ পর্যন্ত গোটা ইসলামী দুনিয়া কখনও এক দিনের জন্যেও একই সরকারের আওতায় একত্র হয়নি এবং আজও মুসলিম দেশসমূহে অনেকগুলো সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এখন কি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, সৌদী আরব, মিসর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া ও মরক্কো প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক "আল্লাহ ও রসূল" হবে? অথবা কোন এক রাষ্ট্রের "আল্লাহ ও রসূল" কি জোরপূর্বক নিজের একনায়কত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেবে? অথবা গোটা ইসলামী দুনিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এক "আল্লাহ ও রসূল" নির্বাচন না

করা পর্যন্ত কি ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অকেজো ও পরিত্যক্ত থাকবে?

২১. রিসালাতের যুগে পারস্পরিক পরামর্শের কি সীমারেখা ছিল?

অভিযোগঃ "রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতিটি নির্দেশ যদি ওহীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে আবার কেন তাঁকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? আপনি আলোচ্য পত্রালাপের অধীনে এ প্রসংগে লিখেছেন, মহানবী (স) শুধুমাত্র কার্যপ্রণালী নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আপনি এর পূর্বে লিখেছিলেন যে, মহানবী (স) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তা সবই ওহীর ভিত্তিতে ছিল এবং এখন আপনি "কার্যপ্রণালী"-কে এর বাইরে রেখেছেন।"

উত্তরঃ যেসব ব্যাপারেই আল্লাহ্ তাআলা ওহী মাতলূ অথবা ওহী গায়র মাতলূ দ্বারা মহানবী (স)-কে পথনির্দেশ না দিতেন সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার সাহায্যে মহানবী (স) বুঝে নিতেন যে, এই বিষয়টি মানবীয় সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর এই জাতীয় ব্যাপারেই মহানবী (স) তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। মহানবী (স)-এর মাধ্যমে লোকদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ইসলামী পন্থার প্রশিক্ষণদানই ছিল এর উদ্দেশ্য। মুসলমানদের এভাবে প্রশিক্ষণদানও ছিল স্বয়ং রিসালাতের দায়িত্বের একটি অংশ।

২২. আযানের পদ্ধতি কি পরামর্শের ভিত্তিতে না ইলহামের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল?

অভিযোগঃ আপনি লিখেছেন, "আপনি কি এমন কোন উদাহরণ পেশ করতে পারেন যে, রিসালাতের যুগে কুরআন মজীদের কোন অংশের ব্যাখ্যা পরামর্শের ভিত্তিতে করা হয়েছিল? অথবা কোন আইন পরামর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল? অনেকগুলো নয়, মাত্র একটি উদাহরণ আপনি পেশ করুন।" এর একটি উদাহরণ আমরা মিশকাত শরীফে পাই। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে নামাযের জন্য ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু স্বয়ং এই ডাকার পন্থা নির্দিষ্ট করেননি। মহানবী (স) সাহাবাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এর পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং নিজের মতের বিপরীত করেছেন। কারণ তিনি ইতিপূর্বে শিংগা ফুঁকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলুন, আযান দীন ইসলামের বিধানের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের এমন কোন আয়াতের বরাত দেয়া যেতে পারে কি যার মধ্যে নামাযের জন্য আওয়াজ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? কুরআন মজীদে

তো নামাযের জন্য ডাকার উল্লেখ মাত্র দুটি আয়াতে এসেছে। সূরা মাইদার ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তারা (আহলে কিতাব ও কাফেররা) এটাকে উপহাস ও কৌতুকের বস্তুরূপে গ্রহণ করে।" আর সূরা জুমুআর ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও।" এই দুটি আয়াতেই নামাযের জন্য ডাকার উল্লেখ একটি প্রচলিত ব্যবস্থা হিসাবে উধৃত করা হয়েছে। আমরা তো কুরআনের কোথাও এমন কোন আয়াত পাচ্ছি না যেখানে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযের জন্য আযান দাও।

মিশকাত শরীফের যে বরাত দেয়া হয়েছে তা থেকে বুঝা যাচ্ছে, মিশকাত শরীফ পাঠ করে তা দেয়া হয়নি, বরং শুনা কথা এখানে তুলে দেয়া হয়েছে। মিশকাত শরীফে 'নামায' শীর্ষক অধ্যায়ের 'আযান' শীর্ষক অনুচ্ছেদ খুলে দেখুন। সেখানে যেসব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, মদীনা তাইয়্যেবায় রীতিমত জামাআতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম প্রথম আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ আসেনি যে, নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে একত্র করা যেতে পারে। মহানবী (স) সাহাবাদের সমবেত করে পরামর্শ করেন। কতেক লোক বলেন যে, আগুন জ্বালানো যেতে পারে। এর ধোঁয়া উর্ধগামী হতে দেখে লোকেরা জানতে পারবে যে, নামাযের জামাআত শুরু হতে যাচ্ছে। কতেক লোক শিংগা ফুঁকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অপর কতিপয় লোক বলেন যে, প্রথমোক্তটি ইহূদীদের এবং শেষোক্তটি খৃষ্টানদের পন্থা, এখন এ ব্যাপারে কোন শেষ সিদ্ধান্ত হয়নি এবং আরো চিন্তাভাবনা চলছিল। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি শিংগা নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! এই শিংগা বিক্রি করবে কি? সে জিজ্ঞেস করল, এদিয়ে তুমি কি করবে? তিনি বললেন, নামাযের জন্য লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি এর চেয়েও উত্তম পন্থা তোমাদের বলে দিচ্ছি। অতএব স্বপ্নের মধ্যে আগন্তুক ব্যক্তি তাঁকে আযানের শব্দসমষ্টি শিখিয়ে দিল।

ভোর হলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। মহানবী (স) বলেন, এটা সঠিক স্বপ্ন, উঠে দাঁড়াও এবং বিলালকে একটি একটি করে বাক্য বলে দাও, সে উচ্চস্বরে তা ঘোষণা করবে। আযানের উচ্চ আওয়াজ শুনতে পেয়ে হযরত উমার ফারূক (রা) দৌড়ে এসে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আজ আমিও এই স্বপ্ন দেখেছি। মহানবী (স) বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এ হল মিশকাত শরীফের

আযান শীর্ষক অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ। এ থেকে যা কিছু প্রতিভাত হয় তা এই যে, নামাযের জন্য আযানের পদ্ধতি পরামর্শের ভিত্তিতে নয়, বরং ইলহামের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল। স্বপ্নের আকারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রা) ও হযরত উমার (রা)–র উপর এই ইলহাম হয়েছিল।

কিন্তু মিশকাত শরীফ ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে যেসব রিওয়ায়াত এসেছে সেগুলো একত্র করলে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ যেদিন স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের নির্দেশনা লাভ করেন ঠিক সেদিন মহানবী (স)–এর নিকটও ওহীর সাহায্যে এই হুকুম এসে গিয়েছিল। ফাতহুল বারী গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার (রহ) এসব হাদীস একত্র করেছেন।

২৩. মহানবী (স)—এর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ দলীল কি না?

অভিযোগঃ "আপনার দাবী অনুযায়ী মহানবী (স)–এর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ওহী ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। কিন্তু আপনি স্বয়ং স্বীকার করছেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত ওহী ভিত্তিক হত না। অতএব আপনি তাফহীমূল কুরআনের প্রথম খন্ডের ১৪৭ নং পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (স) বলেনঃ

"অবশ্যই আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসবে এবং তোমাদের মধ্যে এক পক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় অধিক বাকচতুর এবং তাদের যুক্তিপ্রমাণ শুনে আমি তাদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত দেব। কিন্তু জেনে রাখ! যদি এভাবে নিজের ভাইয়ের কোন স্বত্ব থেকে কোন জিনিস তোমরা আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ করে থাক তবে মূলত তোমরা দোযখের একটি টুকরা লাভ করলে।"

মহানবী (স)–এর সিদ্ধান্তসমূহে এই সম্ভাব্য ভুল ছিল, যে সম্পর্কে কুরআন মজীদ মহানবী (স)–এর জবানীতে বলিয়েছিল যেঃ "যদি আমি ভুল করে বসি তবে তা আমার নিজের কারণেই। আর যদি আমি সোজা পথে থাকি তবে তা ওহীর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে" (সূরা সাবার ৫০ নং আয়াত দ্র.)।[১]

উত্তরঃ এটাও সুস্থ বুদ্ধির অভাবের আর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তির আইনগত বিষয় সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান রয়েছে সেও জানে যে, প্রতিটি মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের মধ্যে দুটি ভিন্ন জিনিস থাকে। এক, মোকদ্দমার তথ্যাবলী (Facts of the case), যা সাক্ষ্য প্রমাণ ও আনুষংগিক বিষয়াদির ভিত্তিতে

১. সূরা সাবার এই আয়াত থেকে ডঃ সাহেব পুনরায় ভুল প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে তাকে এই সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে ("মহানবী (স)–এর ইজতিহাদী পদস্খলন থেকে ভুল যুক্তি গ্রহণ" শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্র.)।

উদঘাটিত হয়। দুই, এই তথ্যাবলীর উপর আইনের প্রয়োগ। অর্থাৎ মোকদ্দমার বিবরণ থেকে যে তথ্যাবলী উদঘাটিত হয় তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার আইনগত নির্দেশ কি হওয়া উচিৎ তা স্থির করা। মহানবী (স) এ হাদীসে যা কিছু বলেছেন তার অর্থ এই নয় যে, মোকদ্দমার তথ্যাবলীর উপর আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি ভুল করতে পারেন, বরং তাঁর বাণীর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তোমরা ভুল বিবরণ প্রদান করে বাস্তবতার বিপরীত মোকদ্দমার তথ্যাবলী প্রমাণ করলে আমি তার উপর আইনের প্রয়োগ করব এবং আল্লাহর দরবারে এর দায়দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে। কারণ বিচারকের কাজ হচ্ছে, বাদী-বিবাদীর বিবরণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণে তার সামনে যে তথ্য উদঘাটিত হবে তার ভিত্তিতে রায় প্রদান। বাইরের কোন মাধ্যমে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেও তার ভিত্তিতে তিনি রায় দিতে পারেন না। বরং ইনসাফের নীতিমালার আলোকে তাকে মামলার বিবরণীর উপরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। অতএব ভুল বিবরণের ভিত্তিতে যে ফয়সালা হবে তা বিচারকের ভুল নয়, বরং যে পক্ষ বাস্তব ঘটনার বিপরীত তথ্য প্রমাণ করে নিজের অনুকূলে সিদ্ধান্ত লাভ করেছে, এ ভুলের জন্য সেই দায়ী। এ থেকে সেই কথা কোথায় বের হয়ে এলো যা ডকটর সাহেব বের করতে চাচ্ছেন? শেষ পর্যন্ত এ দাবী কে করেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে মহানবী (স)-কে ওহীর মাধ্যমে মামলার প্রকৃত বিবরণ বলে দিতেন? আসল দাবী তো এই যে, মহানবী (স) আইনের ব্যাখ্যা এবং বাস্তব তথ্যের উপর তা প্রয়োগ করতে ভুলের শিকার হন না। কারণ তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োজিত বিচারক ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত আলোকবর্তিকা এই কাজে তাঁর পথ প্রদর্শন করত এবং এ কারণে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ সনদ ও দলীল হিসাবে গণ্য। এই দাবীর পরিপন্থী কোন প্রমাণ কারো কাছে বর্তমান থাকলে সে তা পেশ করুক।

উপরে যে হাদীস থেকে ডকটর সাহেব দলীল গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে কোথাও বলা হয়নি যে, "আমি সিদ্ধান্ত প্রদানে ভুল করতে পারি।" আইন বিজ্ঞানেও একথা পূর্ণরূপে সর্বজন স্বীকৃত যে, আদালতের সামনে যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের জোরে বাস্তব ঘটনার বিপরীত বিবরণ সত্য প্রমাণিত করে এবং বিচারক তা মেনে নিয়ে ঠিক আইন অনুযায়ী রায় প্রদান করেন তবে সেই রায় স্বয়ং ভুল নয়। কিন্তু ডকটর সাহেব এটাকে রায়ের ভুল সাব্যস্ত করছেন।

২৪. বক্র বিতর্কের একটি বিস্ময়কর নমুনা

অভিযোগঃ আপনি বললেনঃ নবী (স)-এর মাত্র কয়েকটি পদস্খলন

হয়েছিল। অর্থাৎ আপনার ধারণা এই যে, মহানবী (স)–এর যদি অধিক পদস্খলন হত তবে তা আপত্তিকর ব্যাপার হত, কিন্তু কয়েকটি মাত্র পদস্খলন আপত্তিকর নয়।

উত্তরঃ কি মনোরম নির্যাস আমার লেখা থেকে নির্গত করে স্বয়ং আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। যে বক্তব্যের এই নির্যাস নির্গত করা হয়েছে তা হুবহু নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

"আপনি দ্বিতীয় যে আয়াত পেশ করেছেন তা থেকে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মহানবী (স) তাঁর ফয়সালাসমূহে অনেক ভুলভ্রান্তি করেছেন যার মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নমুনা হিসাবে এই দুই–চারটি ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলে দেন যাতে লোকেরা সাবধান হয়ে যায়। অথচ তা থেকে মূলত সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রকাশ পায়। তা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (স)–এর গোটা নবূওয়াতী জীবনে শুধুমাত্র ঐ কয়েকটি পদস্খলন হয়েছিল, যা আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে সংশোধন করে দেন। এখন আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাঁর থেকে প্রমাণিত সমস্ত সুন্নাতের উপর আমল করতে পারি। কারণ তার মধ্যে যদি আরো কোন পদস্খলন থাকত তবে আল্লাহ তাআলা তাও টিকে থাকতে দিতেন না, যেভাবে এই পদস্খলনগুলোকে তিনি টিকে থাকতে দেননি।"

উপরোক্ত বক্তব্যের নির্যাস এরূপ নির্গত করা হয়েছেঃ "মহানবী (স)–এর অধিক পরিমাণ পদস্খলন হলে তা আপত্তিকর ছিল, কিন্তু কয়েকটি মাত্র পদস্খলন আপত্তিকর নয়।" যেসব লোকের বিতর্কের ঢং এরূপ তাদের সম্পর্কে লোকেরা কি করে সুধারণা পোষণ করতে পারে যে, তারা সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বক্তব্য হৃদয়ংগম করার জন্য বাক্যালাপ করছে।

অভিযোগঃ নবী (স)–এর প্রতিটি কথাই যদি ওহী ভিত্তিক হত তাহলে তাঁর একটি বারের পদস্খলনও দীন ইসলামের গোটা ব্যবস্থা বিশৃংখল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এজন্য যে, তা কোন মানুষের ভুল ছিল না, বরং (মাআযাল্লাহ) ওহীর ভ্রান্তি, স্বয়ং আল্লাহ্‌র ভ্রান্তি। আর আল্লাহ যদি (মাআযাল্লাহ) ভুল করতে পারেন তবে এই ধরনের খোদার উপর ঈমান আনার কি অর্থ হতে পারে?"

উত্তরঃ এটা একটা ভ্রান্তি ছাড়া আর কি? একথা কে বলেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে ওহীর মাধ্যমে ভুল পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন, সে কারণে মহানবী (স)–এর পদস্খলন হয়েছিল? মূল কথা যা হঠকারিতা ছাড়াই সহজে হৃদয়ংগম করা যায় তা হলো, মহানবী (স)–এর একটি বারের পদস্খলন

যেহেতু দীন ইসলামের গোটা ব্যবস্থা উলটপালট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, তাই আল্লাহ তাআলা এই কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন যে, নবূওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি নিজে মহানবী (স)–এর পথনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এবং কখনও মানবিক দাবীতে তাঁর পদস্খলন হয়ে গেলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে দেবেন, যাতে দীন ইসলামের মধ্যে কোন ত্রুটি অবশিষ্ট থাকতে না পারে।

২৫. মহানবী (স)— এর ব্যক্তিগত মত এবং ওহীর ভিত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল

অভিযোগঃ আপনি বলেছেন যে, নবী (স) তাঁর পুরা নবূওয়াতী জীবনে যা কিছু করেছেন অথবা বলেছেন তা ওহীর ভিত্তিতেই ছিল। কিন্তু দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে আপনার বক্তব্য এই যেঃ

"এসব বিষয় সম্পর্কে যে বিভিন্ন কথা মহানবী (স)–এর হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে তা মূলত তাঁর অনুমান ভিত্তিক কথা, যে সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দেহের মধ্যে ছিলেন"–(রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫)।

আর এর পরপরই আপনি নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, "মহানবী (স)–এর এই উৎকণ্ঠাই এ কথা প্রকাশ করছে যে, এসব কথা তিনি ওহীলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেননি, বরং নিজের ধারণা–অনুমানের ভিত্তিতে বলেছিলেন"–(ঐ, পৃ. ৫৬)।

উত্তরঃ আমার যে বাক্যসমূহের এখানে আশ্রয় লওয়া হচ্ছে তা নকল করার ব্যাপারে পুনরায় একই ভেল্কিবাজির নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করা হয়েছে। পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্থান থেকে একটি বাক্য আবার অন্য অংশ থেকে একটি বাক্য নকল করে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়েছে। আমি এখানে মূলত যে কথা বলেছি তা হলো, দাজ্জাল সম্পর্কে মহানবী (স)–কে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তা কেবলমাত্র এতটুকু ছিল যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তার এই এই বৈশিষ্ট্য থাকবে। এসব কথা মহানবী (স) সংবাদ হিসেবে বলেছিলেন। কিন্তু সে কখন এবং কোথায় আত্মপ্রকাশ করবে এ সম্পর্কে মহানবী (স)–কে ওহীর সাহায্যে কোন জ্ঞান দান করা হয়নি। তাই এসব বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন তা খবরের ভংগিতে নয়, বরং কিয়াস ও অনুমানের ভিত্তিতে বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ইবনে সাইয়্যাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, সম্ভবত সে–ই কথিত দাজ্জাল হয়ে থাকবে।

কিন্তু হযরত উমার (রা) তাকে হত্যা করতে চাইলে মহানবী (স) বলেনঃ যদি সে দাজ্জাল হয়ে থাকে তবে তার হত্যাকারী তুমি নও। আর সে যদি দাজ্জাল না হয়ে থাকে তবে একজন যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-কে হত্যা করার অধিকার তোমার নেই। অপর হাদীসে আছেঃ "আমার জীবদ্দশায়ই যদি দাজ্জালের আগমন ঘটে তবে আমি যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে তার মোকাবিলা করব, অন্যথায় আমার পরে আমার প্রতিপালক তো প্রত্যেক মুমিনের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আছেনই।"

এই ছিলো আমার বক্তব্য। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান মহানবী (স) এক ভংগীতে প্রকাশ করতেন এবং যেসব বিষয়ের জ্ঞান তাঁকে ওহীর মাধ্যমে দেয়া হত না তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভংগীতে বর্ণনা করতেন। তাঁর প্রকাশভংগীই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলতো। কিন্তু যেখানে সাহাবীগণ সহজে এই পার্থক্য হৃদয়ংগম করতে পারতেন না সেখানে তাঁরা স্বয়ং তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন যে, একথা তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতানুযায়ী বলেছেন, না আল্লাহ তাআলার নির্দেশে বলেছেন? এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আমি তাফহীমাত গ্রন্থের ১ম খন্ডের "স্বাধীনতার ইসলামী ধারণা" শীর্ষক প্রবন্ধে পেশ করেছি।

২৬. সাহাবীগণ কি একথার প্রবক্তা ছিলেন যে, মহানবী (স)—এর সিদ্ধান্তসমূহ পরিবর্তন করা যেতে পারে?

অভিযোগঃ "আমি লিখেছিলাম, এমন কিছু সিদ্ধান্ত ছিল যা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু নবী (স)-এ পর অবস্থার পরিবর্তনের দাবী অনুযায়ী খুলাফায়ে রাশেদীন এসব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন করেন। আপনি বলেছেন যে, এটা সেই মহান ব্যক্তিত্বগণের প্রতি চরম অপবাদ। এর প্রমাণস্বরূপ আপনি তাদের কোন কথা বা কার্যক্রমও পেশ করতে পারেননি। আপনি এখন জেনে আশ্চর্য হবেন, এ সম্পর্কে স্বয়ং আপনি এক পৃষ্ঠা সামনে অগ্রসর হয়ে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনযোগ্য মনে করতেন। দেখুন, আপনি কি লিখেছেনঃ

"কার জানা নাই যে, হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর উসামা (রা)-র নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী অভিযানে প্রেরণের জন্য কেবলমাত্র এজন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, মহানবী (স) স্বয়ং তাঁর জীবদ্দশায় যে কাজের ফয়সালা করেছেন তিনি নিজেকে তার পরিবর্তনের

অধিকারী মনে করেন না। সাহাবায়ে কেরাম (রা) যখন আরবের সর্বত্র একটি ভয়াবহ তুফান উত্থিত হওয়ার আশংকার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং এই অবস্থায় সিরিয়ার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ অনুপযোগী সাব্যস্ত করলেন তখন হযরত আবু বাক্‌র (রা) উত্তর দেন, যদি কুকুর অথবা নেকড়ে বাঘ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবুও আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কৃত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারব না"-(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬০ খৃ., পৃ.

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু বাক্‌র (রা) ব্যতীত অবশিষ্ট সকল সাহাবী অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নবী (স)-এর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন বৈধ মনে করতেন। আপনি আরও লিখেছেনঃ

"হযরত উমার (রা) তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন, অন্তত উসামাকে এই সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব থেকে বরখাস্ত করা হোক। কারণ অনেক প্রবীণ সাহাবী এই যুবক ছেলের অধীনে থাকতে আগ্রহী নন। তখন হযরত আবু বাক্‌র (রা) তাঁর দাড়ি ধরে বলেন, খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক এবং তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে নিয়োগ করেছেন, আর তুমি বলছ যে, আমি তাকে বরখাস্ত করি"-(ঐ)।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার (রা) অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নবী (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্তন সাধন বৈধ মনে করতেন। বরং এ ঘটনায় তো অবস্থার পরিবর্তনেরও প্রশ্ন ছিল না। হযরত উমার (রা) তা এজন্য পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর প্রতি সাহাবীগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। আপনার কি মত যে, [এক হযরত আবু বাক্‌র (রা) ব্যতীত] সাহাবীদের মধ্যে কেউই একথা বুঝতেন না যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সিদ্ধান্ত কোন অবস্থায়ই পরিবর্তন করা যেতে পারে না?

উত্তরঃ এটাই একথার একটি উদাহরণ যে, হাদীস অস্বীকারকারীগণ প্রতিটি বাক্যের মধ্যে শুধু নিজেদের মতলব অনুসন্ধান করে বেড়ায়। উপরে হযরত আবু বাক্‌র (র)-র যে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা পুনরায় পাঠ করে দেখুন। তার মধ্যে একথার কি কোথাও উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বাক্‌র (রা) যখন মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন তখন হযরত উমার (রা) অথবা সাহাবীদের মধ্যে কেউ একথা বলেছিলেন যে, "হে হুযুর, জাতির কেন্দ্রবিন্দু! আপনি শরীআত আনুযায়ী নবী (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহ মানতে বাধ্য নন, বরং তা পরিবর্তন করে দেয়ার পূর্ণ কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে। যদি আপনার নিজস্ব রায় এই হয়ে থাকে যে, এসময়

উসামার বাহিনীর চলে যাওয়া উচিৎ এবং উসামা (রা)–ই এর অধিনায়ক থাকবেন, তবে ভিন্ন কথা। আপনি তদনুযায়ী কাজ করুন। কারণ আপনি হচ্ছেন "আল্লাহ ও রসূল"। কিন্তু এই প্রমাণ পেশ করবেন না যে, এটা রসূলুল্লাহ (স)–এর সিদ্ধান্ত, তাই তা পরিবর্তন করা যাবে না। মহানবী (স) তাঁর যুগের জাতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, আর আপনি আপনার যুগের জাতির কেন্দ্রবিন্দু। আজ আপনার কর্তৃত্ব তাই যা গত কাল মহানবী (স)–এর ছিল।"

এ কথা যদি হযরত উমার (রা) অথবা অপরাপর সাহাবীগণ বলে থাকতেন তবে নিসন্দেহে হাদীস অস্বীকারকারীরা নিজেদের পক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে যেতো। কিন্তু পক্ষান্তরে সেখানে ঘটনা এই হয়েছিল যে, হযরত আবু বাক্‌র (রা) যখন মহানবী (স)–এর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করলেন তখন হযরত উমার (রা) সহ সকল সাহাবী আনুগত্যের মাথা অবনত করে দিলেন। উসামা বাহিনী রওনা হল, উসামা (রা)–ই এর অধিনায়ক থাকলেন এবং অনেক প্রবীণ সাহাবী তাঁর নেতৃত্বে সন্তুষ্ট চিত্তে ও আনন্দিত মনে রওনা হলেন। অধিকন্তু এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স)–এর পরে কতিপয় লোকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহে প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন আনয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ সময় দীনের জ্ঞানে যিনি সবচেয়ে পরিপক্ক ছিলেন তাঁর সতর্ক করার সাথে সাথে সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেন।

এই কর্মপন্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, শুধুমাত্র নিজদের বক্তব্য সাব্যস্ত করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের এই প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় তো নেয়া হচ্ছে যার প্রকাশ কেবল আলোচনাকালে ঘটেছিল, কিন্তু আলোচনাশেষে সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী যে ইজমা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নীতি তো এই যে, আলোচনা শেষে সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেই সিদ্ধান্তই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে, আলোচনা চলাকালে যেসব মত ব্যক্ত হয়ে থাকে তা নয়।

২৭. তিন তালাকের ব্যাপারে হযরত উমার (রা)–র ফয়সালার স্বরূপ

অভিযোগঃ "আপনি বলেছেন, আমি যেন কোন দৃষ্টান্ত পেশ করি যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগের কোন সিদ্ধান্ত খুলাফায়ে রাশেদীন পরিবর্তন করেছেন, এটা তো আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, নবী (স)–এর যুগে এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করে তাকে রিজঈ

(প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক সাব্যস্ত করা হত। হযরত উমার (রা) তাঁর শাসনামলে এটাকে তিন তালাক গণ্য করে মুগাল্লাযা তালাক সাব্যস্ত করেন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোকে উম্মাত আজ পর্যন্ত এর উপরই আমল করে আসছে।

উত্তরঃ এ প্রসংগে সঠিক অবস্থা হলো, মহানবী (স)–এর যুগেও (একত্রে প্রদত্ত) তিন তালাককে তিন তালাকই মনে করা হত এবং বিভিন্ন স্থানে মহানবী (স) তাকে তিন তালাকই গণ্য করে ফয়সালা দিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তিনবার তালাক শব্দটি পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করত তার পক্ষ থেকে যদি এই ওজর পেশ করা হত যে, তার এক তালাকেরই নিয়াত ছিল এবং অবশিষ্ট দুইবার সে কেবল নিশ্চিত করার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছে তবে তার ওজর মহানবী (স) অনুমোদন করতেন।

হযরত উমার ফারূক (রা) তাঁর যুগে যা কিছু করেছেন তা শুধু এই যে, লোকেরা যখন ব্যাপকভাবে তিন তালাক দিয়ে এক তালাকের নিয়াতের ওজর পেশ করতে থাকে তখন তিনি বলেন, এখন এই তালাকের ব্যাপারটি খেলায় পরিণত হতে যাচ্ছে, তাই আমি এই ওজর কবুল করব না এবং তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করব। এটাকে সাহাবীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাবিঈগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণও এই সিদ্ধান্তের উপর একমত থাকেন। তাদের মধ্যে কেউই একথা বলেননি যে, হযরত উমার (রা) রিসালাত যুগের আইনের কোন পরিবর্তন করেছেন। কারণ নিয়াতের ওজর কবুল করাটা আইন নয়, বরং যে ব্যক্তি নিজের নিয়াতের কথা বলছে সে বিচারকের রায় অনুযায়ী সত্যবাদী কিনা তার উপর ওজর কবুল করার ব্যাপারটি নির্ভরশীল। মহানবী (স)–এর যুগে মদীনার খুব স্বল্প সংখ্যক সাধারণ লোক এ ধরনের ওজর পেশ করেছিল। তাই মহানবী (স) তাদের সত্যবাদী মনে করে তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেন। হযরত উমার (রা)–র যুগে ইরান থেকে মিসর পর্যন্ত এবং ইয়ামেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তারিত রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তির এই ওজর আদালতে অপরিহার্যরূপে সমর্থনযোগ্য হতে পারত না। বিশেষত যখন বহু লোক একত্রে তিন তালাক দিয়ে এক তালাকের নিয়াতের দাবী করা শুরু করে দিয়ে থাকবে।

২৮. "মুআল্লাফাতুল কুলূব" সম্পর্কে হযরত উমার (রা)—র যুক্তির ধরন—প্রকৃতি

অভিযোগঃ "রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে মুআল্লাফাতুল–কুলূব (নও–মুসলিম, অথবা যে অমুসলিমের দৃষ্টি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য)–এর

জন্য যাকাতের খাত থেকে সাহায্য দেয়া হত। হযরত উমার (রা) তাঁর শাসনামলে এই সাহায্য বন্ধ করে দেন।"

উত্তরঃ এটাকে যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্তের মধ্যে রদবদলের দৃষ্টান্ত মনে করে তবে তার এই দাবী করা উচিৎ যে, শুধু মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্তই নয়, বরং আল্লাহ্‌র নিজের ফয়সালাসমূহের মধ্যেও 'জাতির কেন্দ্রবিন্দু' সাহেব রদবদল করতে পারে। কারণ যাকাতে মুআল্লাফাতুল-কুলূবের অংশ মহানবী (স) কোন হাদীসের মাধ্যমে নির্ধারণ করেননি, বরং আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কুরআন মজীদে তা নির্ধারণ করেছেন (দ্র. সূরা তওবা, ৬০ নং আয়াত)। নিমজ্জিত হওয়ার সময় খড়কুটার উপর ভর করার মত অবস্থা যদি হাদীছ অস্বীকারকারীদের না হয়ে থাকে এবং তারা যদি বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে চায়, তবে স্বয়ং "মুআল্লাফাতুল কুলূব" শব্দের উপর সামান্য চিন্তা করে তা বুঝতে পারে। পরিভাষাটি নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করছে যে, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদেরকে যাকাতের খাত থেকে টাকাপয়সা দেয়া যেতে পারে। হযরত উমার (রা)-র যুক্তি এই ছিল যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুআল্লাফাতুল কুলূবের জন্য সম্পদ ব্যয় করা ইসলামী সরকারের প্রয়োজন ছিল। এজন্য মহানবী (স) এই খাত থেকে লোকদের দান করতেন। এখন আমাদের রাষ্ট্র এতটা শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে যে, উল্লেখিত উদ্দেশ্যে কারো পেছনে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন আমাদের নেই। অতএব আমরা এই খাতে কোন অর্থ ব্যয় করব না।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে কি এই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে, হযরত উমার (রা) মহানবী (স)-এর যুগের কোন ফয়সালার পরিবর্তন করেছেন? বাস্তবিকই কি মহানবী (স)-এর এমন কোন সিদ্ধান্ত ছিল যে, মন জয়ের প্রয়োজন হোক বা না হোক মোটকথা কিছু লোককে অবশ্যই মুআল্লাফাতুল-কুলূব সাব্যস্ত করা হবে এবং যাকাত থেকে তাদের জন্য সব সময় তাদের অংশ বের করতে হবে? স্বয়ং কুরআন মজীদে কি আল্লাহ্ তাআলাও এটা বাধ্যতামূলক করেছেন যে, যাকাতের সম্পদের একটি অংশ মুআল্লাফাতুল-কুলূব খাতে সর্বাবস্থায় অবশ্যই খরচ করতে হবে?

২৯. বিজিত এলাকা সম্পর্কে হযরত উমার (রা)—র সিদ্ধান্ত কি মহানবী (স)— এর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী ছিল?

অভিযোগঃ "নবী (স)-এর যুগে বিজিত এলাকা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। কিন্তু হযরত উমার (রা) তাঁর যুগে এই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন।"

উত্তরঃ মহানবী (স) কখনও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি যে, বিজিত এলাকা সবসময় সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। তিনি যদি এরূপ কোন ফয়সালা দিয়ে থাকতেন এবং হযরত উমার (রা) তার বিপরীত কাজ করে থাকতেন তবে আপনি বলতে পারতেন যে, তিনি মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। অথবা মহানবী (স) তাঁর সময়ে মুজাহিদদের মধ্যে যেসব জমি বন্টন করে দিয়েছিলেন হযরত উমার (রা) যদি তা তাদের নিকট থেকে ফেরত নিয়ে থাকতেন তবে এই অবস্থায় উপরোক্ত দাবী করা যেত। কিন্তু এই দুই অবস্থার কোনটিই ঘটেনি। আসল ব্যাপার এই যে, বিজিত এলাকা মুজাহিদগণের মধ্যে অপরিহার্যরূপে বন্টন করে দেয়াটা মূলতই কোন ইসলামী আইন ছিল না। বিজিত ভূখন্ড সম্পর্কে মহানবী (স) প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ ফয়সালা দান করেছিলেন। বানূ নাদীর, বানূ কুরায়যা, খায়বার, ফাদাক, ওয়াদিল-কুরা, মক্কা ও তায়েফের বিজিত ভূখন্ডসমূহের প্রতিটির বন্দবস্ত নববী যুগে পৃথক পৃথক পন্থায় দেয়া হয়েছিল এবং এমন কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি যে, ভবিষ্যতে এসব জমির বন্দবস্ত অপরিহার্যরূপে অমুক পন্থায় দেয়া হবে। তাই হযরত উমার (রা) নিজের যুগে সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে বিজিত জমির যেরূপ বন্দবস্তের ব্যবস্থা করেন তাকে মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্তের মধ্যে রদবদলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা যেতে পারে না।

৩০. বেতন—ভাতা বন্টনের ব্যাপারে হযরত উমার (রা)—র সিদ্ধান্ত

অভিযোগঃ রসূলুল্লাহ (স) লোকদের একই সমান বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতেন। কিন্তু হযরত উমার (রা) তা সেবার পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারণ করে মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এটি এবং এরূপ আরও কয়েকিট দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করেন। এটি এবং এরূপ আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মহানবী (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহে সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছিল।

উত্তরঃ মহানবী (স) যে সকল কর্মচারীকে একই সমান বেতন-ভাতা দিতেন, একথার কি প্রমাণ আছে? ইতিহাসের আলোকে তো দেখা যায়, এটা হযরত আবু বাক্‌র (রা)-র কাজ ছিল। তাই এটাকে যদি কোন জিনিসের উদাহরণ সাব্যস্ত করা যায় তবে তা এই যে, একজন খলীফা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফার সিদ্ধান্তসমূহে সংশোধনী আনয়নের অধিকার রাখেন।

আমার আরজ এই যে, হাদীস অস্বীকারকারীগণ সম্মিলিতভাবে এই ধরনের দৃষ্টান্তসমূহের একটি পূর্ণাংগ তালিকা প্রণয়ন করে পেশ করুন। আমি ইনশাআল্লাহ প্রমাণ করব যে, তার মধ্যে একটি উদাহরণও খিলাফাতে রাশেদার যুগে মহানবী (স)–এর সিদ্ধান্তসমূহ রদবদল করার দৃষ্টান্ত নয়।

৩১. কুরআন মজীদের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ কি তৎকালীন যুগের জন্য ছিল?

অভিযোগঃ "আপনি আমার একথা নিয়েও বিদ্রূপ করছেন যে, কুরআনের যেসব বিধান কোন শর্তের অধীনে কার্যকর হয় তা শর্তের অনুপস্থিতিতে মুলতবী থাকবে, যতক্ষণ না পুনশ্চ অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এগুলোকে সমসাময়িক যুগের বিধান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাকাতের খাত থেকে "মুআল্লাফাতুল–কুলূব"দের সাহায্য প্রদানের নির্দেশ কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত উমার (রা) এই খাতকে এই বলে বন্ধ করে দেন যে, রাষ্ট্রের যতক্ষণ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এই হুকুম কার্যকর ছিল। এখন সেই প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকেনি। তাই এই নির্দেশের উপর আমল করার প্রয়োজনও নেই। যেসব লোক কুরআনের এজাতীয় বিধানকে "সমসাময়িক কালের বিধান" বলে তাদের উদ্দেশ্যও তাই।"

উত্তরঃ এই নৈপুণ্যতায় মূলত উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। হাদীস অস্বীকারকারীগণ ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছে। তারা এর নামকরণ করেছে "কুরআনের প্রতিপালন ব্যবস্থা।" এ সম্পর্কে যখন তাদের বলা হয় যে, কুরআন মজীদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যত বিধিবিধান এসেছে, সরাসরি অথবা আকারে–ইংগীতে, তা সবই ব্যক্তিগত মালিকানার প্রমাণ করে এবং আমরা কোন একটি বিধানও এমন পাচ্ছি না যা ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করার উপর ভিত্তিশীল অথবা তা উচ্ছেদ করার লক্ষ্য ব্যক্ত করে। তখন তারা উত্তর দেয় যে, এসব বিধান ছিল সমসাময়িক কালের জন্য। অন্য কথায় যখনই এই কালটি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং এসব লোকের মনগড়া "খোদায়ী প্রতিপালন ব্যবস্থা" কায়েম হবে তখন উক্ত বিধানসমূহ রহিত হয়ে যাবে। জনাব পারভেজ সাহেব পরিষ্কার বাক্যে বলেছেনঃ

"(প্রশ্ন করা হয়ে থাকে), কুরআনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি এই প্রকৃতির হয়ে থাকে, তবে এরপরও তা যাকাত, দান–খয়রাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বিধিবিধান কেন দিল? এর কারণ এই যে, কুরআন এই

ব্যবস্থাকে একই সাথে নিয়ে আসতে চায় না, ক্রমান্বয়ে কায়েম করতে চায়। অতএব যাকাত, দান-খয়রাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানসমূহ সেই সমসাময়িক কালের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল যেখানে তখনও এই ব্যবস্থা তার সর্বশেষ কাঠামোতে কায়েম হয়নি (দ্র. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত প্রবন্ধ 'ইসলামী ব্যবস্থায় অর্থনীতি'))।

কিন্তু এসব লোক কুরআনের কোথাও দেখাতে সক্ষম হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের এই মনগড়া "খোদায়ী ব্যবস্থা"-র বিধান দিয়েছেন এবং একথা বলেছেন যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো এই "খোদায়ী ব্যবস্থা"-র প্রতিষ্ঠা, অবশ্য এই ব্যবস্থা যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণের জন্য আমরা যাকাত, দান-খয়রাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দান করেছি। এই সব কিছুই তাদের স্বকপোলকল্পিত এবং এর পরিবর্তে তারা কুরআনের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিধিবিধানসমূহকে সাময়িক কালের বিধান মনে করে তা উড়িয়ে দিতে চায়। হযরত উমার (রা) মুআলাফাতুল-কুলূব সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তার সাথে শেষ পর্যন্ত এদের উপরোক্ত বিষয়ের কি সম্পর্ক আছে? এর উদ্দেশ্য তো এই ছিল যে, মন জয়ের জন্য যতদিন তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল ততদিন আমরা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এখন এখাতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নাই, তাই এখন আমরা তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেব না। এটা সম্পূর্ণত কুরআন মজীদে ফকীর-মিসকীনদেরকে যাকাত দেয়ার যে হুকুম দেয়া হয়েছে তদ্রূপ। এই হুকুম অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যতক্ষণ ফকীর বা মিসকীন থাকবে ততক্ষণ আমরা তাকে যাকাত দেব। তার এই অবস্থার পরিবর্তন হলে আমরা তাকে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেব। এ কথার সাথে পারভেয সাহেবের "সমসাময়িক কাল"-এর মতবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।

৩২. "সমসাময়িক কালের" ভুল ব্যাখ্যা

অভিযোগঃ "পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত যে শরীআতের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও মূলতবী রাখা যায়, আপনি নিজেও একথা স্বীকার করেন। যেমন পাকিস্তানের আইন সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, "একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় অমুসলিমদের অংশগ্রহণ শরীআত ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয় দিক থেকেই সঠিক নয়। কিন্তু একটি সাময়িক বন্দবস্ত হিসাবে আমরা জায়েয ও যুক্তিসংগত মনে করি যে, দেশের গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব দেয়া যেতে পারে" (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৪৩০-১)।

উত্তরঃ এ বিষয়টিও হাদীস অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভংগী ও মতবাদ থেকে

সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অমুসলিমদের সম্পর্কে তো আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, ইসলাম তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্বে তাদের শরীক করে না। তাই এই পলিসি কার্যকর করা আমাদের দায়িত্ব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা কার্যকর করতে সক্ষম হব না ততক্ষণ আমরা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করব তা একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে করব। পক্ষান্তরে হাদীস অস্বীকারকারীগণ স্বয়ং একটি "খোদায়ী ব্যবস্থা" রচনা করে, যে সম্পর্কে কুরআনের একটি প্রামাণ্য হুকুমও তারা দেখাতে পারবে না এবং ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণের পক্ষে যে পরিষ্কার ও চূড়ান্ত বিধান কুরআন মজীদে রয়েছে তাকে তারা সাময়িক কালের বিধান মনে করে। এ দুটি কথার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

আমাদের মতে "সাময়িক কালের" সংজ্ঞা এই যে, কুরআন মজীদের কোন বিধান অথবা কুরআন প্রদত্ত কোন পন্থা বা মূলনীতি অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে যদি কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকে তবে তা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে আমরা যা কিছুই করব, তা হবে সাময়িক কালের ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে হাদীস অস্বীকারকারীদের মতে তাদের নিজস্ব মনগড়া নীতিমালার উপর আমল করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হবে ততক্ষণ তারা কুরআন প্রদত্ত বিধিবিধান ও নীতিমালার উপর কেবলমাত্র একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আমল করবে।

৩৩. মহানবী (স) কি শুধুমাত্র কুরআনের ভাষ্যকার না আইন প্রণেতাও?

অভিযোগঃ "এই প্রশ্নটিও সামনে এসেছিল যে, সুন্নাত কি শুধুমাত্র কুরআনিক বিধান ও নীতিমালার ভাষ্য না কি তা কুরআনিক বিধানের তালিকা বর্ধিতও করে? সঠিক কথা এই যে, কুরআন যেসব বিষয়ে মৌল নির্দেশ দিয়েছে, সুন্নাত তার আনুষংগিক বিষয় নির্ধারণ করে। এটা নয় যে, কুরআন কিছু বিধান প্রবর্তন করল এবং সেই তালিকায় সুন্নাত আরো কিছু বিধান যোগ করল। অবস্থা যদি তাই হত তবে কুরআনিক বিধান যে তালিকা দিয়েছে তা অসম্পূর্ণ ছিল এবং সুন্নাত অতিরিক্ত কিছু যোগ করে তালিকার পূর্ণতা সাধন করে দিয়েছে। কিন্তু আপনি যেখানে এক স্থানে প্রথম অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেখানে অন্যত্র দ্বিতীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। অথচ এই দুটি কথা পরস্পর বিরোধী।

আপনি সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের নিকটও জিজ্ঞেস করে দেখুন (আপনার বক্তব্য অনুযায়ী) রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীঃ "ফুফু-ভাইঝি এবং

খালা–ভাগ্নীকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম", তা কি কুরআনিক বিধান (অর্থাৎ দুই বোন একত্রে বিবাহ করা হারাম)–এর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ না মুহরিমাতের কুরআন প্রদত্ত তালিকায় সংযোজন? প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি (তবে শর্ত হচ্ছে সে যদি আপনার মত একগুয়ে না হয় অথবা নির্বোধের মত আচরণ না করে) বলবে যে, তা কুরআনিক তালিকায় সংযোজন। এই আলোচনা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যেখানে কুরআনিক তালিকায় ফুফু, খালা, বোনঝি, দুধমাতা, দুধবোন, স্ত্রীর মা (শাশুড়ি), পুত্রদের স্ত্রীগণ এমনকি পালিত কন্যাদের পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন এবং এও বলে দিয়েছেন যে, দুই বোন একত্রে বিবাহ করা যাবে না, সেখানে কি আল্লাহ্ তাআলা একথাটুকু বলতে পারলেন না (মাআযাল্লাহ্) যে, ফুফু–ভাইঝি ও খালা–বোনঝিকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না?"

উত্তরঃ উপরোক্ত গোটা আলোচনার জবাব এই যে, রসূলুল্লাহ (স) কুরআনের ভাষ্যকারও ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিয়োগকৃত আইনপ্রণেতাও। তাঁর এই দায়িত্বও ছিল যে, (মানব জাতির জন্য নাযিলকৃত আল্লাহ্র বিধানের তিনি ব্যাখ্যা করে দেবেন) এবং এই দায়িত্ব ছিল যে–
(তিনি লোকদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল করেন এবং নাপাক জিনিসসমূহ তাদের জন্য হারাম করেন)। অতএব মহানবী (স) যেরূপ কুরআনিক বিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দলীল হিসাবে গণ্য, তেমনিভাবে তিনি আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রদত্ত বিধান দলীল হিসাবে গণ্য। এই দুটি কথার মধ্যে চূড়ান্তভাবেই কোন বিরোধ নেই।

এখন থাকল ফুফু ও খালার প্রসংগ। হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি বক্র বিতর্কের রোগে আক্রান্ত না হত তবে সহজেই তাদের বুঝে একথা আসতে পারত যে, কুরআন মজীদ যখন কোন মহিলাকে তার বোনের সাথে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছে তখন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুই বোনের মধ্যে যে সহজাত ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে এবং থাকা উচিৎ, তার হেফাজত করা। মহানবী (স) বলেছেন যে, এই একই কারণ পিতার বোন এবং মায়ের বোনের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। অতএব ফুফু ও ভাইঝি এবং খালা ও বোনঝিকে একত্রে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা চাই কুরআনের ব্যাখ্যাই হোক, অথবা কুরআন থেকে নির্গত বিধান (ইসতিম্বাত) হোক অথবা রসূল প্রদত্ত বিধানই হোক মোটকথা আল্লাহ্র রসূলের হুকুম এবং ইসলামের সূচনা থেকে

আজ পর্যন্ত গোটা উম্মাত ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে বিধান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। খারিজীদের একটি উপদল ব্যতীত কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেনি। আর ঐ উপদলটির যুক্তিও ঠিক তাই ছিল যা আজ হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা পেশ করে থাকে যে, এই হুকুম যেহেতু কুরআন মজীদে নাই, অতএব আমরা তা মানব না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ডকটর সাহেব এই প্রসংগে উত্থাপন করেছেন তা সবই স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প ধীশক্তির ফল। শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে এও একটি যে, কোন একটি বিষয়ে যে জিনিসটি মূল নির্দেশের উদ্দেশ্য (ইল্লাত) সেই একই উদ্দেশ্য যদি অন্য বিষয়েও পাওয়া যায় তবে তার উপরও একই হুকুম বলবৎ হবে। উদাহরণস্বরূপ কুরআন মজীদে শুধুমাত্র শরাবপান হারাম করা হয়েছিল। মহানবী (স) বলেন যে, এ প্রসংগে নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য নেশাগ্রস্ত হওয়া, তাই যে কোন নেশাউদ্রেককারী জিনিস হারাম। এখন কেবলমাত্র স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন নির্বোধ ব্যক্তিই এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য যদি তাই ছিল তবে তিনি কি কুরআন মজীদে ভাং, চরস, তাড়ি ইত্যাদি সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের একটি তালিকা দিতে পারতেন না?

৩৪. রসূলুল্লাহ (স)—এর অন্তরদৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ার তাৎপর্য

অভিযোগঃ "গোটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই প্রশ্ন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যে ওহী নাযিল হত তার সবটাই কি কুরআন মজীদে সংকলিত হয়েছে, নাকি কুরআনে ওহীর একটি অংশ প্রবেশ করেছে এবং অপর অংশ সন্নিবেশিত হয়নি? এক্ষেত্রে আপনার উত্তর হলো, ওহীর দুইটি (বরং কয়েকটি) বিভাগ ছিল। তার মধ্যে কেবলমাত্র এক প্রকারের ওহী কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে, অবশিষ্ট প্রকারের ওহীগুলো কুরআনে সন্নিবেশিত হয়নি। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনি তাফহীমাত গ্রন্থের ১ম খন্ডে লিখেছেনঃ

"এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআনই হচ্ছে মৌলিক বিধান। কিন্তু এই বিধান আমাদের নিকট কোন মাধ্যম ব্যতীত পাঠানো হয়নি, বরং রসূলে খোদা (স)-এর মধ্যস্থতায় প্রেরণ করা হয়েছে। আর রসূলুল্লাহ্ (স)-কে এজন্য মাধ্যম বানানো হয়েছে যে, তিনি মৌলিক বিধানগুলো নিজের ও নিজের উম্মাতের জীবনে বাস্তবায়ন করে একটি নমুনা পেশ করবেন এবং নিজের খোদা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আমাদের জন্য সেই পন্থা নির্ধারণ করে দেবেন যেভাবে এই

মৌলিক বিধানগুলো আমাদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আচার–ব্যবহারে কার্যকর করা উচিত" (পৃ. ২৩৭)।[১]

ওহীর বৈশিষ্ট্য এবং যেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলা হয় তা এই যে, যার নিকট এই ওহী প্রেরণ করা হয় তার অন্তরদৃষ্টির কোন দখল এর মধ্যে থাকে না। যে 'ওহীর' আলোকে রসূলুল্লাহ (স) কুরআনের মৌল বিধান কার্যকর করার পন্থা নির্ধারণ করেছিলেন তাও যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হত তবে তার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)–এর অন্তরদৃষ্টির কোন হস্তক্ষেপ হতে পারত না। আর নবী (স) যদি নিজের অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে তা নির্ধারণ করতেন তবে তা ওহী হত না। রসূলের অন্তরদৃষ্টি যতই উচ্চ ও উন্নত হোক না কেন তা আল্লাহর ওহী হতে পারে না।

সম্ভবত আপনি বলবেন যে, আমি "খোদা প্রদত্ত অন্তরদৃষ্টি" বলেছি। আর মানবীয় অন্তরদৃষ্টি ও খোদা প্রদত্ত অন্তরদৃষ্টির মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আপনার জবাব যদি তাই হয় তবে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আপনি যে দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছেন তা কি আল্লাহ প্রদত্ত নাকি অপর কেউ দান করেছে? প্রত্যেক মানবীয় অন্তরদৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্তই হয়ে থাকে।"

উত্তরঃ এখানে ডকটর সাহেব 'ওহী' শব্দের অর্থ অনুধাবনে পুনরায় একই ভুল করেছেন, যে সম্পর্কে আমি আমার সর্বশেষ চিঠিতে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম (দ্র. "ওহী বলতে কি বুঝায়" শীর্ষক অনুচ্ছেদ)। হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের অতুলনীয় গুণাবলীর মধ্যে এও একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য যে, আপনি যদি তাদের একটি ভ্রান্তি যুক্তির মাধ্যমে দশবারও ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেন তারপরও তারা নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে এবং আপনার কথার প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।

---

১. এর পরের বাক্যাংশ যা ডকটর সাহেব বর্জন করেছেন তা এই যে, "অতএব কুরআনের আলোকে সঠিক পদ্ধতি হলোঃ প্রথমে আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক বিধানসমূহ, অতপর আল্লাহ্‌র রসূল প্রদত্ত পন্থা, অতপর উভয়টির আলোকে আমাদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ইজতিহাদ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকদেরও" (সূরা নিসাঃ ৫৯)।

"আল্লাহ প্রদত্ত দূরদৃষ্টি বা অন্তরদৃষ্টি" দ্বারা আমি কোন জন্মগত গুণ বুঝাতে চাইনি, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্মগত ভাবে কোন না কোন গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। বরং নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (স)-কে নবুওয়াতের সাথে সাথে যে অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন, এখানে তাই বুঝানো হয়েছে, যার ভিত্তিতে তিনি কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের গভীর পর্যন্ত পৌছে যেতেনে যে পর্যন্ত কোন অ-নবীর পক্ষে পৌছা সম্ভব ছিল না এবং যার আলোকে তিনি নিজে ইসলামের সঠিক পথে চলতেন আর অন্যদের জন্যও পথের দিশা বলে দিতেন। এই অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি নবুওয়াতের অপরিহার্য উপাদান ছিল, যা কিতাবের সাথে সাথে মহানবী (স)-কে দান করা হয়েছিল, যাতে তিনি কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে দিতে পারেন এবং জীবনের আচার-আচরণে লোকদের পথ প্রদর্শনও করতে পারেন। এই অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাথে শেষ পর্যন্ত অ-নবীদের দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টির কি তুলনা হতে পারে?

অ-নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দূরদৃষ্টিই প্রাপ্ত হোক-চাই তা আইনগত দূরদৃষ্টিই হোক, অথবা চিকিৎসা বিষয়ক দূরদৃষ্টি হোক, অথবা কারিগরি ও প্রকৌশলগত অথবা অন্য কোন বিষয়ের উপর দূরদৃষ্টি হোক-তা স্বীয় বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো থেকে, সেই পরিপূর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বোধশক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক-যা নবীকে নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য দান করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের জিনিসটি যতই উচ্চ ও উন্নত পর্যায়েরই হোক, তা অবশ্যই কোন নিশ্চিত জ্ঞানমাধ্যম (Source) নয়। কারণ এই দূরদৃষ্টির সাহায্যে একজন অ-নবী যে সিদ্ধান্তে পৌছে তৎসম্পর্কে সে চূড়ান্তভাবে জানে না যে, এই সিদ্ধান্ত কি আল্লাহর পথনির্দেশে প্রাপ্ত হচ্ছে না নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে। পক্ষান্তরে নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব যেরূপ নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস, এই দ্বিতীয় জিনিসটি ঠিক তদ্রূপ নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস। কারণ একজন নবী পূর্ণ সচেতনতার সাথে জানতে পারেন যে, এই পথপ্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে।

কিন্তু হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের নবীর সত্তার সাথে যে চরম শত্রুতা রয়েছে তার কারণে নবীর প্রতিটি মহত্ব ও মর্যাদাকে তারা পদদলিত করছে। তারা প্রাণান্তকর চেষ্টার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, নবী ও সাধারণ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি তাঁর কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থেকেও থাকে তবে তা এতটুকু যে, আল্লাহ তাআলা নিজের ডাক বান্দাদের পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য তাকে রানার ডাক হরকরা নিযুক্ত করেছিলেন।

৩৫. কুরআনের আলোকে ওহীর শ্রেণীবিভাগ

অভিযোগঃ "আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ প্রমাণের জন্য সূরা আশ-শূরার ৫১ নং আয়াত পেশ করেছেন। তার অনুবাদ আপনি এভাবে করেছেনঃ

کسی بشر کے لئے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے مگر وحی کے طریقے پر یا پردے کے پیچھے سے یا اس طرح کہ کوئی پیغامبر بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہتا ہو- وہ برتر اور حکیم ہے-

"কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা এভাবে যে, একজন দূত প্রেরণ করবেন এবং সে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ওহী করবে যা কিছু আল্লাহ্ চান। তিনি মহান ও প্রজ্ঞাময়।"

প্রথমত, আপনি (কুরআনের উপর আমার দূরদৃষ্টি অনুযায়ী) এই আয়াতের শেষাংশের অর্থই বুঝেননি। আমি এ আয়াত থেকে এই বুঝেছি যে, এখানে আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র নবী-রসূলগণের সাথে বাক্যালাপের পন্থাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছেন না, বরং এখানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তাঁর বাক্যালাপের পন্থা কি। প্রকাশ থাকে যে, মানুষ দুই প্রকারের। এক, নবী-রসূলগণ এবং দুই, অ-নবী মানুষ। অত্র আয়াতের প্রথম দুই অংশে আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে বাক্যালাপ করার দুটি পন্থার উল্লেখ রয়েছে। একটি পন্থাকে ওহী শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে-যার অর্থ হচ্ছে নবীর অন্তরে ওহীর অবতরণ যা হযরত জিবরীল (আ)-এর মধ্যস্থতায় হত। আর দ্বিতীয় পন্থা ছিল সরাসরি আল্লাহর বাক্যধ্বনি-যা পর্দার অন্তরাল থেকে শুনিয়ে দেয়া হত এবং এর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনায়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে পরিষ্কার উল্লেখ আছেঃ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (৪ঃ ১৬৪)। অন্যত্র আছে যে, হযরত মূসা (আ) আকাংখা ব্যক্ত করেন, যে মহান সত্তা আমার সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন আমি তাঁকে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে চাই। এই অংশের "আম্বিয়ায় কেরাম স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রাপ্ত হতেন" এরূপ অর্থ করা কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। আয়াতের তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহ পাকের বাক্যালাপ করার পন্থা এই যে, তিনি তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করেন। এই রসূলের নিকট আল্লাহ ওহী

পাঠান এবং রসূল এই ওহী সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেন। অন্য কথায়, আমরা যখন কুরআন মজীদ পাঠ করি তখন আল্লাহ যেন আমাদের সাথে বাক্যালাপ করছেন।”

উত্তরঃ কুরআন সম্পর্কে এখানে দূরদৃষ্টির যে নমুনা পেশ করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য–প্রস্থ জানার জন্য খুব দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুরআন মজীদের সূরা শূরার ৫ম রুকূ বের করে দেখে নিন। ডকটর সাহেব যে আয়াতের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন ঠিক তার পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ـ

"এবং এভাবে (হে নবী) আমরা আমাদের নির্দেশের একটি রূহ্ তোমার দিকে ওহী পাঠিয়েছি। তুমি কিছুই জানতে না কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস। কিন্তু আমরা সেই রূহ্কে একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমরা বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই। আর নিশ্চিত তুমি সঠিক–সোজা দিকে পথ দেখাচ্ছ”–(আয়াতঃ ৫২)।

এ থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, পূর্বোক্ত আয়াতের কোন অংশই সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আল্লাহর বাণী পৌছানোর পন্থা বর্ণনা করছে না, বরং তাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তাঁর নবীর নিকট যে পন্থায় তাঁর বাণী পৌঁছান তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধানসমূহ পৌছার যে তিনটি পন্থার কথা তাতে উল্লেখিত হয়েছে সেদিকেই এ আয়াতে وَكَذٰلِكَ (আর এভাবে) শব্দটি ইংগীত করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (স)–কে বলছেন, উপরোক্ত তিনটি পন্থায় আমরা আমাদের নির্দেশের একটি রূহ তোমার প্রতি ওহী করেছি। رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا অর্থ 'জিবরীল আমীন' গ্রহণ করা যায় না, কারণ যদি তাই বুঝানো হত হবে أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ বলার পরিবর্তে أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ বলা হত। এজন্য "নির্দেশের রূহ্” অর্থ সেই সকল হেদায়াত যা উল্লেখিত তিনটি পন্থায় মহানবী (স)–এর উপর ওহী করা হয়েছে। অতপর শেষের দুটি বাক্যাংশে ঘটনাবলীর পারম্পর্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দার পথ প্রদর্শন সেই আলোর দ্বারা করেছেন যা "নির্দেশের রূহ্”–এর আকারে তাঁর নিকট পাঠানো হয়েছে এবং এখনও সেই বান্দা সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে লোকদের পথপ্রদর্শন করছেন।

তথাপি যদি পূর্বাপর সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ঐ একটি আয়াতের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে নেয়া হয় যার ব্যাখ্যা ডকটর সাহেব প্রদান করেছেন তবুও তার সেই তাৎপর্য হতে পারে না, যা তিনি তা থেকে বের করার চেষ্টা করেছেন। ঐ আয়াতের তৃতীয় অংশের তিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষের নিকট রসূল প্রেরণ করেন, রসূলের নিকট আল্লাহ ওহী পাঠান এবং রসূল এই ওহী সাধারণ লোকদের নিকট পৌঁছে দেন। অথচ আয়াতের মূল পাঠ এই যেঃ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ـ

"অথবা তিনি একজন বার্তাবাহক পাঠান, অতপর সে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ওহী করে যা তিনি চান।"

উক্ত বাক্যাংশে "রসূল" শব্দের অর্থ যদি ফেরেশতার পরিবর্তে "মানুষ রসূল" করা হয় তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূল সাধারণত মানুষের উপর ওহী করেন। বাস্তবিকই কি সাধারণ মানুষের উপর আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম ওহী করতেন? ওহী শব্দের অর্থই তো সূক্ষ্ম ইংগীত এবং গোপন বাক্যালাপ। আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে প্রকাশ্যে যে প্রচারকার্য করতেন তা বুঝানোর জন্যও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে না, আর কুরআনের কোথাও তা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে তো 'রসূল' শব্দটি পরিষ্কারভাবে সেই ফেরেশতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। তাঁর বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজটিকে "ওহী করা" শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং করা যেতে পারে।

৩৬. ওহী গায়র মাতলূর উপর ঈমান আনয়ন রসূলের উপর ঈমানের অংশ

অভিযোগঃ "আম্বিয়ায় কিরামের নিকট যে ওহী আসত তার শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ কুরআনের কোথাও নেই। অথবা এ ধরনের কোন উল্লেখও কুরআনের কোথাও আসেনি যে, কুরআন শুধুমাত্র এক ধরনের ওহীর সমষ্টি এবং অবশিষ্ট শ্রেণীর ওহীসমূহ-যা রসূলুল্লাহ (স)-কে দান করা হয়েছিল তা অন্য কোথাও সংকলিত আছে। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (স)-এর জবানীতে স্বয়ং কুরআন মজীদে একথা বলানো হয়েছে যে أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ "আমার নিকট এই কুরআন ওহী করা হয়েছে"-(সূরা আল-আনআমঃ ১৯)।

কুরআনের কোন এক স্থানেও কি উল্লেখ আছে যে, আমার নিকট কুরআন ওহী করা হয়েছে এবং তা ছাড়া আরও ওহী পাওয়া গেছে যা কুরআনে উল্লেখ নাই? আসল কথা হচ্ছে আপনি ওহীর গুরুত্বই বুঝতে পারেননি। ওহীর উপর ঈমান আনয়ন করায় কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে এবং এই ঈমান পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ ওহীর উপর ঈমান আনয়নের নাম। এই নয় যে, ওহীর এক অংশের উপর ঈমান আনা হবে এবং অপরাংশের উপর ঈমান আনা হবে না।"

উত্তরঃ 'কুরআন ব্যতীতও মহানবী (স)–এর উপর ওহীর মাধ্যমে বিধি–বিধান নাযিল হত' শীর্ষক আলোচনা সম্পর্কিত পত্রালাপে এই বিষয়ের প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে ["কুরআন ছাড়াও কি মহানবী (স)–এর উপর আরও কোন ওহী আসত?" শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্র.]। এখন থাকল এই প্রশ্ন যে দ্বিতীয় প্রকারের ওহীর উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশ কোথায় দেয়া হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, এর উপর ঈমান আনা মূলত রিসালাতের উপর ঈমান আনার এক অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব ছাড়াও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা স্বয়ং দাবী করে যে, রসূল যে পথনির্দেশ ও শিক্ষাই দান করেন তার উপর ও ঈমান আনতে হবে। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে মূলত আল্লাহ্র আনুগত্য করল"–(সূরা নিসাঃ ৮০)। وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا "তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তবে সৎপথপ্রাপ্ত হবে"–(সূরা নূরঃ ৫৪)। أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ "এই নবীগণ সেইসব লোক যাদের আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তোমরা তাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর"–(আল–আনআমঃ ৯১)।

ডকটর সাহেবের হয়ত জানা নাই যে, এমন অসংখ্য নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন যাদের উপর আদৌ কোন কিতাব নাযিল হয়নি। কিতাব তো কখনও নবী ছাড়া আসেনি, কিন্তু কিতাব ছাড়াও নবী এসেছেন। লোকেরা তাদের শিক্ষা ও পথনির্দেশের উপর ঈমান আনতে এবং তাদের অনুসরণ করতে ঠিক তদ্রূপ আদিষ্ট ছিল যেভাবে আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান আনতে এবং তা অনুসরণ করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। স্বয়ং কিতাব আনয়নকারী নবীগণের উপর প্রথম দিন থেকেই ওহী মাতলূ (প্রত্যক্ষ ওহী) নাযিল হওয়া একান্ত জরুরী নয়। হযরত মূসা (আ)–এর উপর তাওরাত কিতাব ঠিক তখন নাযিল শুরু হয় যখন তিনি ফিরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈলদের নিয়ে তূর পর্বতের পাদদেশে পৌঁছেন (সূরা আল–আরাফঃ ১৩০–১৪৭ নং আয়াত এবং আল–কাসাসঃ ৪০–৪৩ নং আয়াত দ্র.)। মিসরে অবস্থানকালে তাঁর উপর কোন কিতাব নাযিল

হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরাউন এবং মিসরের প্রতিটি অধিবাসী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পেশকৃত প্রতিটি কথার উপর ঈমান আনতে আদিষ্ট ছিল। এমনকি এসব কথার উপর ঈমান না আনার কারণে ফিরাউন স্বীয় সৈন্যবাহিনী সমেত শাস্তির শিকার হল।

হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি এই জিনিসটি মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কুরআনের বর্তমান ক্রমবিন্যাস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার উপর আপনারা ঈমান রাখেন কি না? কুরআনে স্বয়ং একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র গ্রন্থ একই সময় একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি, বরং তা বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে (দ্র. সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১০৬ নং আয়াত এবং আল-ফুরকানঃ ৩২ নং আয়াত)। অপর দিকে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, তা সুসংবদ্ধ করে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছিলেন।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

এ থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাস সরাসরি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার অধীনে হয়েছে, মহানবী (স) নিজ মর্জি মাফিক তার বিন্যাস করেননি। এখন কেউ কি কুরআন মজীদ থেকে এমন কোন নির্দেশ বের করে দেখাতে পারবে যে, এর সূরাসমূহ বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী পড়তে হবে এবং এর বিভিন্ন আয়াতসমূহকে কোথায় কোন্ প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে? যদি কুরআন মজীদে এ ধরনের কোন হেদায়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এধরনের কোন হুকুম তাতে নাই, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে কুরআন বহির্ভূত কিছু নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (স) লাভ করে থাকবেন যার অধীনে তিনি এই পবিত্র গ্রন্থ বর্তমান বিন্যাসে পাঠ করেছেন এবং সাহাবীদের পড়িয়েছেন। উপরন্তু সূরা আল-কিয়ামায় আল্লাহ এও বলেছেন যে- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - "অতপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব"-(আয়াত নং ১৯)।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বিধিবিধান ও শিক্ষার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মহানবী (স) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে দান করতেন তা তাঁর নিজস্ব মস্তিস্ক প্রসূত ছিল না, বরং যেই মহান পবিত্র সত্তা তাঁর উপর কুরআন নাযিল করতেন তিনিই তাঁকে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন এবং এর যেসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দানের প্রয়োজন ছিল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতেন। কুরআনের উপর ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তিই তা মানতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না।

৩৭. পরোক্ষ ওহী (ওহী গায়র মাতলূ)—ও কি জিবরীল (আ) নিয়ে আসতেন?

অভিযোগঃ "আপনি লিখেছেন, কুরআন করীমে শুধুমাত্র জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে নবী (স)-এর উপর নাযিলকৃত ওহী লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমতো বলুন যে, আপনি কোথা থেকে জানতে পারলেন যে, জিবরীল (আ)-এর মধ্যস্থতা ছাড়াও মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল হত? দ্বিতীয়তো খুব সম্ভব আপনার জানা নাই যে, আপনি যে ওহীকে জিবরীল (আ)-এর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে ওহী বলেন (অর্থাৎ হাদীস) সে সম্পর্কে হাদীসকে ওহী বলে স্বীকৃতিদানকারীগণের আকীদা-বিশ্বাস এই যে, জিবরীল (আ) কুরআন নিয়ে যেভাবে অবতীর্ণ হতেন ঠিক সেভাবে এই হাদীস নিয়েও অবতীর্ণ হতেন (জামে বায়ানিল ইল্‌ম্ গ্রন্থ দ্র.)। অতএব আপনার এই বর্ণনা স্বয়ং আপনার সম্প্রদায়ের নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়।"

উত্তরঃ এক আশ্চর্য ধরনের রোগ যে, যে কথার উৎস বারবার বলে দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এর উৎস কি? সূরা শূরার ৫১ নং আয়াত যে সম্পর্কে এইমাত্র ডকটর সাহেব স্বয়ং আলোচনা করে এসেছেন তা থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, জিবরীল (আ)-এর মধ্যস্থতা ছাড়াও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের উপর ওহী নাযিল হত। মনে হয় ডকটর সাহেব 'জামে বায়ানিল ইল্‌ম' গ্রন্থের আকৃতিও দেখেননি এবং উড়ন্তভাবে কোথাও থেকে তার বরাত দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তো হাসসান ইব্‌ন আতিয়্যার নিম্নোক্ত বক্তব্য নকল করা হয়েছেঃ

كَانَ الوحى ينزل على رسولِ الله صلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذٰلك-

"রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী নাযিল হত এবং জিবরীল (আ) এসে তার ব্যাখ্যা করতেন এবং তার উপর আমল করার পন্থা বলে দিতেন।"

উপরোক্ত বাক্য থেকে এই অর্থ কোথায় পাওয়া গেল যে, প্রতিটি ওহী জিবরীল নিয়ে আসতেন? তা থেকে তো শুধু একথাই জানা যায় যে, জিবরীল (আ) কুরআন ছাড়াও অন্যান্য ওহী নিয়ে আসতেন। "জিবরীলও আনতেন" এবং "জিবরীলই আনতেন" এ দুটি কথার পার্থক্য অনুধাবন করা তো খুব কষ্টকর কাজ নয়।

৩৮. কিতাব ও হিকমাত (বিচক্ষণতা) কি একই জিনিস না স্বতন্ত্র জিনিস?

অভিযোগঃ "আপনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা "কিতাব ও হিকমাত" উভয়কে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত বলেছেন। কিতাব অর্থ কুরআন এবং হিকমাত অর্থ সুন্নাত অর্থাৎ হাদীস। কুরআনের উপর আপনার এরূপ অভিজ্ঞতার জন্য যতই বিলাপ করা হোক তা কমই হবে। বান্দা নাওয়জ! কিতাব ও হিকমাত–এর মাঝখানে ওয়াও (,) অক্ষরটি সংযোগ অব্যয় নয় (যার অর্থ "এবং" হয়ে থাকে), এটা ব্যাখ্যামূলক 'ওয়াও'। এর প্রমাণ কুরআন মজীদেই বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনকেই স্বয়ং হাকীম (হিকমাতময়) বলেছেন। يٰسٓ ـ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ অন্যত্র আল–কিতাব–কে আল–হাকীম বলেছেন। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ـ

উত্তরঃ হাদীস অস্বীকারকারীরা এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত আছে যে, 'ওয়াত' ( ) অক্ষরের অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছা এটাকে সংযোগ অব্যয় বলবে এবং যেখানে ইচ্ছা তাকে 'ব্যাখ্যামূলক ওয়াও' সাব্যস্ত করবে। কিন্তু তাদের জানা উচিৎ, শুধু আরবী ভাষায়ই নয়, যে কোন ভাষার সাহিত্যেই শব্দের অর্থ নির্ধারণের বিষয়টি এভাবে খেয়ালী নয়। ওয়াও–কে ব্যাখ্যামূলক কেবলমাত্র তখনই সাব্যস্ত করা যেতে পারে যখন এই অক্ষরটি যে দুটি শব্দের মাঝখানে এসেছে তা পরস্পর সমার্থবোধক, অথবা সম্বন্ধ থেকে মনে হয় যে, বক্তা তাকে সমার্থবোধক সাব্যস্ত করতে চায়। কিন্তু যেখানে এ অবস্থা নাই সেখানে 'ওয়াও' অক্ষর হয় দুটি ভিন্ন জিনিস একত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়, না হয় সাধারণকে বিশেষের সাথে অথবা বিশেষকে সাধারণের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব স্থানে –এর ব্যাখ্যামূলক হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

এখন দেখুন, আরবী ভাষার আলোকে একথা পরিষ্কার যে, কিতাব ও হিকমাত শব্দদ্বয় সমার্থবোধক নয়, বরং উভয়টি দুটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখন কুরআনের আলোকেও বলা যায় যে, কুরআনে শব্দদুটির ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তা হিকমাতকে কিতাবের সমার্থবোধক সাব্যস্ত করে। সূরা নাহ্ল–এ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ـ

"তোমার প্রতিপালকের রাস্তার দিকে হিকমাতের সাথে ডাক।" এর অর্থ কি এই যে, কুরআনের সাথে ডাক?

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে সূরা যুখরুফ–এ আছে قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ "সে বলল, আমি তোমাদের নিকট হিকমাতসহ এসেছি।" এর অর্থ কি এই যে, আমি কিতাবসহ এসেছি? সূরা বাকারায় আছে– وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا - "যাকে হিকমাত দেয়া হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে।" এর অর্থ কি এই যে, তাকে কিতাব দেয়া হয়েছে? সূরা লুকমান–এ লুকমান হাকীম সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ "আমরা লুকমানকে হিকমাত দান করেছি।" এর কি এই যে, তাঁকে কিতাব দেয়া হয়েছে?

মূলত কুরআনের কোথাও 'কিতাব' বলে 'হিকমাত' বুঝানো হয়নি এবং 'হিকমাত' বলেও 'কিতাব' বুঝানো হয়নি। যেখানেই 'কিতাব' শব্দটি এসেছে– তার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। আর যেখানেই 'হিকমাত' শব্দটি এসেছে সেখানে এমন বুদ্ধিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃত সত্য অনুধাবনে এবং চিন্তায় ও কাজে সঠিক দৃষ্টিভংগি গ্রহণে সক্ষম হয়। এ জিনিস কিতাবের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার কিতাবের বাইরেও হতে পারে। কিতাবের জন্য যেখানে 'হাকীম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে অবশ্যই তার অর্থ এই যে, কিতাবের মধ্যে হিকমাত আছে, কিন্তু এই অর্থ নয় যে, স্বয়ং কিতাবই হিকমাত, অথবা হিকমাত শুধুমাত্র কিতাবেই আছে এবং তার বাইরে কোন হিকমাত নেই।

অতএব রসূলুল্লাহ (স)–এর উপর কিতাব ও হিকমাত নাযিল হওয়ার এরূপ অর্থ গ্রহণ ঠিক হবে না যে, মহানবী (স)–এর উপর কেবলমাত্র কিতাব নাযিল করা হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ এই হবে যে, তাঁর উপর কিতাবের সাথে সাথে সেই কর্মকৌশল, বুদ্ধিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাও নাযিল করা হয়েছে যার সাহায্যে তিনি এই কিতাবের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন এবং মানবজীবনে তাকে সর্বাধিক সঠিক পন্থায় কার্যকর করে দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - বাক্যের অর্থ কখনও এই নয় যে, রসূলুল্লাহ (স) শুধুমাত্র কিতাবের বাক্যগুলো পড়ে শুনিয়ে দেবেন। বরং তার অর্থ এই যে, তিনি লোকদের কিতাবের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবেন এবং তাদেরকে সেই বুদ্ধিজ্ঞান ও কর্মকৌশলের প্রশিক্ষণ দেবেন যার সাহায্যে তারা পৃথিবীর জীবনব্যবস্থাকে আল্লাহ্র কিতাবের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

৩৯. 'তিলাওয়াত' শব্দের অর্থ

অভিযোগঃ "কুরআনই যে হিকমাত তা প্রমাণের জন্যে সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হচ্ছে আপনার উধৃত সূরা আহ্যাবের আয়াত যে সম্পর্কে

আপনি এতটুকুও চিন্তা করেননি যে, আপনি কি বলছেন। আয়াতটি এখানে উল্লেখ করা হলঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ (۳۳/۲۵)

আনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, আপনি কুরআনে সন্নিবেশিত ওহীকে ওহী মাতলূ এবং কুরআনের বহির্ভূত ওহীকে ওহী গায়র মাতলূ বলে থাকেন।

অত্র আয়াতে হিকমাতকেও 'মা ইউতলা' বলা হয়েছে। অতএব হিকমাত বলে ওহী মাতলূ-কেই বুঝানো হয়েছে, ওহী গায়র মাতলূ নয়। অন্যত্র কুরআনকে ওহী মাতলূ বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্ফে আছে- وَاتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ অন্যত্র আছে- وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ উপরন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে- يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ - বাক্য এসেছে, হাদীসসমূহের তিলাওয়াতের কথা আসেনি। তাই সূরা আহ্যাবে যে হিকমাত-এর তিলাওয়াতের কথা এসেছে সেই হিকমাত অর্থ কুরআন।

উত্তরঃ এই প্রকারের দলীল পেশও অজ্ঞতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার উপর ভিত্তিশীল। "তিলাওয়াত" শব্দটিকে একটি পরিভাষা হিসাবে কেবলমাত্র কুরআন পাকের তিলাওয়াত অর্থে পরবর্তী কালের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যবহার করেছেন যার ভিত্তিতে 'ওহী মাতলূ' ও 'ওহী গায়র মাতলূ' পরিভাষাদ্বয় প্রচলিত হয়েছে। কুরআন মজীদে 'তিলাওয়াত' শব্দটি শুধুমাত্র 'পড়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, পরিভাষা হিসাবে কেবলমাত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতের জন্য বিশেষিত করা হয়নি। যদি এতে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে তবে সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াত দেখা যেতে পারে- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ "আর তারা অনুসরণ করল সেই জিনিস যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান তিলাওয়াত করত।"

৪০. কিতাবের সাথে মীযান অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ

অভিযোগঃ "আপনি বলেছেন, 'অতপর কুরআন মজীদ আরও একটি জিনিসের কথাও উল্লেখ করেছে যা আল্লাহ তাআলা কিতাবের সাথে নাযিল করেছেন। তা হচ্ছে আল-মীযান, অর্থাৎ পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা। প্রকাশ থাকে যে, এই তৃতীয় জিনিসটি না রসূলুল্লাহ (স)-এর কথার মধ্যে শামিল আছে আর না কাজের মধ্যে। অন্যভাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কাজ যেভাবে কুরআন থেকে পৃথক ছিল, ঠিক তেমনিভাবে নবী (স)-এর কথা ও

কাজ সেই আসমানী পথনির্দেশ থেকেও পৃথক ছিল যাকে আল-মীযান বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - আশ্চর্য হতে হয় যে, আপনি সূরা হাদীদ-এর ২৫নং আয়াতের এতটুকু কেন নকল করলেন, যাতে কিতাব ও মীযান -এর উল্লেখ আছে। আর উক্ত আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ ("আর আমরা লোহা নাযিল করেছি") অংশটুকু কেন বাদ দিলেন? এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিতাব ও মীযানের সাথে চতুর্থ জিনিস আল-হাদীদ (লোহা) ও অনুরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"

উত্তরঃ এই আলোচনা যদি কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যে না হত তবে এটা হৃদয়ংগম করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সীরাত (জীবনচরিত) এবং তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত হিকমাত (প্রজ্ঞা) ও ন্যায়ের মীযান (মানদন্ড, ভারসাম্য)-এর নমুনা দেখতে পায়। হিকমত যখন মহানবী (স)-এর কথা ও কাজের মধ্যে শামিল ছিল তখন এই মীযান তাঁর কথা ও কাজের বহির্ভূত হওয়া উচিৎ-এখানে এরূপ বিতর্কের সৃষ্টি করা মূলত বক্র বিতর্কের একটি নিকৃষ্ট নমুনা। কোন ব্যক্তির কথা ও কাজের মধ্যে যুগপৎভাবে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এবং ভারসাম্যও। এই দুটি জিনিসের মধ্যে কি এমন কোন বৈপরিত্য আছে যে, একটির উপস্থিতিতে তার সাথে অপরটি বর্তমান থাকতে পারবে না? এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, হাদীস অস্বীকারকারীরা কতটা বক্রবুদ্ধি ও বক্র বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে আরও একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আমি মীযান শব্দটি শুধুমাত্র পথপ্রদর্শনের সাধারণ যোগ্যতা অর্থে ব্যবহার করিনি, বরং সেই যোগ্যতা যার সাহায্যে মহানবী (স) আল্লাহ্র কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল-হাদীদ (লোহা) সম্পর্কিত অভিযোগের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক স্বয়ং সূরা হাদীদ-এর ২৫ নং আয়াত পাঠ করে দেখুন। তাতে কিতাব ও মীযান সম্পর্কে তো বলা হয়েছে اَنْزَلْنَا مَعَهُمْ (আমরা এই দুটি জিনিস নবীদের সাথে নাযিল করেছি)। কিন্তু লোহা সম্পর্কে শুধু বলা হয়েছে- وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ (এবং আমরা লোহা নাযিল করেছি)। তাই এই জিনিসটিকে বিশেষভাবে নবীদেরকে প্রদত্ত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। 'লোহা' তো ন্যায়নিষ্ঠ ও যালেম উভয়ই ব্যবহার করে থাকে। এটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্যি তাদের আসল বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা এই (লোহার) শক্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত

কিতাব ও মীযানের অধীনে রেখে ব্যবহার করেন। এখন লোহা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হওয়ার বিষয়টি হাদীস অস্বীকারকারীদের জন্য অদ্ভুত কান্ড। কিন্তু কুরআন মজীদের পরিষ্কার বাক্য "আমরা লোহা নাযিল করেছি।"

৪১. আরেকটি বক্র বিতর্ক

অভিযোগঃ "সামনে অগ্রসর হয়ে আপনি বলেছেন যে, কুরআন তৃতীয় একটি জিনিসেরও খবর দেয় যা কিতাব ব্যতীত নাযিল করা হয়েছিল।" এর সমর্থনে আপনি নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেনঃ

(١) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا -

"অতএব ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যা আমরা নাযিল করেছি"–(সূরা তাগাবুনঃ ৮)।

(٢) فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"অতএব যেসব লোক ঈমান আনে এই রসূলের উপর এবং তাকে সম্মান করে, তার সাহায্য করে এবং সেই নূরের পেছনে চলে যা তার সাথে নাযিল করা হয়েছে–এরাই সফলকাম"– (সূরা আরাফঃ ১৫৭)।

(٣) قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ -

"তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর সাহায্যে আল্লাহ তাআলা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে শান্তির পথ দেখান–যে তাঁর ইচ্ছার অনুসরণকারী"–(সূরা মাইদাঃ ১৫–১৬)।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ, রসূল ও নূরের উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশ রয়েছে। আপনার ধারণা অনুযায়ী কি আল্লাহ ও রসূল ব্যতীত আর কোন জিনিসের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়নি, না কিতাবের উপর, না হিকমাতের উপর, না মীযানের উপর; বরং শুধু চতুর্থ. জিনিসের উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে যাকে আপনি কিতাব, হিকমাত ও মীযান থেকে স্বতন্ত্র জিনিস সাব্যস্ত করেছেন? দ্বিতীয় আয়াতে রসূলের উপর ঈমান আনার উল্লেখ

আছে এবং নূরের অনুসরণ করার নির্দেশ। অর্থাৎ আয়াতে কিতাব ও হিকমাতের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়নি। আপনার যুক্তি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি কুরআনের উপর ঈমান না আনে, শুধু নূরের উপর ঈমান আনে, এবং যে কুরআনের অনুসরণ না করে শুধু নূরের অনুসরণ করে তবে সে মুমিনদের ও নাজাত প্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে। এই নূর কি জিনিস? এর ব্যাখ্যায় আপনি বলেছেন, "এর অর্থ সেই বুদ্ধিজ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি হতে পারে যা মহানবী (স)-কে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।" কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন এবং তার অনুসরণ থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল, বরং মহানবী (স)-এর কথা ও কাজের আনুগত্য থেকেও। কেননা এসব আয়াতে কেবল নূরের উল্লেখ আছে।"

উত্তরঃ এটাও বক্র বিতর্কের আরেকটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। হাদীস অস্বীকারকারীরা যদি কখনও বুঝেশুনে কুরআন পাঠ করে থাকত তবে তারা কুরআন পাকের বাচনভংগীর সাথে পরিচিত হতে পারত। কুরআন মজীদ বিভিন্ন পর্যায়ে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নিজস্ব শিক্ষার বিভিন্ন অংশের উপর জোর দেয়। যেমন, তা কোথাও শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনার ফলশ্রুতিতে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। কোথাও শুধুমাত্র আখেরাতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার মূল কারণ হিসাবে বর্ণনা করে। কোথাও আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনার ফল এই বলে যে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ কোথাও শুধু রসূলের উপর ঈমান আনাকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে আমলসমূহের মধ্য থেকেও কখনও কোন একটি আমলকে মুক্তির উপায় হিসাবে উল্লেখ করে এবং কখনও অন্য কোন জিনিসকে। এখন কি এই সমস্ত আয়াতকে উপরোক্তভাবে পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক রূপে তুলে ধরা হবে এবং তা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যে, তা পরস্পর বিরোধী?

অথচ সামান্য জ্ঞানই একথা হৃদয়ংগম করার জন্য যথেষ্ট যে, উল্লেখিত সব স্থানে কুরআন মজীদ একটি বিরাট সত্যের বিভিন্ন দিক পরিবেশ অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে এবং এসব দিকের কোন একটি অপরটিকে নাকচ করে দেয় না। যে ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর আনীত আলোর পেছনে চলতে প্রস্তুত হবে সে স্বতস্ফূর্তভাবেই কুরআনকেও মান্য করবে এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর শিখানো হিকমাত ও জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হতেও চেষ্টা করবে। কুরআন অস্বীকারকারী সম্পর্কে এই ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, সে রিসালাতের নূরের অনুসারী?

৪২. কিবলার পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াতে কোন্ কিবলার কথা বলা হয়েছে?

অভিযোগঃ আপনি কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াত ও তার অনুবাদ এই করেছেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

"এবং আমি সেই কিবলা–যার অনুসরণ তুমি এ পর্যন্ত করেছিলে এজন্য নির্দিষ্ট করেছিলাম যাতে দেখতে পারি যে, কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়"–(সূরা বাকারাঃ ১৪৩)।

এ সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, "মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারণের পূর্বে মুসলমানগণ যে কিবলার অনুসরণ করত তাকে কিবলা বানানোর কোন নির্দেশ কুরআন মজীদে আসেনি। যদি এসে থাকে তবে আপনি তা উল্লেখ করুন" (ঐ. পৃ. ৪৪৯)।

এ সম্পর্কে যদি কুরআন পাকে কোন নির্দেশ এসে থাকত তবে তা অবশ্যই কুরআনে উল্লেখ থাকত। কিন্তু যখন নির্দেশই আসেনি তখন আমি কুরআন থেকে কিভাবে বরাত উল্লেখ করব? আপনি প্রথমেই ধারণা করে নিয়েছেন যে, প্রথম কিবলা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারপর আপনি এই ধারণা অনুযায়ী উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন। অত্র আয়াতে - كُنْتَ - শব্দের অর্থ "তুমি ছিলে" নয়, এর অর্থ হচ্ছে "তুমি আছ"। অর্থাৎ "আমরা সেই কিবলা যার উপর তুমি আছ এজন্য নির্দিষ্ট করেছি যে, আমরা যেন দেখতে পারি, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়?" এই অর্থের অনুকূলে সমর্থন স্বয়ং কুরআন থেকেই পাওয়া যায়।

উত্তরঃ উপরোক্ত আয়াতে - كُنْتَ . (কুনতা) শব্দের অর্থ "তুমি আছ" কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে, আরবী ভাষায় كَانَ (কানা) শব্দটি কখনও কখনও 'ছিল'–এর পরিবর্তে "আছে" অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সূরা বাকারার যে রুকূতে উক্ত আয়াত রয়েছে সেই পূর্ণ রুকূটি যে ব্যক্তি কখনও বুঝেশুনে পড়ে থাকবে, সে এখানে كُنْتَ শব্দটির অর্থ "তুমি আছ" করত পারে না। কারণ পূর্বাপর বিষয়বস্তু উক্তরূপ অর্থ করার পথে প্রতিবন্ধক। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে রুকূটি শুরু হয়েছেঃ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا

"নির্বোধেরা অবশ্যই বলবে যে, তারা যে কিবলার অনুসরণ করত তা থেকে কোন্ জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে?"

এখানে كَانُوا (কানূ) শব্দের অর্থ "তারা আছে" কোনক্রমেই করা যেতে পারে না। কারণ "কোন্ জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছে" বাক্যাংশ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, মুসলমানগণ অন্য কোন কিবলার দিকে মুখ করত। এখন তা ত্যাগ করে ভিন্ন কিবলার দিকে মুখ ফিরাতে যাচ্ছে এবং এই কারণে বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ উথাপনের সুযোগ পেয়েছে যে, তারা তাদের পূর্ববর্তী কিবলা ত্যাগ করল কেন? এরপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের জওয়াব কি হতে পারে তা বলে দেয়া হয়েছে। এই প্রসংগে অন্যান্য কথার সাথে নিম্নোক্ত কথাও বলা হয়েছেঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا .....

"তুমি যে কিবলার অনুসরণ করতে তা আমরা এজন্যই নির্দিষ্ট করেছি যে, ... ।"

এখানে كُنْتَ عَلَيْهَا বলে ঠিক সেই জিনিসই বুঝানো হয়েছে যে সম্পর্কে উপরের আয়াতে كَانُوا عَلَيْهَا বলা হয়েছে। এর অর্থ কোনক্রমেই "তুমি আছ" করা যায় না। পূর্বোক্ত আয়াত চূড়ান্তভাবেই এর অর্থ "তুমি ছিলে" নির্দিষ্ট করে দেয়। এরপর তৃতীয় আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

"আমরা তোমার মুখমন্ডল বারবার আকাশপানে উত্তোলন লক্ষ্য করছি। অতএব আমরা তোমাকে তোমার কাংখিত কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং তুমি তোমার মুখমন্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে দাও।"

উপরোক্ত আয়াত থেকে যে পরিষ্কার চিত্র সামনে আসে তা এই যে, প্রথমে মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ ছিল। রসূলুল্লাহ্ (স) আকাংখা করতেন যে, এখন এই কিবলা পরিবর্তন করে দেয়া হোক। এজন্য তিনি বারবার আসমানের দিকে মুখমন্ডল উত্তোলন করতেন যে, কখন কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এসে যায়। এই অবস্থায় নির্দেশ এসে গেল যে, এখন আমরা তোমাকে সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে

দিচ্ছি যাকে তুমি কিবলা বানাতে আগ্রহী। তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে দাও। পূর্বাপর এই সম্পর্কের আলোকে وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখানে সেই উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নাই যা ডকটর সাহেব পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, মসজিদুল হারামের পূর্বে মুসলমানগণ যে কিবলার অনুসরণ করত তাও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ছিল এবং তিনি তা এজন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন যে, তিনি দেখতে চান কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পশ্চাদপসরণ করে।

৪৩. কিবলার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) —এর আনুগত্য করা বা না করার প্রশ্ন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

অভিযোগঃ যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, প্রথম কিবলা আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তবে নিম্নোক্ত কথার কোন অর্থই থাকে নাঃ " তা আমরা এজন্য করেছিলাম যাতে দেখে নিতে পারি যে, কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়।" এজন্য যে, প্রথম কিবলা নির্ধারণের সময় কারো পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মহানবী (স) একটি কিবলার দিকে মুখ করতেন। যে ব্যক্তি মহানবী (স)–এর সাথে অংশগ্রহণ করত সেও ঐদিকেই মুখ করত। "পশ্চাৎপদ" হওয়ার প্রশ্ন তখনই সৃষ্টি হয় যখন এই কিবলার পরিবর্তন করা হয়। এ সময়ই পরখ করার সুযোগ আসে যে, কে সেই প্রথম কিবলার প্রতি বেশী আকর্ষণ বোধ করে এবং কে রসূলের (যিনি আল্লাহর নির্দেশে এই পরিবর্তন করেন) আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ নতুন কিবলার দিকে মুখ ফিরায়।

উত্তরঃ এটা কেবল **স্বল্প** জ্ঞানের ফল। হাদীস অস্বীকারকারীরা জানে না যে, জাহিলী যুগে কাবা ঘর গোটা আরব জাতির পবিত্রতম তীর্থের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামে প্রথমত যখন কাবার পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানো হয় তখন এটা ছিল আরবদের জন্য কঠিন পরীক্ষার বিষয়। নিজেদের কেন্দ্রীয় ইবাদতগৃহ ত্যাগ করে ইহূদীদের ইবাদত গৃহকে কিবলা বানানো তাদের জন্য কোন সহজ কাজ ছিল না। এভাবে আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ বলছে যেঃ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ -

"যদিও সেই কিবলা কঠিনতর ছিল, কিন্তু সেই লোকদের জন্য নয় যাদেরকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্টকারী নন।"

উপরোক্ত বাক্য থেকে জানা যায় যে, এই কিবলা প্রসংগে পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রশ্ন কেন সৃষ্টি হত? উপরন্ত এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, কুরআন পাকে যে হুকুম আসেনি, বরং রসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছিল তার মাধ্যমে লোকদের ঈমানের পরীক্ষা করা হয়েছিল। যেসব লোক এই হুকুমের অনুসরণ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমরা তোমাদের ঈমান নষ্টকারী নই। এরপরও কি এখন এব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে যে, কুরআন মজীদ ছাড়াও রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ওহীর মাধ্যমে কোন হুকুম অসতে পারে এবং তার উপরও ঈমান আনা অপরিহার্য?

৪৪. রসূলুল্লাহ (স)—এর উপর নিজস্বভাবে কিবলা নির্ধারণের অপবাদ

অভিযোগঃ এই কথা যে, এই নতুন কিবলার নির্দেশই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছিল, প্রথম কিবলার হুকুম নয়, দুটি আয়াতের পরই কুরআন পরিষ্কার করে দিয়েছে যেখানে বলেছে যে-

لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

"তুমি যদি জ্ঞান এসে যাওয়ার পর লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তবে তুমি সাথে সাথে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে" (সূরা বাকারাঃ ১৪৫)।

এখান থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল-ইল্‌ম (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী) নতুন কিবলার জন্য এসেছিল। যদি প্রথম কিবলাও আল-ইল্‌ম অনুসারে নির্দিষ্ট হত তবে এখানে কখনও বলা যেত না যে, 'আল-ইল্‌ম' আসার পর তোমরা প্রথম কিবলার দিকে মুখ কর না।

উত্তরঃ আমার অভিযোগ ছিল যে, হাদীস অস্বীকারকারীরা আমার বক্তব্যকে ভেংগেচুরে আমারই সামনে পেশ করে। কিন্তু এখন এদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করা যায় যারা আল্লাহ তাআলার কিতাবের আয়াতকে ভেংগেচুরে তার মনগড়া অর্থ করার ব্যাপারে এতটা দুসাহসী?

যে আয়াতের শেষাংশ নকল করে তার উপরোক্ত অর্থ বের করা হচ্ছে সেই পূর্ণ আয়াতটি এবং তার পূর্বেকার আয়াতের শেষাংশ একত্রে রেখে পাঠ করলে জানা যায় যে, হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীরা কুরআন মজীদের সাথে কি ব্যবহারটা করছে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে বাদ দিয়ে যখন মসজিদুল হারামকে কিবল বানানো হল তখন ইহূদীদের জন্যও তিরষ্কার, অপবাদ ও অভিযোগ আরোপের সেই সুযোগ সৃষ্টি হল যেভাবে পূর্ববর্তী কিবলার ব্যাপারে আরববাসীদের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ
إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

"কিতাবধারীরা উত্তমরূপেই জানে যে, তা (অর্থাৎ মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারণ) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক ও যথার্থ। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন। তোমরা কিতাবধারীদের নিকট যে কোন নিদর্শনই পেশ কর না কেন তারা তোমাদের কিবলার অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও। আর না তাদের মধ্যে কেউ কারো কিবলার অনুসরণকারী। আর তোমার নিকট সেই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তবে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা বাকারাঃ ১৪৪–৪৫)।

আয়াতে পূর্বাপর পারম্পর্য অনুযায়ী যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে অবশেষে এই তাৎপর্য কিভাবে বের হল যে, প্রথম কিবলা আল–ইল্‌ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হয়েছে? এখানে তো কেবল বলা হয়েছে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে মুসজিদুল হারামকে কিবলা বানানোর নির্দেশ যখন এসে গেল তখন এই আল–ইল্‌ম আসার পর শুধুমাত্র ইহূদীদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পূর্বোক্ত কিবলার দিকে মুখ করা যুলুমের শামিল। তর্ক শাস্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায়ও তার এই অর্থ করা যায় না যে, প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করা হত তা মহানবী (স) –এর নিজস্বভাবে নির্ধারিত ছিল। বিশেষত যখন এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেইসব ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছে যা ৪২ ও ৪৩ নং অভিযোগের জওয়াবে নকল

করা হয়েছে। মহানবী (স)-এর উপর নিজস্বভাবে কিবলা নির্ধারণের অপবাদ এক নিকৃষ্টতম শ্রেণীর দুসাহস।

৪৫. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا- **আয়াতের তাৎপর্য**

অভিযোগঃ দ্বিতীয় যে আয়াত আপনি পেশ করেছেন তা হচ্ছেঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا-

এবং এর তরজমা করেছেন-"আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন----"(সূরা ফাত্হঃ ২৭)।

প্রথমে বলুন, আপনি صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا -এর অনুবাদ "আল্লাহ সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন" কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে করেছেন? صَدَقَ الرُّؤْيَا -এর অর্থ "তিনি সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন" হতেই পারে না। এর অর্থ হবে- "স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।" যেমন- لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ. "আল্লাহ স্বীয়, প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।" আপনি নিজেও তরজমা করেছেন-"প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।" এরূপ অনুবাদ করেননি যে, আল্লাহ তোমার সাথে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উত্তরঃ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا- -এর অর্থ "আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন" কোন প্রকারেই হতে পারে না। একথা বলতে হলে صَدَقَ اللّٰهُ رُؤْيَا الرَّسُوْلِ বলা হত صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا বলা হত না। এই বাক্যাংশে صدق (সাদাকা) শব্দের দুটি মাফউল (কর্ম) রয়েছে। এক, রসূল-যাঁকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। দুই, স্বপ্ন-যা ছিল সত্য, অথবা যাতে সত্য কথা বলা হয়েছে। এজন্য অপরিহার্যরূপে এর অর্থ হবেঃ আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, অথবা তাকে স্বপ্নে সত্য কথা বলে দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণরূপে এরূপ-যেমন কেউ আরবীতে বলে صَدَقَنِى الْحَدِيْثَ এর অর্থ হবে-"সে আমার নিকট সত্য কথা বলেছে।" তার এরূপ অর্থ হবে না যে, "সে আমার নিকট যে কথা বলেছে তা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে।"

উপরন্তু ডকটর সাহেব উপরোক্ত আয়াতের যে অর্থ বলতে চান যদি তাই গ্রহণ করা হয় তবে এর পরবর্তী আয়াতাংশ অর্থহীন হয়ে পড়ে যেখানে আল্লাহ

তাআলা বলেছেনঃ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - "নিশ্চিত তুমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।" এই শেষোক্ত বাক্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছিল তা এখনও পূর্ণ হয়নি, তা সত্য প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে যেসব লোক রসূলুল্লাহ (স)–এর স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দান করেন যে, আমরা সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছি, এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যদি এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে থাকত তবে আল্লাহ তাআলা لَتَدْخُلُنَّ (তোমরা অবশ্যই প্রবেশ করবে) বলার পরিবর্তে قَدْ دَخَلْتُمْ (তোমরা অবশ্য প্রবেশ করেছ) বলতেন।

কথা শুধু এতটুকুই নয়, সূরা ফাত্‌হ–এর পুরাটাই যার একটি আয়াতকে কেন্দ্র করে এখানে আলোচনা চলছে, এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এই সূরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়, যখন মুসলমানদের উমরা করতে বাধা দেয়া হয়েছিল এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশের ঘটনাও সংঘটিত হয়নি। অতএব এই প্রাসংগিকতার আওতায় আয়াতের এই অর্থ করা যায় না যে, সেই সময় স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছিল।

৪৬. ওহী কি স্বপ্নের আকারেও আসে?

অভিযোগঃ আপনি আপনার অনুবাদ অনুযায়ী প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, মহানবী (স)–এর এই স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বপ্নকে ওহী সাব্যস্ত করা ওহী সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করে।

উত্তরঃ সূরা আস–সাফ্‌ফাত–এ ১০৩–৫ আয়াত ডকটর সাহেবের এই দাবী সম্পূর্ণরূপে অসার প্রমাণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের পুত্রকে বলেনঃ

يٰبُنَيَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ

"হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি।" পুত্র উত্তরে বলেন, يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ - "আব্বাজান! আপনাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা করে ফেলুন।" এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, সন্তান তাঁর নবী পিতার স্বপ্নকে শুধুমাত্র স্বপ্নই মনে করেননি, বরং আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করেছেন যা স্বপ্নের মধ্যে দেয়া হয়েছিল। সন্তান যদি একথা বুঝতে ভুল করতেন তবে আল্লাহ তাআলা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতেন যে, আমরা নবীদেরকে স্বপ্নযোগে কোন নির্দেশ দেই না। কিন্তু পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -

"হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ, আমরা সৎকর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।"

৪৭. অর্থহীন অভিযোগ ও অপবাদ

অভিযোগঃ আপনি লিখেছেনঃ "রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি মক্কা মুআজ্জমায় প্রবেশ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করেছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে এই খবর দেন এবং অতপর উমরা করার জন্য রওনা হয়ে যান। মক্কার কাফেররা তাঁকে হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধা দেয় এবং তার ফলশ্রুতিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। কতিপয় সাহাবী সংশয়ে পড়ে যান এবং হযরত উমার (রা) তাদের প্রতিনিধি হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করব এবং তাওয়াফ করব? তিনি বলেন, আমি কি একথা বলেছিলাম যে, এই সফরেই তা হবে?"

আপনার উপরোক্ত ভাষ্যের উপর এই আপত্তি তোলা যায় যে, (মাআযাল্লাহ) স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) নিজের ওহীর বিষয় অনুধাবন করতে ভুলের শিকার হয়েছিলেন।

উত্তরঃ বুঝা যাচ্ছে না এই অভিযোগ কোথা থেকে সৃষ্টি হল যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) ওহীর তাৎপর্য অনুধাবনে ভুলের শিকার হয়েছিলেন? উপরে যে বাক্য উধৃত করা হয়েছে তা থেকে তো শুধুমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, মহানবী (স)–এর স্বপ্নের কথা শুনে লোকেরা মনে করেছিল যে, এই সফরেই উমরা অনুষ্ঠিত হবে, এবং তা যখন হতে পারল না তখন লোকেরা সন্দেহে পড়ে গেল।

অভিযোগঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি যে ঘটনা লিখেছেন তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, (১) রসূলুল্লাহ (স) প্রথম হতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবহিত হয়েছিলেন যে, এ বছর তিনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন এবং পরের বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন। (২) রসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের মধ্যে কাউকেও এ সম্পর্কে অবহিত করেননি, বরং তাদের ভ্রান্তভাবে প্রভাবিত করেছেন যে, এই সফরেই মক্কায় প্রবেশ করা হবে। সাহাবীগণ যখনই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলেন এবং হযরত উমার (রা)–র মত প্রভাবশালী সাহাবী বলতে বাধ্য হলেন যে, আপনি তো আমাদের বলেছিলেন যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করব এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করব। এর দ্বারা কি নবী (স)–এর বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপিত হয় না যে, তিনি সাহাবীদের ধোঁকা দিয়েছেন?

উত্তরঃ একথা কোথায় পাওয়া গেল যে, মহানবী (স) এই ধারণা দিয়েছিলেন? এটা তো কতিপয় লোক নিজ থেকে মনে করেছিল যে, এ বছর উমরা অনুষ্ঠিত হবে। স্বয়ং ডকটর সাহেব উপরে আমার যে কথা উধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (স)–এর নিকট যখন বলা হলঃ "আপনি কি আমাদের খবর দেননি যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করব এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব" তখন মহানবী (স) তাদের উত্তর দেন "আমি কি বলেছিলাম যে, এই সফরেই তা হবে?" সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, স্বয়ং মহানবী (স) বাস্তবিকই যদি লোকদের এই ধারণা দিয়ে থাকতেন যে, এই সফরেই উমরা অনুষ্ঠিত হবে তাহলে তিনি তাদের অভিযোগের জবাবে একথা কিভাবে বলতে পারেন?

এ প্রসংগে পাঠকগণ অত্র পুস্তকের (১২১–২২ পৃষ্ঠায় উর্ধ্ব) পূর্বেকার এ সম্পর্কিত আলোচনা বের করে পড়ে দেখুন যে, আসল বক্তব্য কি ছিল এবং তাকে দুমড়ে মুচড়ে কি বানানো হচ্ছে। মহানবী (স) স্বপ্নে দেখনে যে, তিনি মক্কা মুআজ্জমায় প্রবেশ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের নিকট হুবহু বর্ণনা করেন এবং তাদের সাথে নিয়ে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। এ অবস্থায় তিনি একথাও বলেন না যে, উমরা এবছর অনুষ্ঠিত হবে এবং এও বলেন না যে, উমরা এ বছর হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ সম্পর্কে 'ভুল ধারণা দেয়া' অথবা ধোঁকা দেয়ার অপবাদ কি করে আরোপিত হতে পারে? মনে করুন একজন সেনাপতিকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সরকার একটি অভিযানে সেনাবাহিনী সহ রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। সেনাপতির জানা আছে যে, এই সফরে উক্ত অভিযান অনুষ্ঠিত হবে না, বরং পরে কোন এক সফরে অনুষ্ঠিত হবে এবং আসল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পথ পরিষ্কার করার জন্য এই অভিযান প্রেরিত হচ্ছে। কিন্তু সেনাপতি সৈনিকদের নিকট তা প্রকাশ করেন না এবং শুধু এতটুকু বলেন যে, আমাকে এই অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন উপরোক্ত কথার কি এরূপ অর্থ করা যেতে পারে যে, সেনাপতি তার সৈনিকদের ধোঁকা দিয়েছে? একজন সেনাপতির জন্য বাস্তবিকই কি এটা জরুরী যে, সরকারের সামনে যে পরিকল্পনা রয়েছে তা প্রথম থেকেই সৈনিকদের সামনে পুরাপুরি তুলে ধরতে হবে এবং একথার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, এই পরিকল্পনার কথা ফাস হয়ে গেলে সৈনিকদের মনোবলের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে? সেনাপতি যদি সৈনিকদের নিকট না বলে যে, এই সফরে উদ্দিষ্ট অভিযান সফল হবে এবং একথাও না বলে যে, এই সফরে তা বাস্তবায়িত হবে না তবে শেষ পর্যন্ত কোন্ আইনের বলে এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা যেতে পারে?

অভিযোগঃ আল্লাহ তাআলা যখন নবী (স)-কে পূর্বেই বলে রেখেছিলেন যে, ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াবে তখন সাহাবীদের জিজ্ঞেস করার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের একথা বলার কি প্রয়োজন পড়ল যে, "আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মুসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে?" এ থেকে তো প্রতিভাত হয় যে, (মাআযাল্লাহ) স্বয়ং নবী (স) সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন যে, না জানি আল্লাহ আমাকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন নাকি এমনিই বলেছেন যে, মক্কা চলে যাও, তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। এই সংশয় দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তাআলাকে পুনরায় নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়েছে যে, আপনি অস্থির হবেন না, আমরা সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছি, আপনি অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন।

উত্তরঃ অভিযোগ দায়েরের উল্লাসে ডকটর সাহেব আত্মহারা হয়ে গেছেন যে, "তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে" এই সম্বোধন রসূলুল্লাহ (স)-কে নয়, বরং মুসলমানদের করা হয়েছে। لَتَدْخُلُنَّ বহুবচনের ক্রিয়াপদ। হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মহানবী (স)-এর সাথে যেসব সাহাবী এসেছিলেন তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আমরা আমাদের রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছি, তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

অভিযোগঃ "আপনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নবী (স)-এর উপর মিথ্যার যে অপবাদ আরোপিত হয় তা আপনার জন্য কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। আপনি তো নিজের মিথ্যা কথনের বৈধতার সপক্ষে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে নবী (স)-ও কেবল মিথ্যা বলার অনুমতিই দেননি, বরং তাকে অপরিহার্য বলেছেন।"

উত্তরঃ মিথ্যার বেসাতি করে সাফাই গাওয়া আর কি। হাদীস অস্বীকারকারীরা মিথ্যা অপপ্রচারে এখন এতটা বেপরোয়া হয়ে গেছে যে, এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে তার মুখের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপেও ভুল করে না। তারা কি তাদের অভিযোগের সপক্ষে আমার কোন বক্তব্য পেশ করতে পারে যে, "এরূপ ক্ষেত্রে স্বয়ং নবী (স)-ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার শুধু অনুমতিই দেননি, বরং তা অপরিহার্য বলেছেন?" মূলত আমি আমার একটি প্রবন্ধে যে কথা বলেছি তা এই নয় যে, "এরূপ ক্ষেত্রে" মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বৈধ বা অপরিহার্য, বরং তা এই যে, যেখানে সত্যভাষণ কোন ভয়ংকর যুলুমের সহায়ক হতে পারে এবং সেই যুলুম প্রতিরোধের জন্য প্রকৃত ঘটনার পরিপন্থী বক্তব্য প্রদান ছাড়া উপায় থাকে না, সেখানে সত্য বলা অপরাধ হবে এবং অপরিহার্য প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনার পরিপন্থী কথা বলা কোন কোন

অবস্থায় বৈধ এবং কোন কোন অবস্থায় অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আমি সেই প্রবন্ধে এর একটি উদাহরণও পেশ করেছিলাম। মনে করুন, কাফের সৈন্যবাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ চলছে এবং আপনি শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। এখন শত্রুবাহিনী আপনার নিকট জানতে চাচ্ছে যে, আপনার বাহিনী কোথায় কোথায় কত সংখ্যায় অবস্থান নিয়েছে, আপনাদের গোলাবারুদের ডিপো কোথায় অবস্থিত এবং এধরনের অন্যান্য সামরিক গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করে। এখন আপনি বলুন যে, সত্য কথা বলে আপনি কি আপনার বাহিনীর যাবতীয় তথ্য ফাঁস করে দেবেন? এর বিরুদ্ধে ডকটর সাহেবের আপত্তি থাকলে তিনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে এর সুস্পষ্ট জবাব দিন।

অভিযোগঃ আপনি তো এতটা উদ্ধত ও অশালীন হয়েছেন যে, একথা বলতে গিয়েও লজ্জাবোধ করেননি যে–রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যতক্ষণ করায়ত্ব করা যায়নি, ততক্ষণ নবী (স) মানুষের সমানাধিকারের শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব হয়ে যায় তখন এই উপদেশ বাণী (পদদলিত করে) তাকের উপর রেখে দিয়ে নবী (স) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নিজের বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন।

উত্তরঃ মুখের উপর মিথ্যা অপবাদের এটা আরেকটি উদাহরণ। আমার যে প্রবন্ধের অবয়ব বিকৃত করে আমারই সামনে পেশ করা হচ্ছে তাতে একথা বলা হয়েছিল যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহকে বাস্তবে কার্যকর করা অন্ধকার ও অনিশ্চিত পন্থায় সম্ভব নয়, বরং কোন মূলনীতিকে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা কার্যকর করার জন্য পরিবেশ অনুকূল কি না। যদি পরিবেশ অনুকূল না হয় তবে প্রথমে তা অনুকূল বানানোর চেষ্টা করতে হবে। অতপর তা কার্যকর করতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইসলামের সাম্যনীতির দাবী যদিও এই ছিল যে, অন্যান্য সকল পদের মত খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ ছিল এবং সেই যোগ্য লোকটি কোন্ গোত্রভূক্ত সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা উচিৎ ছিল না। কিন্তু মহানবী (স) যখন লক্ষ্য করেন যে, খিলাফতের ব্যাপারে উক্ত নীতি কার্যকর করার জন্য আরবের পারিপার্শিক অবস্থা এখনও অনুকূল হয়নি এবং কুরাইশ বংশ বহির্ভূত কোন লোককে খলীফা নিয়ুক্ত করলে সূচনাতেই ইসলামী খিলাফত অকৃতকার্য হওয়ার আশংকা রয়েছে, তখন তিনি উপদেশ দেন যে, কুরাইশ বংশ থেকেই খলীফা নির্বাচিত হবে। ডকটর সাহেব এ কথার যে বিকৃত অর্থ করেছেন তা প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পারেন।

৪৮. نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ - **আয়অতের তাৎপর্য**

অভিযোগঃ সূরা তাহ্‌রীমের আয়াত আপনি এভাবে পেশ করেছেনঃ "মহানবী (স) তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে এক স্ত্রীর নিকট সংগোপনে একটি কথা বলেন। তিনি তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেন। মহানবী (স) এজন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আমি অন্যদের কাছে তা বলে দিয়েছি? মহানবী (স) উত্তর দেন, نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ - (আমাকে মহাজ্ঞানী এবং সার্বিক ব্যাপারে জ্ঞাত সত্তা অবহিত করেছেন)।

অতপর আপনি জিজ্ঞেস করেছেনঃ "বলুন কুরআন পাকে সেই আয়াত কোথায় যার সাহায্যে আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে অবহিত করেছিলেন যে, তোমার স্ত্রী তোমার গোপন কথা অন্যদের নিকট বলে দিয়েছে? যদি তা কুরআনে না থেকে থাকে তবে প্রমাণিত হল কি না যে, আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদ ছাড়াও মহানবী (স)-এর নিকট বাণী প্রেরণ করতেন?"

প্রথমে তো বলুন, নবী (স) যখন বলেনঃ আমাকে "আল-আলীম ও আল-খাবীর" অবহিত করেছেন, তখন এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হল যে, মহানবী (স) বলেছিলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা খবর দিয়েছেন? এর অর্থ এই নয় কি যে, নবী (স)-কে সেই ব্যক্তি অবহিত করেছেন যিনি এই গোপন কথা জানতে পেরেছিলেন? তবুও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আল-আলীম আল-খাবীর বলতে এখানে আল্লাহ তাআলাই। কিন্তু এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ তাঅলা ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ দিয়েছিলেন? যে ব্যক্তি সামান্য গভীর দৃষ্টিতে কুরআন করীমের অধ্যয়ন করেছে তার সামনে এই সত্য গোপন নয় যে, কারো জ্ঞানকে যখন আল্লাহ্ তাআলা নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেন তখন তার অর্থ (অবশ্যই) ওহীর মাধ্যমে জ্ঞানদান নয়। যেমন সূরা মাইদায় আছেঃ

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ -

"আর যা তোমরা শিকারী পশুকে শিখাও তা সেই জ্ঞানের সাহায্যে শিখাও যা আল্লাহ তোমাদের শিখিয়েছেন"-(আয়াত নং ৪-৫)।

বলুন, এখানে কি عَلَّمَكُمُ اللَّهُ - -এর অর্থ এই যে, আল্লাহ শিকারী পশুদের প্রশিক্ষণদানকারীদের ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দেন যে, তোমরা এসব পশুকে এভাবে শিকার শিক্ষা দাও? অথবা عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ অথবা— عَلَّمَ بِالْقَلَمِ এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে তার অজানা যা কিছু, তা ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং হাতে কলমে

শিক্ষা দেন? এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জ্ঞানদান বা নির্দেশদান করার অর্থ যেমন ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ বা নির্দেশ প্রদান নয়, তদ্রূপ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ –এর অর্থও ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা নয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেভাবে তথ্য অবগত হওয়া যায় ঠিক সেভাবেই নবী (স) উপরোক্ত তথ্যের জ্ঞান লাভ করেন।

উত্তরঃ খুলে দেখুন। সূরা তাহ্‌রীম–এর যে আয়াতকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা করা হচ্ছে সেখানে তার সম্পূর্ণটা উর্ধৃত করা হয়েছে। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে– أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ("আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন" তাই نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ "আমাকে আল–আলীম আল–খাবীর অবহিত করেছেন" বলতে আল্লাহ তাআলাই হতে পারেন, অন্য কোন তথ্যপ্রদানকারী হতে পারে না। উপরন্ত আল–আলীম ও আল–খাবীর শব্দদ্বয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ যদি খবর দিয়ে থাকত তবে রসূলুল্লাহ (স) বলতেন نَبَّأَنِي خَبِيرٌ (এক সংবাদদাতা আমাকে অবহিত করেছে)।

রসূলুল্লাহ (স) যদি সাধারণ মানবীয় তথ্যমাধ্যমে একথা অবহিত হয়ে থাকতেন তবে এই সামান্য বিষয়টি এক স্ত্রী তাঁর গোপন কথা অন্য কারো কাছে বলে ফেলেছেন এবং কোন তথ্য প্রদানকারী তা তাঁকে অবহিত করেছেন, মূলতই কুরআনে উল্লেখিত হত না, আর তা এভাবে বর্ণনা করাও হত না যে, "আল্লাহ তাআলা নবীকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন" এবং "আমাকে মহাজ্ঞানী ও মহাসংবাদদতা অবহিত করেছেন"। কুরআন মজীদে উপরোক্ত ঘটনা এভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য তো ছিল লোকদের সতর্ক করে দেয়া যে, তোমাদের ব্যাপারসমূহ কোন সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সেই রসূলের সাথে যাঁর পেছনে আল্লাহ্‌র মহান শক্তি সক্রিয় রয়েছে।

৪৯. হযরত যয়নব (রা)—র বিবাহ আল্লাহ্‌র হুকুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না?

অভিযোগঃ আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহ তাআলা যে নবী (স)–কে হুকুম দিয়েছিলেন, যায়েদের স্ত্রীকে বিবাহ কর, তা কুরআনের কোথায় উল্লেখ আছে? প্রথমে দেখুন, আপনি লিখেছেন যে, নবী (স) "আল্লাহর নির্দেশে" এই বিবাহ করেছিলেন। অথচ আয়াতে শুধুমাত্র এতটুকু আছে যে, زَوَّجْنَاكَهَا যার অনুবাদ আপনি এভাবে করেছেন "আমরা এই মহিলার বিবাহ তোমার সাথে দিলাম"। যেমন আমি ইতিপুর্বে বলেছি, কুরআন করীমের বাচনভংগি এই

যে, যেসব কথা আল্লাহ তাআলার বলে দেয়া কায়দা-কানূন অনুযায়ী বলা হবে তা আল্লাহ নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেন, চাই তা যার মাধ্যমেই প্রকাশ পাক। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আল-আনফালে যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ "তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি, বরং আল্লাহ হত্যা করেছেন"-(১৭ নং আয়াত)। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, এই হত্যাকান্ড মুমিনদের হাতে সংঘটিত হয়েছে। زَوَّجْنَاكَهَا এর অর্থও তদ্রূপ। অর্থাৎ মহানবী (স) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই বিবাহ করেন। সেই বিধান এই ছিল যে, তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ - ("তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণকে"-সূরা নিসাঃ ২৩)। আর মুখডাকা পুত্র যেহেতু ঔরসজাত পুত্র হতে পারে না, তাই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম হতে পারে না, বরং জায়েয। মহানবী (স) আল্লাহ্‌র এই হুকুম অনুযায়ী হযরত যায়েদ (রা)-র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন।

উত্তরঃ হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টির সামনে তো কুরআন থেকে শুধুমাত্র নিজেদের মতলব খুজে বের করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিষয়টি যারা হৃদয়গংম করতে চান তাদের নিকট আমি আবেদন করব যে, অনুগ্রহপূর্বক তারা যেন সূরা আল-আহ্‌যাবের প্রথম চারটি আয়াত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, অতপর পঞ্চম রুকূর সেই আয়াতগুলোও যেন দেখে নেন যেখানে হযরত যায়েদ (রা)-র তালাকপ্রাপ্তার সাথে মহানবী (স)-এর বিবাহের প্রসংগ উল্লেখিত আছে। প্রথম চারটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের দ্বারা দমে যেও না। আর আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সেই ওহীর অনুসরণ কর যা তোমার উপর নাযিল করা হচ্ছে। মুখডাকা (পালক) পুত্র কখনও ঔরসজাত পুত্র নয়। এটা শুধু একটি কথা যা তোমরা মুখে প্রকাশ কর। আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মধ্যে পরিষ্কার ইংগীত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুই নম্বর আয়াতে যে ওহীর উল্লেখ করা হয়েছে মুখডাকা পুত্রের সাথে তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য স্বয়ং মহানবী (স)-কে মুখডাকা পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করার হুকুম করা হয়েছিল কিনা উক্ত আয়াতে তার কোন ব্যাখ্যা নাই। অতপর ৩৭-৩৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে দেখুনঃ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُوْلًا - مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ سُنَّةَ
اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ـ
الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا
اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

"অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।"

এই গোটা বক্তব্যের উপর গভীরভাবে চিন্তা করুন। এই বক্তব্য ও এই প্রকাশভংগী একথা কি বলে দিচ্ছে যে, মহানবী (স) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একটি কাজ করেছিলেন, তাই আল্লাহ তাআলা এই কাজ নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন? নাকি পরিষ্কারভাবে একথা বলে দিচ্ছে যে, এই বিবাহের জন্য আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুখডাকা পুত্রদের স্ত্রীগণ ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের মত হারাম থাকবে না? সাধারণ লোকদের জন্য তো এ ধরনের পুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সাথে বিবাহ শুধু জায়েয ছিল কিন্তু মহানবী (স)-এর জন্য তা ফরয করা হয়েছিল, এবং এই ফরয রিসালাতের দায়িত্বের অংশভুক্ত ছিল যার বাস্তবায়ন করতে মহানবী (স) আদিষ্ট ছিলেন। এরপর ডকটর সাহেবের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং নিজেই অনুমান করুন যে, এই লোকেরা বাস্তবিকই কি কুরআনের অনুসারী না কুরআনকে তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের অনুসারী বানাতে চায়?

৫০. بِاِذْنِ اللّٰهِ এর অর্থ কি প্রচলিত রীতিনীতি না আল্লাহর নির্দেশ?

অভিযোগঃ পঞ্চম আয়াত আপনি এই পেশ করেছেন যে, নবী (স) বানূ নাদীর -এর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার সময় আক্রমণের উদ্দেশ্যে রাস্তা

পরিষ্কার করার জন্য আশপাশের অনেক গাছপালা কেটে ফেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ -

"খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছ এবং যেগুলো কান্ডের উপর অবশিষ্ট থাকতে দিয়েছ–এই উভয় কাজই আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ছিল"–(সূরা হাশরঃ ৫)।

এই প্রসংগে আপনি জিজ্ঞেস করছেন, "আপনি কি বলতে পারেন যে, এই অনুমতি কুরআন করীমের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল?"

সূরা হজ্জের যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا "যেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে"–(সূরা হজ্জঃ ৩৯)।

উপরোক্ত আয়াতে ঈমানদার সম্প্রদায়কে যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধের এই নীতিগত অনুমতির মধ্যে (নীতি ও আইনের আলোকে) যুদ্ধের জন্য আবশ্যকীয় প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কথা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে তাকে কুরআন بِإِذْنِ اللَّهِ বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন– وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ "উভয় দল সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার দিন তোমাদের যা কিছু বিপদ এসেছিল তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই ছিল"–(সূরা আল–ইমরানঃ ১৬৫)। চাই সে বিধান বিশ্বজগতের বাইরে কার্যকর থাক না কেন।

উত্তরঃ এই সম্পূর্ণ আলোচনা আমার যুক্তির কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়ে করা হয়েছে। আমি লিখেছিলাম, মুসলমানগণ যখন একাজ করেছিল তখন বিরুদ্ধবাদীরা অপপ্রচার করল যে, বাগানের আংগুর ও ফলবান বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলে তারা পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে (দ্র. অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ১২৪, উর্দূ)। এটা ছিল আমার যুক্তির মূল ভিত্তি যা ডকটর সাহেব উদ্দেশ্যমূলকভাবে হটিয়ে দিয়ে নিজের বিতর্কের পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আমার যুক্তি ছিল এই যে, ইহূদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর একটি সুনির্দিষ্ট অপবাদ আরোপ করে। তারা বলত যে, এরা সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং দাবী করছে, আমরা পৃথিবীর বুক থেকে অনাচারের মূলোৎপাটনকারী, কিন্তু এখন দেখে নাও এরা পৃথিবীর বুকে কেমন অনাচার সৃষ্টি করছে। এর উত্তর যখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া হল যে, মুসলমানরা আমার অনুমতি

সাপেক্ষে এ কাজ করেছে তখন এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের অভিযোগের জবাব সাব্যস্ত হতে পারে এই অবস্থায় যে, যখন এ কাজের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অনুমতি এসে থাকবে। পৃথিবীতে যুদ্ধের যে সাধারণ নীতি প্রচলিত ছিল তা জওয়াবের ভিত্তি হতে পারত না। কারণ সেই যুগে সামরিক নীতিমালা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল পাশবিক ও যুলুমভিত্তিক এবং মুসলমানরা স্বয়ং তাকে পৃথিবীর বুকে বিপর্যয়ের নামান্তর মনে করত। অভিযোগকারীদের উত্তরে এর আশ্রয় কিভাবে লওয়া যেত। এখন প্রকৃতিগত বিধান সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে তার বরাত দেয়া তো বাহ্যতই হাস্যকর হত। কোন ব্যক্তি বুদ্ধিজ্ঞান থাকলে সে কখনও ধারণাই করতে পারত না যে, এ স্থানে বিরুদ্ধবাদীরা যখন মুসলমানদের পৃথিবীর বুকে অনাচার সৃষ্টিকারী মনে করে থাকত, তবে আল্লাহ তাআলা প্রতিউত্তরে বলে থাকতেন যে, মিয়া! প্রাকৃতিক বিধান তো এই। ডকটর সাহেব কুরআন মজীদ থেকে এখানে যে কয়টি উদাহরণ পেশ করেছেন তা থেকে যা কিছু প্রতীয়মান হয় তা এই যে, সুন্নাত অস্বীকারকারীরা কুরআন বুঝতে সম্পূর্ণ অপারগ। তারা কুরআনিক আয়াতের পারস্পয, পূর্বাপর সম্পর্ক, স্থান ও পেক্ষাপট থেকে চোখ বন্ধ করে স্বাধীনভাবে এক স্থানের আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অন্য স্থানের আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করে ফেলে।

৫১. আরও একটি মনগড়া ব্যাখ্যা

অভিযোগঃ ষষ্ঠ যে আয়াত আপনি পেশ করেছেন তা হলোঃ

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ..... وَيُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ـ

"আর আল্লাহ যখন তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, দুই দলের (অর্থাৎ ব্যবসায়ী কাফেলা এবং কুরাইশ সৈন্যবাহিনী) মধ্যে একটি তোমাদের করায়ত্ব হবে এবং তোমরা চাচ্ছিলে যে, শক্তিহীন দলটি (ব্যবসায়ী কাফেলা) তোমাদের হস্তগত হোক। অথচ আল্লাহ তাঁর কলেমার দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখাতে এবং কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিতে চাচ্ছিলেন"–(সূরা আনফালঃ ৭)।

অতপর আপনি জিজ্ঞেস করছেন, "আপনি কি সমগ্র কুরআন মজীদে একটি আয়াত দেখাতে পারবেন যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার কথা ব্যক্ত হয়েছিলঃ হে লোকেরা যারা মদীনা থেকে বদরের দিকে যাচ্ছ আমরা দুই দলের মধ্য থেকে একটি দল তোমাদের আয়ত্বে এনে দেব?"

নীতিগতভাবে এটা ছিল সেই পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জামাআতকে বলেছিলেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফতের পদে আসীন করা হবে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল জয়যুক্ত থাকবেন, বিজয় ও অবরোধ আল্লাহর দলভুক্তদের অনুকূলে থাকবে, মুমিনগণ সমুন্নত থাকবে। আল্লাহ কখনও মুমিনদের উপর কাফেরদের বিজয়ী করবেন না। মুজাহিদগণ বিরুদ্ধবাদীদের ধনসম্পদ ও মালিকানার অধিকারী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই বিশেষ ঘটনায় এই "ওয়াদা" এক স্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে–যার ব্যাখ্যা কুরআন করীম এভাবে করেছে যে,

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ- –অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটি দল ছিল অস্ত্রহীন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত মনে হচ্ছিল।

আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, যেসব কথা প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল আল্লাহ তাআলা তাও নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেন। আল্লাহ্র উপরোক্ত দুটি প্রতিশ্রুতিও এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। অর্থাৎ পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে যে, আলোচ্য দুটি দলের মধ্যে একটির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ছিল নিশ্চিত।

উত্তরঃ এখানেও পূর্বাপর সম্পর্ক এবং স্থান–কাল উপেক্ষা করে নিপুণতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা চলছে। একদিকে কাফের সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রে সজ্জিত হয়ে মক্কা থেকে রওনা হয়ে আসছে এবং তাদের সামরিক শক্তি ছিল মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী। অপরদিকে সিরিয়া থেকে কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলা প্রত্যাবর্তন করছিল, যাদের সাথে ছিল প্রচুর পণ্য এবং নামমাত্র সামরিক শক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ স্থানে আমরা মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, দুটি দলের মধ্যে যে কোন একটির বিরুদ্ধে তোমরা জয়যুক্ত হবেই। এটা ছিল পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট একটি প্রতিশ্রুতি, যা দুটি নির্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি সম্পর্কে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ডকটর সাহেব তার দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দান করেন। একটি এই যে, উক্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা পৃথিবীতে শাসকের পদে আসীন করা এবং পরিপূর্ণ প্রতিপত্তির স্বাভাবিক ওয়াদা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি তাই বুঝানো হত তবে উভয় দলের উপর বিজয়ী হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকত, দুটির মধ্যে একটির উপর নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তিনি এই করেন যে, সেই সময়ের পরিস্থিতি বলছে যে, দুটি দলের মধ্যে একটির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ছিল নিশ্চিত এবং পরিস্থিতির এই নিদর্শনকে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রতিশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। অথচ বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পূর্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা

বলছে যে, ব্যবসায়ী কাফেলার উপর নিয়ন্ত্রণলাভ তো নিশ্চিত, কিন্তু কুরাইশ বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং বলছেন যে, কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাওয়াকালীন মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছিল তা এই যে كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ - "তাদের যেন চাক্ষুস মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল"–(সূরা আনফালঃ ৬)।

এটা কি সেই পরিস্থিতি যা বলছিল যে, কুরাইশ বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কাফেলার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মতই নিশ্চিত? এ ধরনের নিপুণতার মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী এই দলটি কুরআন থেকে নিজেদের মতবাদ গড়ে না, বরং কুরআনের উপর তাদের কল্পিত মতবাদ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কুরআনের বাক্যসমূহ তাদের মতবাদকে যতই প্রত্যাখ্যান করুক না কেন।

৫২. উল্টাপাল্টা জবাব

অভিযোগঃ সবশেষে আপনি যে আয়াত পেশ করেছেন তা এই যে,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ -

"তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনার জবাবে বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য অব্যাহতভাবে এক হাজার ফেরেশতা পাঠাব"–(সূরা আনফালঃ ৯)।

অতপর আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, "আপনি কি বলতে পারেন যে, মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনার এই জওয়াব কুরআনের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল?"

আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা যখন বললেন– أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - ("আমি প্রত্যেক আবেদনকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে"–(সূরা বাকারাঃ ১৮৬); তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জওয়াব কোন্ লিখিত দলীলের মাধ্যমে পাওয়া যায়? যে পন্থায় প্রত্যেক প্রার্থনাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রার্থনার জওয়াব পেয়ে থাকে ঠিক সেই পন্থায় ঈমানদারদের জামাআত তাদের প্রার্থনার জওয়াব পেয়েছিল। কিন্তু যারা আল্লাহর

প্রতিটি কথা কাগজে মুদ্রিত পেতে চায়, প্রার্থনার জওয়াব তাদের নজরে কিভাবে পতিত হবে?

উত্তরঃ প্রশ্ন কি আর তার উত্তর কি! আমার প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের প্রার্থনার জবাবে এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর যে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতির উল্লেখ এ আয়াতে করেছেন তা কুরআনের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল। ডকটর সাহেব উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রত্যেক প্রার্থনাকারী যে পন্থায় তার প্রার্থনার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয় ঠিক সেই পন্থায় বদরের প্রান্তরে মুসলমানগণও তাদের প্রার্থনার জবাব লাভ করেছিল। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রত্যেক প্রার্থনাকারীই কি আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ সুস্পষ্ট জওয়াব পেয়ে থাকে যে, তোমার সাহায্যের জন্য এত এত হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে? সুনির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখপূর্বক পরিষ্কার ভাষায় এই জওয়াবের কথাও কি আল্লাহ্র কিতাবে লিখিত পাওয়া যায়?

এখানে আরও একটি অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক কথাও লক্ষণীয় যে, আমাদের উপর "আল্লাহর প্রতিটি কথা কাগজে লিখিত পেতে চাই" এরূপ অপবাদ এমন লোকেরা আরোপ করছে যারা জেদ ধরে বসে আছে যে, যেসব ওহী লিখিত আকারে আছে আমরা শুধু তাই মানব।

৫৩. অক্ষরশূন্য ওহীর ধরন ও বৈশিষ্ট্য

অভিযোগঃ আপনি সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, "ওহী অপরিহার্যরূপে শব্দসমষ্টির আকারেই হয় না, তা একটি ধারণার আকারেও হতে পারে যা অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়।" আপনার দাবী তো সবজান্তার, অথচ এতটুকুও জানা নাই যে, কারো অন্তরে একটি ধারণার উদয় হবে এবং তার বাহন ভাষা হবে না এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন ধারণাই ভাষা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না, আর না কোন ভাষা ধারণা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। বিশেষজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করুন, "ভাষাশূন্য ওহীর" "অর্থহীন সমাচার"-এর তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের জানা নাই যে, ধারণা ও শব্দের রূপায়ন উভয়ই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যেও স্বতন্ত্র এবং তা একত্রেও সংঘটিত হয় না। মানবীয় মেধা কোন ধারণাকে ভাষায় রূপ দিতে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগই সময় নিক না কেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে ধারণার উদয় হওয়া এবং মন তাকে ভাষায় রূপ দিতে সময়ের ক্রমধারা অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, মানুষের মনে অবশ্যই ভাষার আকারেই ধারণার উদয় হয় তবে সে একথার কি ব্যাখ্যা দিবে যে, একই ধারণা ইংরেজের মনে ইংরেজী ভাষায়,

আরবদের মনে আরবী ভাষায় এবং আমাদের মনে আমাদের ভাষায় কেন উদিত হয়? অতএব এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানব মনে প্রথমে একটি ধারণা এককভাবে উদিত হয়, অতপর মেধাশক্তি তাকে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে। একাজটি খুব দ্রুততার সাথে সংঘটিত হয়, কিন্তু যেসব লোকের কখনও চিন্তা করে বলা অথবা লেখার সুযোগ হয়েছে তারা জানে যে, কখনও কখনও মনের মধ্যে একটি ধারণা ঘুরপাক খেতে থাকে এবং তা ভাষায় ব্যক্ত করতে মেধাশক্তির যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। তাই একথা কেবলমাত্র এক আনাড়ীই বলতে পারে যে, ধারণা বাক্যের আকারেই উদিত হয় অথবা ধারণা ও ভাষা অপরিহার্যরূপে একসাথেই উপস্থিত হয়। ওহীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি এই যে, আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে কেবলমাত্র একটি ধারণা নবীর অন্তরে ঢেলে দেয়া হয় এবং নবী নিজে তা ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই প্রকারের ওহী গায়র মাতলূ হওয়ার কারণ এই যে, এর ভাষা না আল্লাহর তরফ থেকে প্রদান করা হয়, আর না নবী তা বিশেষ শব্দসমষ্টির মাধ্যমে লোকদের পর্যন্ত পৌছাতে আদিষ্ট হন।

৫৪. ওহী মাতলূ ও ওহী গায়র মাতলূর মধ্যে পার্থক্য

অভিযোগঃ আপনি বলেছেন, "আরবী ভাষায় ওহী শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ইংগীত।" ওহীর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই, এর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কেই প্রশ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম প্রাপ্ত হতেন। এই ওহীর শুধু "সূক্ষ্ম ইংগীত"–ই কি আল্লাহর পক্ষ থেকে হত না এর শব্দ সমষ্টিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হত? শুধু ইশারাই যদি হত তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের ভাষা ছিল স্বয়ং নবী (স)–এর নিজস্ব।

উত্তরঃ এর জওয়াব ৩৫ নম্বর আলোচনায় বর্তমান রয়েছে, যার এক–দুইটি অংশ নিয়ে ডকটর সাহেব এই বিতর্কের অবতারণা করেছেন। কুরআন করীমের শব্দসমষ্টি ও তার বিষয়বস্তু উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার এবং মহানবী (স)–এর উপর তা এজন্য নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নাযিলকৃত ভাষায় তা লোকদের নিকট পৌছাবেন। তাই এটাকে ওহী মাতলূ বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহী অর্থাৎ ওহী গায়র মাতলূ তার ধরন, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে পূর্বোক্ত ওহী হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা রসূলুল্লাহ্ (স)–কে পথনির্দেশ দেয়ার জন্য আসত এবং লোকদের নিকট তা আল্লাহ্ তাআলার ভাষায় নয়, বরং মহানবী (স)–এর সিদ্ধান্ত, বক্তব্য ও কর্মের আকারে পৌছত। যদি কোন ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় যে, মহানবী (স)–এর নিকট প্রথমোক্ত শ্রেণীর ওহী আসতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত তার এটা স্বীকার করতে কি প্রতিবন্ধকতা আছে

যে, সেই নবীর নিকট শেষোক্ত শ্রেণীর ওহীও আসতে পারে? কুরআনের মুজিযাসুলভ বাণী আমাদের যদি এই নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে যে, এটা আল্লাহ পাকেরই কালাম হতে পারে, তবে কি রসূলুল্লাহ (স)–এর মুজিযাসুলভ জীবন এবং তাঁর মুজিযাপূর্ণ কার্যাবলী আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় না যে, এটাও আল্লাহ তাআলার পথনির্দেশেরই ফল?

৫৫. প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অস্বীকার করা রসূলুল্লাহ (স)—এর আনুগত্য অস্বীকার করার নামান্তর

অভিযোগঃ আপনি বলেছেন, "হাদীসের বর্তমান ভান্ডারের মধ্য থেকে যেসব সুন্নাতের প্রমাণ পাওয়া যায় তা দুটি বৃহৎ শ্রেণীভুক্ত। এক প্রকারের সুন্নাত যার সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উম্মাত ঐক্যমত প্রকাশ করে আসছে। অন্য কথায় এগুলো হচ্ছে মুতাওয়াতির সুন্নাত। এর উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কোন একটি সুন্নাত মান্য করতে যে কোন ব্যক্তিই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে সে ঠিক সেইভাবে ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে যায়, যেভাবে কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত অস্বীকার করলে ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাত, যার প্রামাণ্যতা সম্পর্কে মতভেদ আছে অথবা হতে পারে। এই প্রকারের সুন্নাতের কোন একটি সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তার তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে অমুক সুন্নাত প্রামাণ্য নয়, তাই সে তা মানতে বাধ্য নয়, তবে তার এই কথায় তার ঈমানের উপর কোন আঘাত আসবে না।"

আপনি কি বলবেন, আল্লাহ তাআলা কোথায় একথা বলেছেন, যে ব্যক্তি এই মুতাওয়াতির সুন্নাত মানতে অস্বীকৃতি জানাবে, যার উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে কাফের হয়ে যাবে? আর যে ব্যক্তি বিতর্কিত সুন্নাত অস্বীকার করবে তার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (স)–এর আনুগত্য ও অনুবর্তন করা বা না করাকে ইসলাম ও কুফরের মধ্যেকার সীমারেখা সাব্যস্ত করেছেন। অতএব যেখানে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, মহানবী (স) অমুক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অমুক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন অথবা অমুক বিষয়ে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আনুগত্য প্রত্যাহার অবশ্যম্ভাবীরূপে কুফরীর কারণ হবে। কিন্তু যেখানে মহানবী (স)–এর কোন নির্দেশের সপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না যায়, সেখানে নিম্নতম পর্যায়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা

বা না করার বিষয়ে মতভেদ হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি দুর্বল সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে বলে যে, এই হুকুমের সপক্ষে মহানবী (স)–এর নিকট থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই আমি এর অনুসরণ করি না, তবে তার এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং সঠিক হোক অথবা ভুল তাতে কুফরীতে পতিত হওয়ার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, এটা রসূলুল্লাহ (স)–এর নির্দেশ হলেও আমি তা মানতে বাধ্য নই, বা তা আমার জন্য কোন দলীল নয়, তবে এই ব্যক্তির কাফের হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এটি একটি সম্পূর্ণ সোজা ও পরিষ্কার কথা, যা হৃদয়ংগম করতে কোন ব্যক্তির মধ্যেই জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে না।

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়

[পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব মুহাম্মাদ শফীর যে রায়টির অধিকাংশের অনুবাদ[১] নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে তা মূলত একটি আপিল মামলার রায়। এর মূল বক্তব্য বিষয় ছিলঃ কোনো বিধবা নারী তার নাবালক সন্তানদের বর্তমানে যদি এমন কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যে তার সন্তানদের মুহরিম নয় তবে এই অবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য সেই সন্তানদের অভিভাকত্বের দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে কি না? এই বিতর্কিত বিষয়ে রায় প্রদান করতে গিয়ে বিজ্ঞ বিচারপতি বিস্তারিতভাবে একটি মৌলিক বিষয়ের উপরও নিজের মত ব্যক্ত করেন। তা এই যে, ইসলামে আইনের ধারণা ও রূপরেখা এবং আইন প্রণয়নের পদ্ধতি কি, কুরআনের সাথে হাদীসকেও মুসলমানদের জন্য আইনের উৎস হিসাবে মেনে নেয়া যায় কি না এবং বিশেষত পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হানাফী ফিক্‌হ্‌-এর নীতিমালার কতটা অনুসারী মনে করা যেতে পারে? এই প্রসংগে মোকদ্দমার এ রায় ইসলামী আইনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিজের যুক্তি ও আলোচনার আওতায় নিয়ে এসেছে।

এই রায়ের যে অংশ আসল মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট তা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এর মূলনীতিগত যুক্তিসমূহের অনুবাদ এখানে প্রদান করা হচ্ছে। এর কোনো কোনো স্থানে কুরআনের যেসব আয়াত উধৃত করা হয়েছে তা অনুবাদসহ শুধুমাত্র সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। পি, এল, ডি, ১৯৬০ খৃ. লাহোর (পৃ. ১১৪২-১১৭৯) কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজী পাঠের এখানে উর্দূ অনুবাদ করা হয়। মূল ও পূর্ণাংগ আলোচনা পূর্বোক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।-মালিক গোলাম আলী।]

মূল রায়টি ছিলো ইংরেজী ভাষায়। জনাব মালিক গোলাম আলী তার উর্দূ অনুবাদ করেন। রায়ের ইংরেজী কপি সহজলভ্য না হওয়ায় এখানে তার উর্দূ অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

৪. মনে করুন যদি একথা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, অভিভাবক নিয়োগ অত্যাবশ্যক ছিল এবং Guardianship and Words Act-এর ১৭ ধারা এই মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত, তবে যে বিরাট সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে তা এই যে, সেই আইন-বিধান কি যা এক নাবালক মানতে বাধ্য? একথা সম্পূর্ণ সঠিক যে, নাবালকগণ এবং তাদের পিতামাতা মুসলমান এবং মুসলিম আইনের অধীন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয় যে, নাবালকের অভিভাবকত্বের বিষয়ে সে আইন কোন্‌টি যার অনুসরণ অপরিহার্য? প্রায় সমস্ত গ্রন্থাবলীতে যার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ আইনজ্ঞ ও বিচারকদের গ্রন্থাবলী অন্তর্ভুক্ত আছে, এমন আইন-কানূন ও নীতিমালা বর্ণিত আছে, নাবালকদের সত্তা এবং সহায়-সম্পদের অভিভাবকত্বের বিষয়ে, দীর্ঘকাল ধরে ভারত ও পাকিস্তানে অনুসৃত হয়ে আসছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টসহ সমস্ত বিচারালয় বিভাগ-পূর্ব বৃটিশযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কঠোরভাবে এসব আইনের অনুসরণ করে আসছে। এমনও হতে পারে যে, বৃটিশ রাজত্বের পূর্বেকার কাযীগণ এবং আইনজ্ঞগণও এসব নীতিমালার অনুসরণ করে থাকবেন এবং পরেও তার অনুসরণ চলতে থাকে। কারণ ইংরেজগণ অথবা অন্য কোন অমুসলিম জাতি স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী কুরআন পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করুক এবং আইন প্রণয়ন করুক তা মুসলিম আইনজ্ঞগণ পছন্দ করতেন না। মুসলিম আইনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে ফাতওয়া আলমগীরী নামক গ্রন্থের যে গুরুত্ব রয়েছে তা এই সত্যের প্রতি দিকনির্দেশ করে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংক্ষেপে এখানে উল্লেখিত নীতিমালা তুলে ধরা হল।

[এরপর ধারা নং ৪-এর অবশিষ্ট অংশে এবং ৫ ও ৬ নং ধারায় বিজ্ঞ বিচারপতি অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হানাফী, শাফিঈ ও শীআ ফিকহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন]।

৭. যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি, আসল যে প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার দাবী রাখে তা হচ্ছে, এসব বিধিবিধানকে কি কোন প্রকার অকাট্যতার সাথে সে রকম অবশ্য পালনীয় আইন বলা যেতে পারে, যে মর্যাদা রয়েছে কোন গ্রন্থবদ্ধ আইনের? ভিন্নভাবে বলা যায় যে, এটা কি সেই আইন যার অনুসরণ Guardianship and Words Act-এর ১৭ নং ধারায় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী একজন মুসলিম নাবালকের জন্য বাধ্যতামূলক?

৮. মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তারা যে ফেরকার সাথেই সম্পর্কিত হোক না কেন, যে আইন তাদের জীবনের প্রতিটি বিভাগে বলবৎ

হওয়া উচিৎ চাই তা তাদের জীবনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিভাগ হোক, তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র আইন। মহান আল্লাহই সর্বোচ্চ আইনদাতা, মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামে আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানের সম্পর্ক সহজ সরল এবং সরাসরি। কোন নেতা, ইমাম, পীর অথবা অন্য কোন ব্যক্তি (চাই সে জীবিত হোক অথবা মৃত, কবরে হোক অথবা কবরের বাইরে) এই সম্পর্কের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারীর বেশে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমাদের এখানে পেশাদার নেতা বা ধর্মীয় গুরুদের এমন কোন সংস্থা বর্তমান নাই যা নিজের অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়ে এবং আল্লাহর গযবের ইজারাদার সেজে নিজেদের ধ্যানধারণাকে রাজকীয় ভংগীতে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। কুরআন মজীদ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তার আওতায় অবস্থান করে মুসলমানদের চিন্তা ও কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলামে মানসিক ও আত্মিক স্বাধীনতার পরিবেশ বর্তমান রয়েছে। আইন যেহেতু মানবীয় স্বাধীনতার উপরে বাধ্যবাধকতা আরোপকারী শক্তি, তাই আল্লাহ্ তাআলা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পূর্ণরূপে নিজের হাতে রেখেছেন। ইসলামে কোন ব্যক্তির এমনভাবে কাজ করার অধিকার নেই যেন সে অন্যদের নিকট জবাবদিহির উর্ধে। কুরআন ব্যক্তিপূজা ও একনায়কত্ব খতম করে দিতে চায়। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও পূর্ণ সাম্যের শিক্ষা দিয়ে নিজের নৈতিক ব্যবস্থার অধীনে মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছে, চাই সেই প্রাধান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে হোক অথবা জীবনের অন্য কোন শাখায়। গোটা বিশ্বের মুসলমানরা না হলেও অন্তত একটি দেশের মুসলমানদের একই মালায় সুগ্রথিত করে দেয়া অত্যাবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রের এমন লোকের অস্তিত্ব অসম্ভব যে একনায়কসুলভ ও রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার দাবী করতে পারে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের কার্যাবলীও সঠিক অর্থে এই যে, সে আল্লাহর বিধান ও তাঁর ফরমানসমূহ বাস্তবায়িত করবে। কুরআন তথা ইসলাম এক ব্যক্তি কর্তৃক সমস্ত মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়ন করার ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কুরআন মজীদ বারবার ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দুনিয়া ও আখেরাতের শাহানশাহ এবং তাঁর বিধানই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত। ৬ ঃ ৭, ১২ ঃ ৪০ ও ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, শাসনক্ষমতার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। অনুরূপভাবে ৪০ ঃ ১২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ- "সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ্র যিনি সমুন্নত ও মহান।"

একথা ৫৯ ঃ ২৩ আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলার সত্তা।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"–(সূরা হাশরঃ ২৩–২৪)।

৯. মহানবী (স) ও তাঁর চার খলীফার কার্যক্রম একথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, রাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী, অন্যথায় তাদের জন্য নিজেদেরকে মুসলিম জাতির বাদশা হিসাবে ঘোষণা দেয়ার চেয়ে সহজতর কথা আর কিছুই ছিল না। তাঁরা যদি তাই করতেন তবে তাদের দাবী ত্বরিৎ সমর্থন করা হত। কারণ তাদের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা ছিল সন্দেহ সংশয়ের উর্ধে। একথাও নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, তাঁরা নিজেদের ইসলামী দুনিয়ার একনায়ক ও স্বার্বভৌম শাসক হিসাবে না চিন্তা করতেন আর না এর ঘোষণা দিতেন। তাঁরা যে কাজই করতেন অন্য মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতেই করতেন। সমস্ত মুসলমান ছিল একটি ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ যা ছিল তাদের অথবা অন্য কথায় ইসলামী আকীদার অপরিহার্য দাবী। এই আকীদা-বিশ্বাসের স্বাভাবিক স্পীরিট এই ছিল যে, মানুষের উপর মানুষের প্রাধান্য খতম হয়ে গেছে এবং সামষ্টিক চিন্তা ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। কেউ রাজাও ছিল না এবং কেউ প্রজাও ছিল না। আর না কোন পুরোহিত বা পীর ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নেতা হতে পারত। কিন্তু সাথে সাথে তাকে তাকওয়া বা অন্য কোন যোগ্যতার দিক থেকে তার চেয়ে উত্তম লোকদের অনুসরণ করতে হত। আমীর মুআবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের

ভ্রাতৃবন্ধনের উপর একটি গভীর কষাঘাত করেন এবং নিজের পুত্রকে রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে গোটা জাতিকে নিজের গোত্রের আওতায় জড়ো করেন। আমাদের গণতন্ত্রপ্রিয় রসূল (স)–এর ইন্তেকালের পরপরই ইসলামের আনীত গণতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। আমীর মুআবিয়া বংশগত খিলাফতের সূচনা করে ইসলামের মূল শিকড়ের উপর কুঠারাঘাত হানেন। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (স) যদিও নিজের কোন কোন নিকটাত্মীয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন, কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের পরে মুসলিম উম্মাহ্র শাসক নিয়োগ করেননি। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল সব সময় সুস্পষ্টভাবেই গণতান্ত্রিক। আমীর মুআবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খিলাফাতের উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বয়ং মহানবী (স)–এর নাতি নিজের এবং নিজের প্রিয়তমদের জীবন পর্যন্ত কোরবানী করে দিলেন। এটা ছিল উমাইয়্যা বংশের অপপ্রচার যে, ইমাম হুসাইন (রা) খিলাফতকে আহ্লে বায়ত–এর জন্য সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জীবন দিয়েছেন। এই অপপ্রচার ছিল সম্পূর্ণত মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল। আশ্চর্যের বিষয় যে, শীআ সম্প্রদায়ও এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত ইমাম হুসাইন (রা) সফল হতে পারেননি। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, রাজতন্ত্র ও একনায়কত্ব মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বীকৃত পন্থার রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর থেকে নিজেদের শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন অধিকার থাকল না এবং নিজেদের বিষয়াবলীর উপর নিজেদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। আমীর মুআবিয়া যে কাজের সূচনা করেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভবত তার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মুসলিম সমাজের সুস্থ ও সুষ্ঠু ক্রমোন্নতি ও পরিপালনকে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রভাবিত করে এবং আজ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা দ্বিতীয় পর্যায়ের রয়ে গেছে।

১০. কুরআন মজীদের আলোকে মুসলমানদের আমীর কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি হতে পারে যে বুদ্ধিজ্ঞান ও দৈহিক দিক থেকে এই পদের যোগ্য বিবেচিত হবে। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বংশীয় ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে নাকচ হয়ে যায়। এই প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াতের উল্লেখ যুক্তিসংগত হবেঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ -
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

"এবং তাদের নবী তাদের বলেছিল, আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের রাজা করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব কিভাবে হবে যখন আমরা তার চেয়ে কর্তৃত্বের অধিক হকদার, এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি। নবী বলল, আল্লাহ্–ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দৈহিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়"–(সূরা বাকারাঃ ২৪৭)।

১১. যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলামী আইনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল বিধান রচনার অধিকার আল্লাহ্‌র এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। আদম (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা নবী–রসূলগণের মাধ্যমে তাঁর বিধান কার্যকর করেছেন। অতপর এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হল যখন মহান আল্লাহর পূর্ণতম প্রজ্ঞার ইচ্ছা অনুযায়ী মানবজাতির সর্বশেষ শরীআত দান করা হয়। এই শরীআতী বিধান মানবজাতির নিকট মহানবী (স)–এর উপর ওহীর আকারে নাযিল হয়। এই ওহী লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয় কিংবা স্মৃতিপটে মুখস্ত করে ধরে রাখা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাকে একটি সংকলিত গ্রন্থের রূপ দান করা হয়, যা 'কুরআন' নামে খ্যাত। এরপর থেকে মানবজাতির সমস্ত পুরুষ, নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহের সমাধান ও মীমাংসা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত কুরআন অনুযায়ীই করা হত। এই বিধানই বলে দেয় কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল, কি পছন্দনীয়, কি অপছন্দনীয়, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ, কোনটি মুস্তাহাব ও কোনটি মাকরূহ। মোটকথা কুরআন মজীদ মুসলিম সমাজের এক অপরিহার্য ভিত্তি। এটা সেই কেন্দ্র যার চারপাশে ইসলামী আইন আবর্তিত হয়।

১১ (ক). এ এক স্বীকৃত সত্য যে, মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ একটি দারুন জটিল জিনিস। প্রকৃতি যদিও চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব ইচ্ছার প্রকাশের নাম এবং তা একটি স্থায়ী বিধানের অধীন, কিন্তু মানবীয় অবস্থা ও রুচি প্রতি যুগ ও প্রতিটি স্থানের বিচারে এক নয়। ব্যক্তিত্ব ও বস্তুগত অবস্থার সমন্বয় ভবিষ্যতের ঘটনার জন্য কোন নমুনা রেখে যায় না। মানুষের হাজারো রকমের ব্যাপার রয়েছে যেখানে হাজারো ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীতে প্রতিটি শিশু নিজের সাথে কল্পনার এক নতুন জগত নিয়ে পদার্পণ করে। নিত্য নতুন অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে যেহেতু মানবীয় পরিবেশ ও সমস্যা নিত্য নতুন রূপ নিচ্ছে, তাই এই সদা পরিবর্তনশীল জগতে চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনের অযোগ্য কোন বিধান চলতে পারে না। কুরআন মজীদও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এ

কারণে কুরআন মজীদ মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে কতিপয় ব্যাপক ও সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা আমাদেরকে একক নীতিমালার একটি পূর্ণতর ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও সুফলের উপর ভিত্তিশীল একটি নৈতিক ব্যবস্থা দান করেছে। কতিপয় বিশেষ ব্যাপারে (যেমন উত্তরাধিকার) তা অধিক সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত। এমন কতিপয় ব্যাপার রয়েছে যার উল্লেখ দৃষ্টান্ত ও ইশারা–ইংগীতের আকারে করা হয়েছে। এমনও কতক বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে কুরআন মজীদ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছে– যাতে মানুষ কালের পরিক্রমায় এসব ব্যাপারে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারে। কুরআন মজীদে পুনপুন একথার উপর জোর দেয়া হয়েছে যে, তা নেহায়েত সহজ ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারে। যেসব আয়াতে এ কথার উপর জোর দেয়া হয়েছে তা এখানে উধৃত করা উপকারী হবে। [অতপর বিজ্ঞ বিচারপতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ও তার অনুবাদ পেশ করেন]।

২৫ঃ ২৪২, ৬৫ঃ ৯৯, ১০৬, ১২৭, ১১ঃ ১, ১২ঃ ২, ১৫ঃ ১, ১৭ঃ ৮৯, ১০৬, ৩৯ঃ ২৮, ৫৪ঃ ১৭, ২২, ৫৭ঃ ৯, ১৭, ২৫, ৩০ঃ ৫৮, ৪১ঃ ৪৪।

অতএব বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, কুরআন পড়া ও তা হৃদয়ংগম করা এক দুই ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার নয়। কুরআন সহজ–সরল ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তা বুঝতে পারে, সমস্ত মুসলমান ইচ্ছা করলেও বুঝতে পারে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে পারে। এটা এমন এক অধিকার যা প্রত্যেক মুসলমানকে দান করা হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি–যত বড় পদমর্যাদা সম্পন্নই হোক–সে মুসলমানদের নিকট থেকে কুরআন পড়ার ও বুঝার এ অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। কুরআন মজীদের বক্তব্য হৃদয়ংগম করার জন্য কোন ব্যক্তি অতীত কালের নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারদের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ থেকে মূল্যবান সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এ পর্যন্তই সীমিত থাকা উচিৎ। এসব তাফসীরকে স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ের চূড়ান্ত রূপ বলা যেতে পারে না। কুরআন মজীদ পড়া ও হৃদয়ংগম করার বিষয়টি স্বয়ং দাবী করে যে, পাঠক তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানের সময় সে সমকালীন পরিস্থিতি ও পৃথিবীর পরিবর্তিত প্রয়োজনের উপর তার প্রয়োগ করবে। এই পবিত্র গ্রন্থের যেসব ব্যাখ্যা অতীত কালের ভাষ্যকারগণ, যেমন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ প্রমুখ করেছেন যার প্রতি সমস্ত মুসলমান এবং স্বয়ং আমি সম্মান প্রদর্শন করি–তা

আজকের যুগে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করা যেতে পারে না। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলত অন্যান্য অনেক বিজ্ঞ আলেমও সমর্থন করেননি যাদের মধ্যে তাদেরই শাগরিদবৃন্দও রয়েছেন। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের যে গভীর অধ্যয়ন তাঁরা করেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমকালীন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর দ্বারা তা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তাদের যুগে অথবা তাদের দেশে উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আজ থেকে ১২/১৩ শত বছর পূর্বেকার তাফসীরকারদের বক্তব্যকে যদি চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ভাষ্য মেনে নেয়া হয় তবে ইসলামী সমাজ একটি লৌহপিঞ্জরে বন্দী পড়ে থাকবে এবং কালের পরিক্রমায় তা ক্রমবিকাশের সুযোগ পাবে না। অতপর তা আর একটি চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে টিকে থাকতে পারবে না, বরং যে যুগে ও স্থানে নাযিল হয়েছিল তা সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন যদি কোন অপরিবর্তনীয় নীতিমালা নির্ধারণ না করে থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা প্রমুখের ভাষ্যসমূহ সম্পর্কেও অনুমতি দেয়া যায় না যে, তা মাঝখানে সেই পরিণতির কারণ হবে। দুর্ভাগ্য বশত সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ কয়েক শতক ধরে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানগণ ধর্মীয় স্থবিরতা, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব, রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নতিতে এককালে মুসলমানদের একচেটিয়া অবদান ছিল তা অন্যদের হাতে চলে গেছে এবং মনে হচ্ছে যে, মুসলমানরা চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির অবশ্যই পরিসমাপ্তি হওয়া উচিৎ। মুসলমানদের জাগ্রত হয়ে যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যে অসচেতনতা ও অকর্মন্যতা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছে তা থেকে অবশ্যই নিস্কৃতি পেতে হবে। কুরআন মজীদের সাধারণ মূলনীতিগুলোকে সমাজের পরিবর্তিত প্রয়োজনের উপর প্রয়োগ করার জন্য তার এমন যুক্তিগ্রাহ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে লোকেরা নিজেদের ভাগ্য, নিজেদের চিন্তাধারা ও নৈতিক কাঠামো তদনুযায়ী গঠন করতে পারে এবং নিজেদের দেশেও যুগোপযোগী পন্থায় কাজ করতে পারে। অন্য লোকদের মত মুসলমানরাও জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেকের অধিকারী এবং এই শক্তি ব্যবহার করার জন্যই দেয়া হয়েছে, অযথা নষ্ট করার জন্য দেয়া হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা চিন্তা গবেষণা করে দেখবে যে, আল্লাহ্‌র নিকট কুরআনের আয়াতের দাবী ও তাৎপর্য কি এবং তাকে কিভাবে নিজেদের বিশেষ

পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে? অতএব সকল মুসলমানকে কুরআন পড়তে হবে, হৃদয়ংগম করতে হবে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ـ

"তাদের মধ্যে কতেকে তোমার কথা শুনে, অতপর তোমার নিকট থেকে বের হয়ে গিয়ে যারা জ্ঞানবান তাদের বলে, এই মাত্র সে কি বলেছে? এদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে"-(মুহাম্মাদঃ ১৬)।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ

"তিনি উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূল হিসাবে-যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে এরা তো ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (সূরা জুমুআঃ২)।

জনগণের কর্তব্য হল তারা যেন কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করে এবং নিজেদের অন্তরের উপর তালা ঝুলিয়ে না দেয়।

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ ـ

"এক কল্যাণময় কিতাব, তা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে"-(সাদঃ ২৯)।

লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে এবং তা হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করবে। অন্যান্য উদ্দেশ্য লাভের জন্য যেভাবে দুনিয়াতে কঠোর চেষ্টাসংগ্রাম করতে হয়, অনুরূপভাবে কুরআন বুঝবার এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছার জন্য কঠোর পরিশ্রমের নামই হচ্ছে ইজতিহাদ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔

"যে কেউ চেষ্টা সাধনা করে সে তো নিজের জন্যই তা করে। আল্লাত তো বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন"–(আনকাবূতঃ ৬)।

পুনর্বার একথার উপর জোর দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা কুরআন মজীদের সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا
ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

"এরা যখন সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা নিজেদের জ্ঞানে আয়ত্ত করতে পারনি? না, তোমরা অন্য কিছু করছিলে"–(সূরা নাম্‌লঃ ৮৪)।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

"আর কঠোর প্রচেষ্টা চালাও আল্লাহর (পথে) যেভাবে তাঁর জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। এই পন্থা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের। তিনি পূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম এবং এতেও, যাতে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন ধর, তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী"–(সূরা হজ্জঃ ৭৮)।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ
وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا۔

"আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার উপর আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা কর না এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর"- (সূরা ত-হাঃ ১১৪)।

উল্লেখিত সব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মুসলমানের নিকট, শুধু তাদের বিশেষ পর্যায়ের লোকের নিকট নয়, এই আশা করা হচ্ছে যে, তারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে, তা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করবে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতিপয় স্বীকৃত নীতির অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। এসব মূলনীতির মধ্যে কয়েকটি এও হতে পারেঃ

১. কুরআন মজীদের কতক বিধান গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। কখনো সেগুলো অমান্য করা এবং সেগুলোর বিরোধিতা করা যাবে না, বরং সেগুলোর উপর অক্ষরে অক্ষরে আমল করতে হবে।

২. এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে যার ধরন পথনির্দেশনামূলক এবং কমবেশী যার অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৩. যেখানে বক্তব্য সম্পূর্ণ সরল ও সুস্পষ্ট, যা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, সেখানে তার সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যা অভিধান ও ব্যাকরণের আলোকে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। অন্য কথায় এই পবিত্র গ্রন্থের শব্দাবলী নিয়ে কোনরূপ টানাহেঁচড়া করা ঠিক নয়।

৪. একথা স্বীকার করে নেয়া উচিৎ যে, কুরআন মজীদের কোন অংশ অর্থহীন, অপূর্ণাংগ অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়।

৫. পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন অর্থ নির্গত করা উচিৎ নয়।

৬. শানে নুযূল অনুযায়ী অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজিত ছিল তার পেক্ষাপটে রেখে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা বিপদজনক।

৭. কুরআনের ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া উচিৎ। এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, তাকে পারিপার্শিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানবীয় রীতিনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। সর্বদা নতুন ও অনাকাংখিত অবস্থার প্রকাশ ঘটতে

থাকে, একথা বিবেচনার যোগ্য। সমাজের প্রয়োজনের তালিকা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে এবং এসব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যক।

১১ (খ). স্থান–কালের ব্যবধানের কারণে যে বিভিন্নরূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটে তার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পারস্পরিক তুলনা হওয়া উচিৎ। তুলনা করার সময় আমাদেরকে পরিস্থিতি ও প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং দূরের ও কাছের সত্যসমূহ যাচাই করতে গিয়ে অতীত ও বর্তমানের দিকে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যে, কল্পিত বিষয়, অনুমান, অস্বাভাবিক ও বর্জনযোগ্য আকীদা–বিশ্বাস সবই আমাদের দৃষ্টির সামনে থাকবে।

১২. দুর্ভাগ্যবশত এই দুনিয়ায় অন্ততপক্ষে খিলাফতে রাশেদার পরে এমন কোন সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়নি যেখানে লোকেরা পূর্ণ সচেতনতা, আগ্রহ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের কাজ করতে পারতো। কুরআন মজীদের নির্ধারিত মূলনীতি চিরস্থায়ী, কিন্তু তার প্রয়োগ চিরন্তন নয়। কারণ প্রয়োগ এমন সত্য তথ্য ও উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি যা অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এখন যদি কুরআন মজীদের কোন একটি বিশেষ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক মুসলমানকে যদি নিজ নিজ অনুধাবন ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার দেয়া হয় তবে এর ফলে অসংখ্য ব্যাখ্যা অস্তিত্ব লাভ করে একটি বিশৃংখলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ যেসব ব্যাপারে নীরব, সে সম্পর্কেও যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী একটি নীতিমালা তৈরীর অধিকার দেয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রেও একটি বিশৃংখল ও অসংলগ্ন সমাজের সৃষ্টি হবে। অন্যান্য সমাজের মত ইসলামী সমাজও যতোটা সম্ভব কষ্টের সাথে হলেও সর্বাধিক সংখ্যক লোককে সর্বাধিক সুখশান্তির আশ্বাস দেয়। তাই অধিকাংশের রায়ই বিজয়ী হবে।

১৩. এক বা কয়েক ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিজ্ঞান ও শক্তিতে অপূর্ণাংগ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যতই অধিক শক্তিশালী ও মেধার অধিকারী হোক না কেন, তার কামেল (পূর্ণাংগ) হওয়ার আশা করা যায় না। একজন উচ্চ স্তরের সচেতন ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজের পর্যবেক্ষণের আওতায় আসা সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে না। একটি সুশৃংখল সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামোর অধীন বসবাসকারী লাখো কোটি মানুষ সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির তুলনায় অধিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও

ধারণাশক্তি তুলনামূলকভাবে উত্তম ও উন্নত হয়ে থাকে। কুরআন মজীদের আলোকেও আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা এবং পরিস্থিতির উপর তার সাধারণ মূলনীতিসমূহের প্রয়োগের কাজটি এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া যায় না, বরং একাজ মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

"যারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে এবং তাদের আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে"–(সূরা শূরাঃ ৩৮)।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

"আর তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হও না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর–যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার"–(সূরা আল–ইমরানঃ ১০৩)।

আরও অনেক আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন কুরআন মজীদ বুঝবার এবং তার আয়াতসমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবার চেষ্টা করে। এর অর্থ এই যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় বরং সমষ্টিগতভাবে একাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

১৪. আলোচনার এই প্রাসংগিকতার মধ্যে অবস্থান করেই 'কানূন' (বিধান) শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করা জরুরী। আমার মতে 'কানূন' বলতে সেই নিয়ম

প্রণালী ও রীতিনীতিকে বুঝায়, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক এই ধারণা পোষণ করে যে, তাদের যাবতীয় বিষয় তদনুযায়ী চলা উচিৎ।

১৫. প্রাথমিক পর্যায়ে মানবজাতির সংখ্যা ছিলো অনেক কম এবং তারা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মর্জি মাফিক চলতে পারত। পরবর্তীকালে মানব জাতির সংখ্যা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাসের প্রয়োজন দেখা দিল তখন তাদের জন্য একটি সাধারণ নৈতিক বিধানের প্রয়োজন দেখা দিল। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চাশ ব্যক্তির একটি দলে হত্যাকান্ড সংঘটিত হল। অধিকাংশের ধারণা অনুযায়ী এটা ছিল একটি ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ। কয়েক ব্যক্তির ধারণায় সম্ভবত এরূপ ছিল না। শক্তি যেহেতু অধিকাংশের কুক্ষিগত ছিল, তাই তারা সংখ্যালঘুর উপর নিজেদের ইচ্ছা জোরপূর্বক কার্যকর করে এবং সেটাই আইনের মর্যাদা লাভ করে, হয়ত এই পঞ্চাশ ব্যক্তির মধ্যে কেউ হত্যাকারী না হতে পারে। এই যুক্তি বর্তমান কালের দৃষ্টিভংগী থেকেও সঠিক। কয়েক কোটি অধিবাসীর একটি দেশে অধিকাংশ অধিবাসীর কুরআনের একাধিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াতসমূহের এমন ব্যাখ্যা পেশ করা উচিৎ যা হবে তাদের পারিপার্শিক অবস্থার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে কুরআনের সাধারণ নীতিমালাকে বর্তমান পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করা উচিৎ যাতে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। তদ্রূপ যেসব সমস্যা ও ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে কুরআন নীরব, সেসব ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অধিকাংশকে পালন করতে হবে।

অতপর যে প্রশ্নটি আলোচনার দাবী রাখে তা এই যে, কোটি কোটি মানুষ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা, এর প্রয়োগ এবং যে বিষয়ে কুরআন নীরব সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার কিভাবে ব্যবহার করবে? কোন দেশের পারিপার্শিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে যে, তথাকার অধিবাসীদের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সর্বোত্তম পন্থা কি হতে পারে যাদের উপর তারা বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের এখতিয়ার ও মত প্রকাশের অধিকার অর্পণ করতে পারে। তারা এক ব্যক্তিকেও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে দিচ্ছে যে, এক ব্যক্তিকে সঠিক কর্তৃত্বের অধিকারী বানানোর পরিণাম সর্বকালেই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতার নেশা ব্যক্তি, সংগঠন ও আইনের শাসনে প্রতিবন্ধকতা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তিন গুণ বিপর্যয়সহ নিজের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। কোন দেশের ইতিহাসে

এমন অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন ও দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এক ব্যক্তিকে নিজের হাতে সার্বিক ক্ষমতা তুলে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু এটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, যা গণতন্ত্র বহাল করতে এবং ক্ষমতার আমানত জনগণের নিকট হস্তান্তরের জন্য চূড়ান্তভাবে বৈধ। তাই ইসলামের সঠিক বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার বন্টনের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাদের প্রত্যেকে পরস্পরের জন্য নিয়ন্ত্রক এবং জবাবদিহির কারণ হতে পারে এবং সকলে মিলে গোটা জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আইন–কানূন ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। পরিস্থিতির স্বাভাবিক দাবী এই যে, এই কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ লোকদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। কেবলমাত্র এই অবস্থায়ই একটি সুশৃংখল কর্মপন্থা সহকারে কোন কর্মসূচীকে সাফল্যের স্তরে পৌছানো যেতে পারে। ইসলামে সমস্ত মুসলমান সমানভাবে ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের উপর রয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর স্বার্বভৌমত্ব। তাদের সিদ্ধান্তসমূহ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে সামগ্রিকভাবে ও সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়। এরই নাম "ইজমা" (ঐক্যমত)।

"ইজতিহাদ" আইনের একটি স্বীকৃত উৎস। এর অর্থ কোন সন্দেহপূর্ণ বা কঠিন আইনগত সমস্যার সমাধান বের করার জন্য নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা। ইমাম আবু হানীফা ব্যাপকভাবে ইজতিহাদের প্রয়োগ করেছেন। ইজতিহাদের যেসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও অপরাপর ফকীহ্গণ কর্মরত ছিলেন সে গুলো হচ্ছে কিয়াস, ইসতিহ্সান, ইসতিসলাহ্ ও ইসতিদলাল। মুসলিম ফকীহ্গণ এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির ইজতিহাদকে বিপদজনক মনে করতেন। তাই তাঁরা কোন বিশেষ আইনগত সমস্যার ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের অথবা মুজতাহিদগণের ইজমা অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করতেন। অতীতকালে ইজতিহাদকে কতিপয় ফকীহ্র মধ্যে সীমিত রাখা হয়ত সঠিক ছিল। কারণ জনগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে এবং ব্যাপক আকারে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো হত না। কিন্তু আধুনিক কালে এই দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধিদের আঞ্জাম দেয়া উচিৎ। কারণ যেমন আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, কুরআন মজীদ পাঠ করা, অনুধাবন করা এবং তার সাধারণ নীতিমালাকে বিরাজমান পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করা এক অথবা দুই ব্যক্তির বিশেষ অধিকার নয়, বরং সমস্ত মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য এবং একাজ তাদেরই আঞ্জাম দেয়া উচিৎ যাদেরকে মুসলমানগণ এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করে থাকবে। অতএব একথা আপনা আপনি অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, যেসব ব্যাপারে কুরআন

মজীদের নির্দেশ সুস্পষ্ট তা মুসলমানদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখে এবং যেখানে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা এবং তার সাধারণ নীতিমালাকে আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রয়োগের ব্যাপার রয়েছে সেখানে সর্বসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যা কিছু সিদ্ধান্ত নিবে তাও আইনের মর্যাদা লাভ করবে।

১৬. উপরে যে দৃষ্টিভংগীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সুস্পষ্ট করা যায়। আমি সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতটি পেশ করব যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا-

"তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে মহিলাদের মধ্যে যাকে তোমার ভালো লাগে– দুই দুই, তিন তিন, চার চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী বিবাহ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।"

যেমন আমি আমার রায়ের প্রাথমিক অংশে বর্ণনা করেছি যে, কুরআন মজীদের কোন হুকুমের কোন অংশই অর্থহীন মনে করা উচিৎ নয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হলঃ তারা এ বিষয়ে আইন প্রণয়ণ করবে যে, একজন মুসলমান একের অধিক বিবাহ করতে পারবে কি না, যদি করতে পারে তবে কি অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ শর্ত সাপেক্ষে। কিয়াসের দিক থেকে এই ধরনের বিবাহ ইয়াতীমদের উপকারের জন্য হওয়া উচিৎ।

১৭. যাই হোক এই আয়াতের দ্বারা শুধু বৈধতা প্রমাণিত হয়, বাধ্যতামূলক নয় এবং আমার জ্ঞানমতে সরকার এই অনুমতিকে সীমিত করতে পারে। যদি পঞ্চাশ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ এই আইন প্রণয়ন করতে পারে যে, তাদের মধ্যে কেউই নরহত্যার অপরাধ করবে না, তবে এই উদাহরণের উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, যদি কোন একজন মুসলমানের জন্য একথা বলা সম্ভব হয় যে, "আমি একের অধিক বিবাহ করব না, কারণ এই সামর্থ আমার নেই," তবে আট কোটি (তৎকালীন পাকিস্তানের জনসংখ্যা) মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গোটা জাতির জন্য এই বিধান প্রণয়ন

করতে পারে যে, জাতির অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন ব্যক্তিকে একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয় না। এই আয়াতটি কুরআন মজীদের অন্য দুটি আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উচিৎ। প্রথম আয়াত ২৪ঃ ৩৩, যাতে বলা হয়েছেঃ বিবাহ করার উপায়–উপকরণ যার নাই তার বিবাহ করা অনুচিৎ। উপায়–উপকরণের স্বল্পতার কারণে যদি এক ব্যক্তিকে এক বিবাহ করা থেকে বিরত রাখা যায় তবে এসব কারণে অথবা এ জাতীয় কারণে তাকে একের অধিক বিবাহ করা থেকেও বিরত রাখা উচিৎ। বিবাহ স্ত্রী ও সন্তানদের অস্তিত্বের যামিনস্বরূপ। পরিবারের ভরণপোষণের অভাবহেতু যদি এক ব্যক্তির জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে তবে তাকে যতটি বাচ্চার ভরণপোষণে সে সক্ষম ততটি জন্মদানে বাধ্য করা যেতে পারে। সে নিজে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে সরকারকে তার জন্য একাজ করে দিতে হবে। এই নীতির ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করতে গিয়ে, যেমন কোন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি যদি খারাপ হয় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় তবে সরকারের জন্য এরূপ আইন প্রণয়ন সম্পূর্ণ বৈধ হবে যে, কোন ব্যক্তি একের অধিক স্ত্রী রাখবে না এবং একজনও এমন অবস্থায় রাখবে যখন সে নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে এবং সন্তানও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত রাখবে। তাছাড়া উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন মুসলমান নিজ স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা বোধ করলে সে কেবল একজন স্ত্রীলোকই বিবাহ করবে। সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَنْ تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔

“আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার কখনই করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়বে না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর এবং সাবধান হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

এই দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন এবং একাধিক বিবাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা সরকারের দায়িত্ব।

১৮. সরকার বলতে পারে যে, দুই স্ত্রী বিবাহ্ করার ক্ষেত্রে যেহেতু বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং কুরআনেও স্বীকার করা হয়েছে যে, দুই স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার অসম্ভব, তাই এই প্রথা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হল। এই তিনটি আয়াত সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করে। এই তিনটি মূলনীতির প্রয়োগ সরকারকে নিজ তত্ত্বাবধানে করতে হবে। সরকার লোকদের একাধিক বিবাহ্ করে নিজকে এবং নিজের সন্তানদের ধ্বংস করা থেকে বাঁচাতে পারে। জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দাবী এই যে, যখনই প্রয়োজন অনুভূত হবে বিবাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

১৯. চুরির ব্যাপারে সূরা ৫ঃ ৩৮–এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পুরুষ চোর অথবা নারী চোর উভয়ের হাত কাটা যাবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। একই সূরার ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "যে কেউ যুলুম করার পরে তওবা করলে এবং সংশোধন হলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন।" অতএব সাধারণ মূলনীতি এই যে, চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাত কেটে দেয়া। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেয়া সরকারের দায়িত্ব যে, চুরি কি এবং কোন্ ধরনের চুরির কি শাস্তি? এ থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা এই যে, জনগণের জন্য কুরআনী বিধানের উপর ভিত্তিশীল নীতিমালা প্রণয়ন ও আইন–কানূন রচনার এখতিয়ার সরকারের রয়েছে। এই এখতিয়ারের আওতা বহুত প্রশস্ত, এবং সুশৃংখল বাস্তব কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য তার স্বাধীন ব্যবহার হওয়া উচিত।

২০. ভারত ও পাকিস্তানে যতগুলো গ্রন্থ আইনগত দিক থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় সেগুলোর মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে বর্ণিত নীতিমালা কুরআন মজীদের উপর ভিত্তিশীল নয়। এই পবিত্র গ্রন্থে নাবালক শিশুদের সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ـ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ـ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ـ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ـ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ـ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا ...... (البقرة ٢٣٣)

"যে পিতা দুধপান–কাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এমতাবস্থায় পিতার কর্তব্য যথারীতি তাদের (মায়েদের) ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। কারো উপর তার সামর্থের অধিক দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কোন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত নয় এবং উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু তারা যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নাই। তোমরা যা কিছু মূল্য নির্ধারণ করবে তা যদি নিয়মিত আদায় কর, তবে অন্য মেয়েলোক দ্বারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করাতে চাইলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা"– (সূরা বাকারাঃ ২৩৩)।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ـ

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, তাদের উত্ত্যক্ত করো না সংকটে ফেলার জন্য। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তবে অন্য স্ত্রীলোক তার পক্ষে স্তন দান করবে"–(সূরা তালাকঃ ৬)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে মায়েদেরকে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত শিশুদের স্তনদান করতে হবে। পিতাকে যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে যার মধ্যে বাহ্যত শিশু ও মা উভয়ের জন্য ব্যয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ থেকে শীআ আইনের সমর্থন পাওয়া যায় যার আলোকে সন্তানের ব্যাপারে মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার দুই বছর পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু অভিভাবকত্ব সম্পর্কে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তার সপক্ষে কুরআন থেকে আমি কোন বৈধ কারণ খুঁজে পাইনি। কুরআন মজীদ পিতা–মাতার প্রত্যেকের উপর এই জিম্মাদারী ন্যস্ত করে যে, তারা সন্তানের লালন পালন করবে। সন্তান থেকে না পিতাকে বঞ্চিত

করা যায়, আর না মাতাকে। যাই হোক কুরআন মজীদে এমন কোন দিকনির্দেশনা নাই যে, কোন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে প্রথম স্বামী তার নিকট থেকে সন্তান কেড়ে নিতে পারে। সে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে-শুধুমাত্র এই কারণে যদি বাচ্চা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে-তবে আমি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করার ক্ষেত্রে কেন সন্তান থেকে বঞ্চিত হবে না? সৎমাতা সৎপিতার চেয়ে অধিক না হলেও অন্তত তার সমান কষ্টকর এবং বিপদজনক তো অবশ্যই।

যাই হোক নাবালকদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন সরকারের দায়িত্ব। কারণ কুরআন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। Guardianship and Words Act সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, নাবালকদের বিষয়সমূহ এই আইনের অধীন। পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করার পর দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই আইন অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু এই আইনেও মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর নাবালক সন্তানদের অভিভাবকত্বের অধিকার কার উপর বর্তাবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই। কুরআন এবং এই আইন উভয় অনুযায়ী একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শিশুর কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। শিশুর কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী যদি এই হয় যে, বাচ্চা মায়ের কাছে থাকবে, তবে মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সত্ত্বেও বাচ্চা তার তত্ত্বাবধানেই থাকা উচিৎ। প্রতিটি মামলার রায় তার বিশেষ পরিস্থিতি, ধরন ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রদান করতে হবে।

২১. কুরআন ছাড়াও হাদীস অথবা সুন্নাতকে মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্তৃক ইসলামী আইনের একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অর্থে হাদীস বলতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে বুঝায়। কিন্তু সাধারণভাবে হাদীস বলতে রসূলের কথা ও কাজকে বুঝায় যা তিনি পছন্দ বা অপছন্দ করেছেন অথবা অপছন্দ করেননি। ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে হাদীসের মূল্য ও মর্যাদা কি তা পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করার জন্য আমাদের জানতে হবে যে, ইসলামী দুনিয়ায় রসূলে পাক (স)-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব কি? আমি এই রায়ের প্রাথমিক অংশে বলেছি যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি দীন। তা নিজের সনদ আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে লাভ করে। এটা যদি ইসলামের সঠিক ধারণা হয়ে থাকে তবে তা থেকে অপরিহার্যরূপে এই সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, নবীর কথা, কাজ ও আচার-ব্যবহারের আল্লাহর তরফ থেকে আগত ওহীর সমান মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে না। তা থেকে সর্বাধিক এতটুকু অবগত হওয়ার

জন্য সাহায্য নেয়া যেতে পারে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা কিভাবে করা হয়েছিল, অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ নীতিমালাকে বিশেষ ঘটনাবলীর উপর কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল? কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছিলেন একজন পূর্ণাংগ মানব। কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ যে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী অথবা আমরা তাঁর জন্য যে সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করতে চাই তার প্রকাশের শক্তি ও যোগ্যতা তার রয়েছে। কিন্তু তথাপি তিনি খোদা ছিলেন না, না তাকে খোদা মনে করা হত। অন্য সব রসূলদের মত তিনিও মানুষই ছিলেন। [অতপর বিজ্ঞ বিচারপতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদসহ উধৃতি দেনঃ ১২ঃ ১০৯, ১৪ঃ ১০, ১১, ৩ঃ ১৪৩, ৭ঃ ১৮৮, ৪১ঃ ৬, ৫১ঃ ৫১। এসব আয়াতে মহানবী (স)–এর ব্যক্তি সত্তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর বিজ্ঞ বিচারপতি বলেন]–

তাঁকেও ঠিক সেইভাবে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হত যেভাবে আমাদের করতে হচ্ছে, বরং সম্ভবত তাঁর যিম্মাদারী কুরআন মজীদের আলোকে আমাদের যিম্মাদারীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তাঁর উপর যতটুকু নাযিল হত তার অধিক তিনি মুসলমানদের দিতে পারতেন না।

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔

"হে রসূর! তোমার রবের নিকট থেকে তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা পৌছে দাও, যদি তা না কর তবে তো তুমি তাঁর বাণী পৌছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে লোকদের (ক্ষতি) থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না"–(সূরা মাইদাঃ ৬৭)।

২২. একথার উপর জোর দেয়ার জন্য কুরআন মজীদের আয়াতের উধৃতি দেয়া আমার জন্য নিষ্প্রয়োজন যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ যদি বড়ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় স্থানই দেয়া যেতে পারে। তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী ছাড়াও মানুষ হিসাবে তিনি নিজেও কিছু চিন্তার অধিকারী ছিলেন এবং নিজের এই চিন্তার প্রভাবাধীনে কাজ করতেন। একথা সত্য যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কোন পাপ করেননি। কিন্তু তাঁর দ্বারা ভুলক্রটি তো হতে পারত এবং এই সত্য স্বয়ং কুরআনে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ

"যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন"–(সূরা ফাত্হঃ ২)।

কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বিশ্বের জন্য এক উত্তম আদর্শ, কিন্তু তার অর্থ কেবলমাত্র এতটুকুই যে, কোন ব্যক্তিকে তাঁর মতই ঈমানদার, সত্যবাদী, কর্মতৎপর, ধর্মভীরু ও মুত্তাকী হওয়া উচিৎ। তার অর্থ এই নয় যে, আমরাও হুবহু তাঁর মতই চিন্তাভাবনা করব এবং কাজকর্ম করব। কারণ তা হবে একটা স্বভাববিরুদ্ধ কথা এবং তদ্রূপ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমরা তদ্রূপ করার চেষ্টা করি তবে জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

২৩. একথাও সত্য যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর আনুগত্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু তার অর্থ শুধু এই যে, তিনি যেখানে আমাদেরকে একটি বিশেষ কাজ একটি বিশেষ পন্থায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সে কাজটি সেভাবে করব। আনুগত্য তো কোন নির্দেশেরই হতে পারে। যেখানে কোন নির্দেশ নাই সেখানে আনুগত্যও নাই আর আনুগত্যহীনতাও নাই। রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করেছেন আমরাও ঠিক তাই করব, কুরআনের আয়াত থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণ অত্যন্ত কষ্টকর। পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কোন একক ব্যক্তির জীবনকালের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা একটি সীমিত সংখ্যার অধিক লোকের জন্য নজীর সরবরাহ করতে পারে না, সেই একক ব্যক্তি নবীই হোক না কেন। একথা জোরের সাথে বলা উচিৎ যে, ইসলাম নবীকেও খোদা মনে করেনি। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে মৌলিক ও বাস্তব পার্থক্য রয়েছে। কোন জাতির জন্য বিশেষ ব্যাপারসমূহে নৈতিক বিধান কি হবে এবং একটি নির্দিষ্ট মামলার রায় কিভাবে প্রদত্ত হবে সে সম্পর্কে সুবিচার এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

"আমানত তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন সব কিছু দেখেন"–(সূরা নিসাঃ ৫৮)।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ
اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ আহারে অত্যন্ত আসক্ত। তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর অথবা তাদের উপেক্ষা কর। তুমি যদি তাদের উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়বিচার কর। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন"–(সূরা মাইদাঃ ৪২)।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ
بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَّاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

"অতএব তুমি এদিকে আহবান কর এবং তাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ কর না। বল, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান আনি এবং আমি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ–ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নাই। আল্লাহ–ই আমাদের একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট"–(সূরা শূরাঃ ১৫)।

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় বিষয়সমূহের সমাধান পেশ করার জন্য আমরা স্থান–কালের পার্থক্য উপেক্ষা করতে পারি না।

২৪. চার খলীফা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর কথা, কাজ ও আচার–ব্যবহারের কতটা গুরুত্ব দিতেন তা জ্ঞাত হওয়ার কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য

বিদ্যমান নাই। কিন্তু বিতর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় যে, তাঁরা লোকদের সমস্যাবলী এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমাধান পেশ করার জন্য ব্যাপকভাবে হাদীসের ব্যবহার করতেন, তবে তাঁরা ঠিকই করেছেন। কারণ তারা স্থান-কালের প্রেক্ষিতে আমাদের তুলনায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। কিন্তু আবু হানীফা, যিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০ বছর পরে মারা যান, মাত্র ১৭ অথবা ১৮ টি হাদীস তার সামনে পেশকৃত সমস্ত মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। খুব সম্ভব এর কারণ এই ছিল যে, তিনি চার খলীফার অনুরূপ রসূলুল্লাহর যুগের নিকটবর্তী ছিলেন না। তিনি তার সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি কুরআনের লিখিত নির্দেশনামার উপর রাখেন এবং কুরআনের মূল পাঠের শব্দাবলীর পেছনে সেইসব সক্রিয় উপাদান অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন যা এই নির্দেশের কারণ ছিল। তিনি যুক্তিপ্রদান ও সমাধান বের করার পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বাস্তব অবস্থার আলোকে কিয়াসের ভিত্তিতে আইনের মূলনীতি ও নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করেন। হাদীসের সাহায্য ব্যতিরেকে সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার যদি ইমাম আবু হানীফার থেকে থাকে, তবে অন্য মুসলমানদের এই অধিকার প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা এবং মোকদ্দমার মীমাংসায় আবু হানীফার বক্তব্যকে তাঁর ছাত্রগণ এবং অনুসারীগণ চূড়ান্ত মনে করেননি। যাই হোক তিনি মানুষই ছিলেন এবং ভুলের শিকার হতে পারেন। তাই একক ব্যক্তির রায়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকা সঠিক নয়। কোন জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ঐক্যবদ্ধভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন করে, কেবল তার অনুসরণই তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে। আবু হানীফা বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের জন্য যেসব আইন ও নীতিমালার প্রয়োজন তার সবগুলো নয়, বরং তার মধ্যে কতিপয় কুরআনে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে আবির্ভূত লোকদের কতকের মত এই ছিল যে, প্রতিটি নির্গত বিধান কুরআনে নিহিত ছিল এবং তাদের বিধান নির্গত করার মর্যাদা এর অধিক কিছুই ছিল না যে, কুরআনে যা কিছু লুক্কায়িত ছিল তা তারা সাধারণের দৃষ্টির সামনে নিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে আমার যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোন মত এখানে প্রকাশ করতে চাই না। বর্তমানে আমরা যখন একটি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল পৃথিবীতে বসবাস করছি এবং যে কোন প্রকারের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান আমাদের জন্য সহজতর হয়েছে, ঠিক এ সময়ে হাদীসের আইনের উৎস হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা আমাদের জন্য মোক্ষম সময়।

তাছাড়া এই বিষয়টিও চিন্তা করে দেখা দরকার যে, ইমাম আবু হানীফা অথবা তাঁর মত অপরাপর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্গণের বক্তব্যের অনুসরণ কি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, নাকি বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে আমাদের জন্যও কিয়াস ও ইসতিমবাতের অধিকার বহাল করা যেতে পারে?

২৫. ইসলামের সমস্ত ফকীহ্গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যুগের পরিক্রমায় কৃত্রিম ও জাল হাদীসের একটি স্তূপ ইসলামী আইনের এক বৈধ ও স্বীকৃত উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। মিথ্যা হাদীস স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে প্রকাশ পাওয়া শুরু করে। মিথ্যা ও ভ্রান্ত হাদীসের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে হাদীস বর্ণনার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, বরং বর্ণনা নিষিদ্ধ করে দেন। ইমাম বুখারী ছয় লাখ হাদীসের মধ্য থেকে মাত্র নয় হাজার হাদীস সহীহ হিসাবে নির্বাচন করেন। আমি বুঝতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি কি একথা অস্বীকার করতে পারে যে, কুরআনকে যেভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে তদ্রূপ প্রচেষ্টা রসূলুল্লাহ (স)–এর নিজের যুগে হাদীসসমূহের সংরক্ষণের জন্য নেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যে সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে তা এই যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কঠোরভাবে হাদীস সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াত যদি সহীহ হয় তবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে তাঁর কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করতে চরমভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁর হাদীসসমূহ সংরক্ষণ করে থাকলে সে যেন তা অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলে।

لَاتكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا ولاحرج

এই হাদীস অথবা এ ধরনেরই একটি হাদীসের তরজমা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী তার "দীন ইসলাম" নামক গ্রন্থের ১৯২৬ সনের সংস্করণের ৬২ নং পৃষ্ঠায় এভাবে দিয়েছেনঃ "বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা হাদীস লিখছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি লিখছ? আমরা বললাম, হাদীস যা আমরা আপনার নিকট শুনি। তিনি বলেন, এ কি! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আরও একটি কিতাব?"

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর ইন্তেকালের পরপরই চার খলীফার যুগে হাদীস সংরক্ষণ অথবা সংকলন করা হয়েছিল বলে কোন সাক্ষ্য বর্তমান নাই। এই বাস্তব ঘটনার কি অর্থ হতে পারে? এটা গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে।

একথা বলা যায় কি–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর পরে আগত চার খলীফা হাদীস সংরক্ষণের চেষ্টা এজন্য করেননি যে, এসব হাদীস সাধারণ প্রয়োগের জন্য ছিল না? মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কুরআন মুখস্ত করে নিয়েছিল। যখন ওহী আসত তার পরপরই লেখার যেসব উপরকণ সহজলভ্য হত তার উপর লিখে নেয়া হত এবং এই উদ্দেশ্যে রসূলে করীম (স) কতিপয় সুশিক্ষিত সাহাবীকে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, তা না মুখস্ত করা হয়েছিল, আর না সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তা এমন লোকদের মগজে লুক্কায়িত ছিল যারা ঘটনাক্রমে কখনো অন্যদের সামনে তা বর্ণনা করার পরপরই মরে গেছে। এমনকি রসূলের ওফাতের কয়েক শত বছর পর তা সংগ্রহ ও সংকলনাবদ্ধ করা হয়। আমার ধারণামতে এই সম্পর্কে জানার জন্য একটি পূর্ণাংগ ও সুসংগঠিত গবেষণা পরিচালনার এখনই সময় এসেছে যে, আরবদের আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তি এবং অভাবনীয় স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসকে বর্তমান আকারে নির্ভরযোগ্য ও সহীহ বলে মেনে নেয়া যায় কি? একথা স্বীকার করা হয় যে, পরবর্তীকালে প্রথম বারের মত রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রায় একশত বছর পর হাদীসসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু তার রেকর্ড আজ দুষ্প্রাপ্য। এরপর তা নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সংগ্রহ করেনঃ ইমাম বুখারী (মৃ.২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃ.২৬১ হি.), আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), জামে তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), সুনানে নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.), সুনানে ইবনে মাজা (মৃ. ২৮৩ হি.) সুনানুদ দারীবী (মৃ. ১৮১ হি.), বায়হাকী (জ.৩৮৪ হি.), ইমাম আহ্মাদ (জ.১৬৪ হি.)। শীআ সম্প্রদায় হাদীসের সংকলকদের যেসব সংকলনকে নির্ভরযোগ্য মনে করে তা এই যে, আবু জাফর (৩২৯ হি.), শায়খ আলী (৩৮১ হি.), শায়খ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (৪৬৬ হি.), সাইয়্যেদ আর–রাদী (৪০৬ হি.)। বাহ্যতই এসব সংকলন ইমাম বুখারী প্রমুখের সংললনের আরো পরে তৈরী হয়। এমন হাদীস খুব কমই আছে যার সম্পর্কে হাদীসের এই সংকলকগণ একমত হতে পেরেছেন। এই জিনিস (মতানৈক্য) কি হাদীসসমূহের উপর নির্ভর করার ব্যাপারটি চরমভাবে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয় না? যাদের উপর তথ্যানুসন্ধানের কাজ অর্পণ করা হবে তারা অবশ্যই এদিকে দৃষ্টি রাখবে যে, হাজার হাজার জাল হাদীস ছড়ানো হয়েছে যাতে ইসলাম ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র দুর্নাম গাওয়া যেতে পারে। তাদেরকে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আরবদের স্মৃতিশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন–শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি থেকে নকলকৃত বিবরণ কি নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে? শেষ পর্যন্ত বর্তমান আরবদের স্মৃতিশক্তি তো তদ্রূপই রয়ে গেছে যেরূপ স্মৃতিশক্তি তেরশত বছর পূর্বে তাদের

পূর্বপুরুষদের থেকে থাকবে। আজকাল আরবদের যা কিছু স্মরণশক্তি আছে তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসাবে কাজে আসতে পারে যে, যেসব রিওয়ায়াত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা সঠিক ও যথার্থ হওয়ার বিষয়টি কি নির্ভরযোগ্য? আরবদের বাড়াবাড়ি এবং যেসব বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এসব রিওয়ায়াত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও গোঁড়ামিও অবশ্যই ব্যাপক আকারে রিওয়ায়াত নকল করতে গিয়ে তাকে কদাকার করে থাকবে। শব্দসমষ্টি যখন এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হয়, সেই মস্তিষ্ক চাই আরবদের হোক বা অন্য কারো মোটকথা এই শব্দভান্ডারে এমন পরিবর্তন সূচিত হয় যা প্রতিটি মস্তিষ্কের নিজস্ব ছাঁচের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে। প্রতিটি মস্তিষ্ক তা নিজস্ব কায়দায় উলটপালট করে, এবং শব্দভান্ডার যখন অনেক মস্তিষ্ক অতিক্রম করে আসে তখন যে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, তার মধ্যে কত বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়? মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি সব জায়গায় একই রকম-এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ মানুষকে অপূর্ণাংগ বানিয়েছেন এবং মানবীয় পর্যবেক্ষণ চরম অপক্ক ও দুর্বল।

২৬. কোন ব্যক্তি যদি হাদীসের ভান্ডার অধ্যয়ন করে তবে তার মধ্যে অন্তত এমন কতক হাদীস বর্তমান দেখতে পাবে, যেগুলোকে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যথার্থ বলে মেনে নেয়া কষ্টকর।[১]

عن عطاء انه قال دخلت على عائشة فقلت اخبرينا باعجب ما
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت و اى
شانه لم يكن عجبا. اتانى فى ليلة فدخل معى فى فراشى (اوقالت
فى لحافى) حتى مس جلدى جلده ثم قال يا ابنة ابى بكر ذرينى
اتعبد لربى قلت انى احب قربك لكن اوثر هواك فاذنت له فقام
الى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلى فبكى حتى

১. ইতিপূর্বে বিজ্ঞ বিচারপতি অনুবাদসহ যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা মিশকাত শরীফের ফযলুল করীম সাহেব কৃত ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেয়া হয়েছে (১৯৩৮ সালের সংস্করণ), যা ভুল নকল করা হয়েছে। মূল মিশকাতের সাথে তুলনা করে আমরা ভুল সংশোধন করে দিয়েছি-(গোলাম আলী)।

سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذالك يبكى حتى جاء بلال فاذنه بالصلوٰة فقلت يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدًا شكورا -

"আতা থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, আমি আয়েশার নিকট গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনি মহানবী (স)-এর মধ্যে যে সর্বাধিক পছন্দনীয় বিস্ময়কর জিনিস দেখেছেন তা বলুন। আয়েশা কেঁদে দিলেন এবং বললেন, মহানবী (স)-এর কোন্ অবস্থাটি আশ্চর্যজনক ও আনন্দদায়ক ছিল না![1] এক রাতে তিনি এলেন এবং আমার সাথে আমার বিছানা অথবা লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এমনকি আমার দেহ তাঁর দেহ স্পর্শ করল। অতপর তিনি বলেন, হে আবু বাক্‌র-এর কন্যা! আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে দাও।[2] আমি বললাম, আপনার নৈকট্য আমার পছন্দনীয়, কিন্তু আমি আপনার আকাংখাকে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মনে করি। তাই আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম। তিনি পানিভর্তি একটি কলসের নিকট গেলেন, উযু করলেন এবং অধিক পানি প্রবাহিত করেননি। অতপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে থাকেন এবং এতটা বেশী কাঁদেন যে, চোখের পানি তাঁর বুকে গড়িয়ে পড়ে। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় রুকূ করেন, জিসদা করেন এবং মাথা উত্তোলন করেন। তিনি এভাবে অবিরত কাঁদতে থাকেন। অবশেষে বিলাল এসে তাকে নামাযের (ওয়াক্ত হওয়ার) খবর দেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন কাঁদেন, অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। মহানবী (স) বলেন, আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلى ولا يتوضأ -

---

১. এই বাক্যাংশের অনুবাদ রায়ের মূল পাঠে এভাবে করা হয়েছেঃ "এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক ও পছন্দনীয় কথা কোন্‌টি হতে পারে।" এই অনুবাদ সঠিক নয়।

২. এই অংশের অনুবাদ রায়ের মূল পাঠে এভাবে আছেঃ "আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি কি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করবে?" এ অনুবাদ সঠিক নয়।

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন অতপর উযু না করেই নামায পড়ে নিতেন।"

عن ام سلمة قالت قالت ام سليم يا رسول الله ان الله لا يستحى
من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت
الماء فغطت ام سلمة وجهها وقالت يا رسول الله او تحتلم
المرأة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها (متفق
عليه) وزاد مسلم برواية ام سليم ان ماء الرجل غليظ ابيض
وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه -

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? তিনি বলেন, হাঁ, যখন সে বীর্যপাতের চিহ্ন দেখতে পায়। উম্মে সালামা (রা) লজ্জাবশত মুখমন্ডল ঢেকে নেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বলেনঃ হাঁ, তোমার ডান হাত ধুলিমলিন হোক। বাচ্চা মায়ের সাদৃশ্য কিভাবে পায় (বুখারী, মুসলিম)।

মুসলিমে উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় আরো আছেঃ পুরুষদের বীর্য গাড় ও সাদা এবং মহিলাদের বীর্য পাতলা এবং হলুদ বর্ণ। এর মধ্যে যার বীর্যের প্রভাব অধিক হয় সন্তান তার সাদৃশ্য পায়।"

عن معاذة قالت قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بينى وبينه فيبادرنى
حتى اقول دع لى قالت وهما جنبان -

"মুআযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও রসূলুল্লাহ (স) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমাদের উভয়ের মাঝখানে রাখা থাকত। তিনি আমার চেয়ে দ্রুত (গোসল) করতেন, এমনকি আমি বলতাম, আমার জন্য (পানি) অবশিষ্ট রাখুন। মুআযা বলেন, তাঁরা উভয়ে তখন নাপাকীর গোসল করতেন।"

عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل الذى يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه - قالت ام سليم هل على المرأة ترى ذالك غسلا قال نعم ان النساء شقائق الرجال -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে (পরিধেয় বস্ত্র) ভিজা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষ হয়েছে কি না তা স্মরণ করতে পারছে না। তিনি বলেনঃ সে গোসল করবে। আরও এক ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞাসা করা হয় যার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে কিন্তু ভিজা দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বলেনঃ তার উপর গোসল অপরিহার্য নয়। উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, যদি মেয়েরা তা দেখে তবে তাদের কি গোসল করতে হবে? তিনি বলেনঃ হাঁ, মেয়েরা পুরুষদের অর্ধাংশ।"

وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا -

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যৌনাংগের অগ্রভাগ পরস্পরের সাথে যুক্ত হলেই গোসল অপরিহার্য হয়। আমি ও রসূলুল্লাহ (স) এরূপ করেছি এবং গোসল করেছি।"

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بى قبل ان اغتسل -

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নাপাকির গোসল করার পর (পুনরায় সংগম করার জন্য) আমার সাথে মিশে শরীর গরম করতেন আমার গোসলের পূর্বে।"

عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبى صلى الله عليه وسلم

من اناء واحد وكلانا جنب وكان يامرني فاتزر فيباشرني و انا

حائض ويخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض ـ

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) এবং আমি একই পাত্র থেকে পানি তুলে গোসল করতাম–এই অবস্থায় যে, আমরা উভয়ে নাপাক ছিলাম। আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় তিনি আমাকে শক্ত করে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন এবং আমার সাথে আলিংগনাবদ্ধ হতেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় নিজের মাথা (মসজিদের বাইরে) বের করে দিতেন এবং আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।"

عن عائشة كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله

عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب واتعرق العرق وانا

حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على

موضع فيّ ـ

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় পাত্র থেকে পান করতাম, অতপর তা মহানবী (স)–এর দিকে এগিয়ে দিতাম। তিনি পাত্রের ঠিক সেই স্থানে মুখ লাগাতেন যেখানে আমার মুখ লেগেছে, অতপর পানি পান করতেন। আমি হায়েয অবস্থায় হাড় থেকে গোশত ছিঁড়ে খেতাম, অতপর তা মহানবী (স)–কে দিতাম এবং তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে তা খেতেন।"

عن عائشة قالت كنت اذا حضت نزلت عن المثال على الحصير

فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر ـ

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত হলে বিছানা ত্যাগ করে চাটাইয়ের উপর আশ্রয় নিতাম। অতপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকটবর্তী হতাম না।"[১]

রায়ের মূলপাঠে এ হাদীসের নকলকৃত শব্দাবলী ও অনুবাদ কিছু কিছু ভুল ছিল যার ফলে হাদীসের তাৎপর্য বিকৃত হয়ে যায়। এখানে সেসব ত্রুটি সংশোধন করে দেয়া হয়েছে–(গোলাম আলী)।

وعنها قالت قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد فقلت انى حائض فقال ان حيضتك ليست فى يدك ۔

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) আমাকে বললেনঃ মসজিদ থেকে চাটাই তুলে আমাকে দাও। আমি বললাম, আমি হায়েয অবস্থায় আছি। তিনি বলেনঃ হায়েযের (চিহ্ন) তোমার হাতে তো লেগে নেই (অর্থাৎ তুমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে মসজিদ থেকে চাটাই নিত পার)।"

২৭. উপরোক্ত অনেকগুলো হাদীসে যে বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)-র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, এই দুজন স্ত্রী যাঁরা যে কোন দিক থেকে পূর্ণাংগ ছিলেন, তাঁরা এতটা ল্যাংটাভাবে নিজেদের এসব গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে থাকবেন যা তাদের ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘটে থাকবে।

২৮. আমি নিজেকে একথা বিশ্বাস করাতে পারছি না, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) একথা বলে থাকবেন যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী এবং জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব।

عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير أن اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء ۔

"উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম এবং (দেখতে পেলাম) তাতে যেসব লোক প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ ছিল দরিদ্র মিসকীন, এবং সম্পদশালী লোকদের প্রতিরোধ করে রাখা হল। এছাড়া যেসব লোক দোযখে যাওয়ার উপযোগী তাদের দোযখে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হল। আমি দোযখের দরজায় দরজায় দাঁড়ালাম এবং (দেখতে পেলাম যে,) তাতে প্রবেশকারী অধিকাংশই নারী।"

---

১. রায়ের মূল পাঠে غَيْرَ اَنَّ -এর অনুবাদ In anahion to উল্লেখ আছে। এই অনুবাদ সঠিক নয়-(গোলাম আলী)।

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি জান্নাতে উকি মেরে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। আমি দোযখের দিকে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ বাশিন্দা নারী।"

২৯. এর অর্থ কি এই যে, মুসলমানদের জন্য যে কোন উপায়ে ধনসম্পদ উপার্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে? কেননা তারা যদি ধনসম্পদ উপার্জন করে তাদের জান্নাতে প্রবেশের সম্ভাবনা কম থাকবে। সকল মুসলমান যদি গরীব হয়ে যায় তবে তাদের কি অবস্থা হবে? তারা কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে না? এভাবে কি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উন্নতি ব্যাহত হবে না? উপরন্তু এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, বুখারীর ৮৫২ পৃষ্ঠায় ৭৪/৬০২ নং রিওয়ায়াতে আবদুল্লাহ ইবনে কায়সের সূত্রে বর্ণিত, "জান্নাতে একটি তাঁবুর বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট নারীদের সাথে মুসলমানরা সহবাস করবে"–এরূপ কথা কি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) বলে থাকবেন? হাদীসসমূহ এবং কুরআনের প্রাচীন তাফসীরসমূহ ইসলামের সীমা–পরিসীমা সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং তার ব্যাপকতা সীমিত হয়ে পড়ে আছে। এই অবস্থা বহাল থাকতে দেয়া কি আমাদের উচিৎ?

৩০. বিতর্কের খাতিরে যদি এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস সংকলন করেছেন তা সঠিক, তবুও একথার সাক্ষ্য বর্তমান আছে যে, এসব হাদীসের সম্পর্ক যদি দীনের সাথে না হয়ে থাকে তবে রসূলুল্লাহ (স) এগুলোকে 'শেষ কথার' মর্যাদা দিতে চাইতেন না। মুসলিম শরীফে নিম্নোক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছেঃ

عن رافع بن خديج قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت فذكروا ذلك له فقال انا بشر اذا امرتكم بشيئ من امر دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيئ من رائ فانما انا بشر۔

"রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) মদীনায় এসে দেখতে পান যে, মদীনার লোকেরা পুরুষ খেজুর গাছের কেশর স্ত্রী খেজুর গাছের কেশরের সাথে যুক্ত করছে। তিনি বলেনঃ তোমরা কি করছ? তারা বলল, আমরা আগে থেকে এমনটি করে আসছি। তিনি বললেনঃ তোমরা যদি তা না করতে তবে মনে হয় ভালো হত। অতএব তারা একাজ ত্যাগ করে। ফলে খেজুরের ফলন কমে যায়। তারা একথা তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দীনের ব্যাপারে তোমাদের কোন নির্দেশ দিই তা গ্রহণ কর। আর আমি যখন নিজের রায় থেকে কিছু বলি, সেক্ষেত্রে আমি একজন মানুষই"।

এছাড়া একাধিক হাদীসে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, শুধু কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিৎ।

৩১. স্বয়ং হাদীসবেত্তাগণ নিজেদের সংগ্রহকৃত হাদীসসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না–শুধু এই একটি মাত্র বাস্তব ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা মুসলমানদের বলেন না যে, তোমরা আমাদের জমাকৃত হাদীসগুলো যথার্থ বলে গ্রহণ কর। বরং তাঁরা বলেন, এগুলোকে আমাদের উদ্ভাবিত হাদীসের যথার্থতা যাচাইয়ের মানদন্ডে যাচাই করে তোমরা নিশ্চিন্ত হও। এসব হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁরা যদি নিশ্চিত হতেন তবে যাচাইয়ের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিস্প্রয়োজন।"

৩২. এমন কতিপয় হাদীস রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টি এই জগত থেকে ফিরিয়ে দেয়। আধ্যাত্মিকতা একটি উত্তম জিনিস, কিন্তু অনর্থক এটাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর অনুমতি ইসলাম আমাদের দেয় না। মূলগতভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষ বানিয়েছেন এবং তিনি চান যে, আমরা মানুষ হিসাবেই জীবন যাপন করি। তিনি যদি চাইতেন যে, আমরা আধ্যাত্মিক জীব অথবা ফেরেশতা হয়ে যাই তবে তার জন্য এর চেয়ে সহজ কথা আর কিছুই ছিল না যে, তিনি আমাদের তাই বানাতেন। যথার্থ ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলমানদের শক্তি ও সম্পদ শুধুমাত্র জীবনকে ফলপ্রসূ, উন্নততর এবং পরিপূর্ণরূপে সৌন্দর্যময় করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিৎ।

৩৩. আমরা হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করলে জ্ঞাত হতে পারি যে, অধিকাংশ হাদীস খুবই সংক্ষিপ্ত ও সম্পর্কহীন যা পূর্বাপর সম্পর্কে ও যথাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করা এবং এর

যথার্থ তাৎপর্য ও দাবী নিরূপণ করা সম্ভব নয়–যতক্ষণ তার পূর্বাপর সম্পর্কের বিষয়টি সামনে না রাখা হবে এবং সেই পরিস্থিতি জ্ঞাত না হওয়া যাবে যে অবস্থায় রসূলে পাক কোন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন। যাই হোক হাদীস শাস্ত্রের সম্পূর্ণ নতুনভাবে যাচাই–বাছাই ও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। একথা বলা হয়েছে এবং যথার্থই বলা হয়েছে যে, হাদীস কুরআনের বিধানসমূহ রহিত করতে পারে না। কিন্তু অন্ততপক্ষে একটি বিষয়ে তো হাদীসসমূহ কুরআন পাকের সংশোধন করে ছেড়েছে, এবং তা ওসিয়্যাতের বিষয়টি। হাদীসসমূহ সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা ও বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হচ্ছি যে, এগুলোকে তার বর্তমান আকারে কুরআনের সমান মর্যাদা দেয়া উচিৎ নয়, আর তার প্রয়োগকে সাধারণ মনে করাও উচিৎ নয়। মুহাদ্দিসগণের সংগৃহীত হাদীসসমূহকে ইসলামী আইনের উৎসসমূহের মধ্যে একটি উৎস হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী আমি নই–যতক্ষণ না তা পুনর্বার পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হবে এবং এই পরীক্ষা–নিরীক্ষাও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী এবং গোঁড়ামির উপর ভিত্তিশীল হওয়া উচিৎ নয়। বরং ইমাম বুখারী প্রমুখ অসংখ্য মিথ্যা, মনগড়া ও জাল হাদীসসমূহ থেকে সহীহ হাদীসসমূহ পৃথক করার জন্য যে নীতিমালা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করেছিলেন তাও সম্পূর্ণ নতুনভাবে ব্যবহার করতে হবে। অনন্তর বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতা আমাদের যেসব মানদন্ড দান করেছে তাও কাজে লাগাতে হবে।

আমার আরও একটি মত এই যে, বর্তমান বাস্তব অবস্থার আলোকে কিয়াস ও ইসতিদলাল–এর নাজুক সূক্ষ্ম পন্থাসমূহ কাজে লাগিয়ে বিচারকদের এবং জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কুরআন পাকের তাফসীর রচনা করতে হবে। আবু হানীফা ও অনুরূপ অপরাপর ফকীহ্‌গণ যেসব সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন এবং যা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে সেগুলোকে নজীর হিসাবে এতটুকু মর্যাদা দেয়া যেতে পারে যা সাধারণ বিচারালয়সমূহের রায়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। কুরাআন মজীদে উল্লেখিত বিধান স্থবির নয়, সক্রিয় এবং সুশৃংখল। সেইসব মানবীয় কর্মপন্থার সাথে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যার ঐক্য ও সংগতি থাকা উচিৎ যা বর্তমান পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বিভিন্ন উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবু হানীফার মত পার্থিব বিষয়সমূহের পর্যালোচনায় জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের আইন ব্যাপকভাবে রদবদলের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেগুলোকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য।

[এরপর ৩৪ নং প্যারা থেকে ৪১ নং প্যারা পর্যন্ত বিজ্ঞ বিচারক আপীল মামলার মীমাংসাযোগ্য বিষয় অর্থাৎ অভিভাবকত্বের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এই রায় ব্যক্ত করেছেন যে, হাদীস সংকলকগণের রিওয়ায়াতসমূহকে যদি সঠিক এবং কুরআনের মত তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করেও নেয়া হয়, তবুও তা থেকে অভিভাবকত্বের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ব্যক্তিগত আইনের সমর্থন পাওয়া যায় না। যদিও রায়ের এই অংশ সম্পর্কেও গভীর চিন্তা ও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে, তথাপি তা যেহেতু মূল সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তা আলোচনার আওতায় টেনে আনা উদ্দেশ্য নয়–তাই এর অনুবাদও এখানে দেয়া হয়নি। এই অংশ মূল রায়ের ইংরেজী অংশে দেখা যেতে পারে]।

রায়ের পর্যালোচনা

—সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী

কিছুকাল যাবত আমাদের বিচারালয়সমূহের কোনো কোনো বিচারকের বক্তব্য, বিবৃতি ও লেখায় সুন্নাহ্ (হাদীস)–এর যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ এবং তাকে ইসলামী আইনের ভিত্তি মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রবণতা বেড়েই চলছে। এমনকি কোন কোন বিচার বিভাগীয় রায়ে পর্যন্ত এ জাতীয় ধারণা প্রতিভাত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আজ থেকে তিন–চার বছর পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছেঃ

"হাদীসের ব্যাপারেই আসল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যা সুন্নাহ্ বা রাসূলের আমল ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে। প্রথমত এটা তো বাস্তব ঘটনা যে, কোন বিশেষ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত হওয়া থেকে খুব কমই নিরাপদ আছে। অধিকন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে তো মহানবীর প্রামাণ্য সুন্নাত থেকেও কোন কোন খলীফায়ে রাশেদ বিশেষত হযরত উমার (রা) সরে দাঁড়িয়েছেন। এর বিভিন্ন উদাহরণ উর্দূ ভাষায় একটি উত্তম (?) পুস্তিকায় সংকলন করা হয়েছে, যা করাচীস্থ ইদারয়ে তুলূয়ে ইসলাম "ইসলাম মে কানূনসাযী কে উসূল" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশ করেছে। আমি এ গ্রন্থের যথেষ্ট সহায়তা গ্রহণ করেছি।....এখানে আমার জন্য একথা বলা জরুরী নয় যে, সুন্নাতের ওহীভিত্তিক হওয়ার দলীল–প্রমাণ মোটেই শক্তিশালী নয়"–(পি.এল.ডি., নভেম্বর ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১০১২–১৩)।

এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন বিচারপতি মুহাম্মাদ শফী সাহেবের পর্যালোচনাধীন রায়ে এক চরম সুস্পষ্ট ও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের দল তার পুরা সুযোগ নিচ্ছে। তাই আমরা এই রায়ের বিস্তারিত বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা করা এবং দেশের বিচারালয়সমূহের বিচারক ও আইনজ্ঞদেরকে এই চিন্তাধারার দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করি। যে মামলার এই রায় দেয়া হয়েছে তার বিবরণ সম্পর্কে আমাদের মোটেই কোন বিতর্ক নেই, এবং বিজ্ঞ বিচারপতি এর যে ফয়সালা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করতে চাই না। এই রায়ে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্হ–এর মর্যাদা সম্পর্কে যে মৌলিক সমস্যার কথা উত্থাপন করা হয়েছে, আমাদের আলোচনা তার মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই।

দুটি মূলনীতিগত প্রশ্ন

এই প্রসংগে মূল রায়ের উপর পর্যালোচনা শুরু করার পূর্বে দুটি মূলনীতিগত প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে। প্রথম প্রশ্ন আদালতের এখতিয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী আইন সম্পর্কে চৌদ্দশত বছর থেকে একথা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে আসছে যে, কুরআনের পর এর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাত। এই শতাব্দীগুলোর দীর্ঘ পরিক্রমায় এই আইনের উপর যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থকার যা কিছুই লিখেছেন, চাই তিনি মুসলমান হোন অথবা অমুসলিম, তাঁরা এ সত্য স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন School of thought অথবা এমন কোন ফকীহ্‌র (jurist) বরাত দেয়া যাবে না মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক যাঁর অনুসরণ করেছে, অথচ তিনি সুন্নাতকে আইনের উৎস হিসাবে মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকবেন। অবিভক্ত ভারতে যে 'এ্যাংলো–মোহামেডান ল' প্রচলিত ছিল তার মূলনীতিতেও সব সময় এই পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন পরিষদেরও এমন কোন সিদ্ধান্ত আসেনি যার আলোকে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহে এই মৌলিক রদবদল করা হয়ে থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থায় কোন একক বিচারক, অথবা কোন হাইকোর্ট, বরং স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টও কি আইনের মধ্যে এই মৌলিক পরিবর্তন সাধনের অধিকার রাখে? যতদূর আমাদের জানা আছে, বিচারালয় স্বতন্ত্রভাবে কোন আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান নয়। আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা ও আইন যেসব নীতিমালার উপর ভিত্তিশীল তার অলোকে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আইন অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে বিচারালয়সমূহ বাধ্য। তারা আইনের ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে পারবে এবং বিচারব্যবস্থায় তাদের ব্যাখ্যা নিসন্দেহে আইনের মর্যাদা পাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানে একথা আসেনি যে, তারা স্বয়ং আইন অথবা তার স্বীকৃত মূলনীতির মধ্যে রদবদল করার অধিকার রাখেন। আমরা জানতে চাই, বিচারালয়সমূহ এই অধিকার কবে এবং কোথা থেকে লাভ করেছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আইনের ক্ষেত্রে এ ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের অধিকার মূলত কার? এ সময় পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্কে দাবী এই যে, এই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের নীতিমালার উপর কায়েম হয়েছে এবং গণতন্ত্রের কোন অর্থই হতে পারে না যদি তাতে নাগরিকদের অধিকাংশের কাংখিত সরকার না হয়। এখন যদি পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ জনমত যাচাইয়ের (Referendum) ব্যবস্থা করা হয় তবে আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, তাদের প্রতি দশ হাজারে ৯,৯৯৯ জনেরও অধিক সংখ্যক লোক এই

আকীদা ব্যক্ত করবে যে, কুরআনের পর সুন্নাতে রসূল ইসলামী আইনের অপরিহার্য ভিত্তি। এর সাথে দ্বিমত পোষণকারী খুব সম্ভব দশ হাজারে একজনও পাওয়া যাবে না। এই অবস্থা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে–ইসলামী আইনের উৎসসমূহের মধ্য থেকে সুন্নাতকে বাদ দেয়া বিচারালয়ের কোন বিচারকের এখতিয়ারাধীন আছে কি? অথবা কোন সরকার তা করতে পারে কি? অথবা আইন প্রণয়নকারী কোন সংস্থার এরূপ এখতিয়ার থাকতে পারে কি? এসব প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয়া যেত যদি এখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকত। কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি এর ইতিবাচক জওয়াব কিভাবে দিতে পারে? যতক্ষণ না এখানে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত মৃত্যু হবে, ততোক্ষণ কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষে নিজের খেয়াল খুশিমত এখানে নিজের এখতিয়ার প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বরং সে এখানে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী নিজের ক্ষমতার প্রয়োগ করতে বাধ্য। বিচারকদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি কিছুটা অধিক শক্তিশালী ধারণা পোষণ করেন, তাদের জন্য এই সোজা রাস্তা খোলা আছে যে, বিচারকের পদে ইস্তফা দিয়ে নিজের পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা মুসলিম সর্বসাধারণের আকীদা–বিশ্বাসের পরিবর্তন করায় ব্যয় করুন। কিন্তু তিনি যতক্ষণ কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন পদে আসীন আছেন, ততক্ষণ এই পরিবর্তনের জন্য নিজের ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারবেন না। এটা গণতন্ত্রের পরিষ্কার যৌক্তিক দাবী। তা অস্বীকার করার মত কিছু যুক্তি প্রমাণ যদি কারো কাছে থেকে থাকে তবে তা আমরা জানতে চাই।

উপরোক্ত দুটি নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা যে দৃষ্টিভংগী উপরে পেশ করেছি তা যদি সঠিক বলে স্বীকার করা হয়, তবে বিচারালয়ের মর্যাদার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রেখে আমরা আরজ করব, বিজ্ঞ বিচারপতির জন্য তার নিজের এই বিশেষ চিন্তাধারা তার একটি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে বিবৃত করা ঠিক ছিল না। তিনি তা ব্যক্তিগতভাবে একটি প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলে এতটুকু আপত্তিকর হত না। সে অবস্থায় অধিকতর স্বাধীনভাবে এর উপর আলোচনা হতে পারত এবং বিচারালয়ের সম্মান হানির ভয়ও থাকত না।

হানাফী ফিক্হ– এর আসল মর্যাদা

এখন আমরা মূল রায়ের নীতিগত আলোচনার উপর দৃষ্টি দেব। তা পাঠান্তে পাঠকদের সামনে এসেছে যে, এটা অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত একটি মামলার রায়। এ প্রসংগে অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হানাফী ফিক্হ –এর নীতিমালার বরাত দিয়ে বিজ্ঞ বিচারক বলেছেন, ইংরেজদের শাসনামলে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত সমস্ত

বিচারালয় এসব নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ করত এবং এর কারণ তার রায়ে এই বলা হয়েছেঃ

"ইংরেজগণ অথবা অন্য কোন অমুসলিম জাতি স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী কুরআন পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করুক এবং আইন প্রণয়ন করুক, তা মুসলিম আইনজ্ঞগণ পছন্দ করতেন না। মুসলিম আইনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে ফাতওয়া আলমগীরী নামক গ্রন্থের যে গুরুত্ব রয়েছে তা এই সত্যের প্রতি দিকনির্দেশ করে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে"-(প্যারাগ্রাফ ৪)।

অতপর অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হানাফী আইনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর তিনি পুনরায় এই প্রশ্ন তোলেনঃ

"এসব নিয়ম কানূনকে কি কোন পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে ইসলামী আইন বলা যেতে পারে, যা সেই অত্যাবশ্যকীয় বিধানের মর্যাদা পেতে পারে, গ্রন্থবদ্ধ আইনের যে মর্যাদা রয়েছে"? (প্যারা ৭)।

আমাদের ধারণামতে এই রায় প্রকাশের সময় সেইসব কার্যকারণের উপর বিজ্ঞ বিচারপতির দৃষ্টি ছিল না, যেগুলোর ভিত্তিতে হানাফী আইন শুধু ইংরেজ যুগেই নয় এবং শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরং তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ইসলামী দুনিয়ার এক বিরাট অংশে ইসলামী আইন হিসাবে স্বীকার করা হচ্ছে। তিনি এর একটি খুবই হালকা ও ক্ষুদ্র আনুষংগিক কারণের উল্লেখ করেছেন, আর এ কারণেই তার নিম্নোক্ত বক্তব্যও প্রকৃত ঘটনার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে নাঃ "এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।"

ইসলামী আইনের ইতিহাস সম্পর্কে যারা অবহিত আছেন তাদের সামনে একথা গোপন নয় যে, খিলাফতে রাশেদার স্থলে রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কায়েম হওয়ায় ইসলামের আইন ব্যবস্থায় এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যা এক শতকের অধিক কাল অব্যাহত ছিল। খিলাফতে রাশেদায় 'শূরা' (পরামর্শ পরিষদ) ঠিক সেই কাজ করত যা বর্তমান কালে একটি আইন পরিষদ করে থাকে। মুসলিম রাষ্ট্রে এমন যেসব সমস্যার উদ্ভব হত যে সম্পর্কে একটি আইনগত বিধানের প্রয়োজন পড়ত, খলীফার মজলিসে শূরা তার উপর আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের আলোকে সামষ্টিক চিন্তাভাবনা ও ইজতিহাদের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন এবং সেই সিদ্ধান্ত সমগ্র দেশে আইন হিসাবে কার্যকর হতো। কুরআন মজীদের কোন নির্দেশের ব্যাখ্যায় মতভেদ দেখা দিলে অথবা রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের তথ্যানুসন্ধানে

অথবা নতুনভাবে উদ্ভুত কোন সমস্যার উপর শরীআতের মূলনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হলে মজলিসে শূরার সামনে এরূপ প্রতিটি মতভেদ যে কোন সময় পেশ করা হত এবং ইজমা (ঐক্যমত) অথবা অধিকাংশের মতে সে সম্পর্কে যে ফয়সালাই হত তা আইনে পরিণত হত। খেলাফতে রাশেদার ঐ মজলিসের এই মর্যাদা কেবলমাত্র রাজনৈতিক শক্তিবলে অর্জিত হয়নি, বরং খলীফা ও তাঁর 'শূরার' সদস্যদের খোদাভীরুতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং দীন সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর মুসলিম জনসাধারণের আস্থাই ছিল এই মর্যাদার মূল কারণ।

এই ব্যবস্থা যখন অবশিষ্ট থাকল না এবং রাজতান্ত্রিক সরকার এর স্থান দখল করে নিল, তখন রাষ্ট্রপ্রধান যদিও মুসলিম ছিল এবং তার কর্মচারীবৃন্দ ও সভাসদগণও মুসলিম ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর খোলাফায়ে রাশেদীনের মত রায় প্রদানের দুঃসাহস দেখাতে পারত না। কারণ তারা নিজেরাই জানত যে, তাদের উপর মুসলিম জনসাধারণের আস্থা নেই এবং তাদের সিদ্ধান্ত ইসলামী আইনের অংশ হতে পারে না। তারা যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের শূরার অনুরূপ মুসলিম জনগণের আস্থাভাজন, খোদাভীরু ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মজলিস গঠন করত এবং তাকে শূরার অনুরূপ মর্যাদা দিত তবে তাদের বাদশাহী অচল হয়ে পড়ত। তারা যদি নিজেদের মনোপূত লোকদের সমন্বয়ে মজলিসে শূরা গঠন করে সিদ্ধান্ত জারি করা শুরু করত তবে মুসলমানগণ তাদের এসব সিদ্ধান্তকে শরীআত ভিত্তিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হত না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু চাপিয়ে দেয়া শক্তির পতনের সাথে সাথে এগুলো তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারত। এগুলোর শরীআতের একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে টিকে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

এই অবস্থায় ইসলামী আইন ব্যবস্থার মধ্যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। খিলাফতে রাশেদার আমলে বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়াবলী সম্পর্কে ইজমার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা তো গোটা রাষ্ট্রে আইন হিসাবে কার্যকর থাকে, কিন্তু এরপর থেকে উদ্ভুত সমস্যাবলী ও বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যা, সুন্নাতের পর্যালোচনা এবং ইজতিহাদী শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদান করার মত কোন প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল না, যার ফলে তা দেশের আইন হিসাবে স্বীকৃত পেতে পারত। এই যুগে বিভিন্ন কাযী (বিচারক) ও মুফতী (আইনের ভাষ্যকার) ব্যক্তিগতভাবে যেসব ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে থাকেন তা তাদের প্রভাবাধীন ও ক্ষমতাধীন এলাকায় কার্যকর হতে থাকে। এসব বিচ্ছিন্ন ফতোয়া ও সিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা দেশের মধ্যে আইনগত

নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন একটি আইনও ছিল না যা সমভাবে সমস্ত বিচারালয়ে কার্যকর হতে পারত এবং তদনুযায়ী সমস্ত প্রশাসন বিভাগ কার্য পরিচালনা করতে পারত। আব্বাসী খলীফা মানসূরের রাজত্বকালে ইবনুল মুকান্না এই বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য গুরুতরভাবে অনুধাবন করেন এবং খলীফাকে এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু খলীফা নিজের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে স্বয়ং অবগত ছিলেন। তিনি অন্তত এতটা হাস্যকর ভুলের উপর ছিলেন না যতটা ভুলের উপর আজকালকার একনায়কগণ আছেন। তাঁর সভাপতিত্বে এবং তাঁর নিজের মনোনীত লোকদের হাতে যে বিধান প্রণীত হবে এবং তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে তা কতজন মুসলমান শরীআতের বিধান হিসাবে মান্য করবে সে সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন।

প্রায় এক শতাব্দীকাল এ অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই শূন্যতা পূরণের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি কোন রাজনৈতিক শক্তি এবং কোন আইনানুগ মর্যাদার অধিকারী হওয়া ছাড়াই নিজের হাতে গড়ে তোলা ছাত্রদের একটি বেসরকারী আইন পরিষদ (Private Legislature) গঠন করেন। এখানে কুরআনিক বিধানসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সুন্নাতসমূহের পর্যালোচনা, পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণের ইজমা ভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহের অনুসন্ধান, সাহাবা, তাবিঈন ও তাবউ তাবেঈনের ফতোয়াসমূহের যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যাবলীর উপর শরীআতের নীতিমালার প্রয়োগ ইত্যাদি কাজ ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল এবং পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে ইসলামের পুরো আইন-কানূন সংকলন করে রাখা হয়। এই আইন কোন বাদশার মর্জি মাফিক সংকলন করা হয়নি। কোন শক্তি এর পেছনে ছিল না যার মাধ্যমে তা কার্যকর হত। কিন্তু পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই তা আব্বাসী রাজত্বের আইনে পরিণত হয়ে গেল। তার কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তা এমন সব লোকের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল যাদের সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারণের দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, খোদাভীরু, সঠিক ইসলামী চিন্তাধারার অধিকারী, ইসলাম-বিরোধী চিন্তাধারা ও মতবাদ তাদের প্রভাবিত করতে পারে না এবং ইসলামী আইন-বিধান রচনায় নিজেদের অথবা অপর কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ, ঝোঁক প্রবণতা বা কামনা-বাসনাকে অনু পরিমাণ প্রবেশাধিকার দেয়ার মত লোক তাঁরা নন। মুসলমানগণ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে, তাঁরা অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণার পর শরীআতের যে বিধানই বর্ণনা করবেন তার মধ্যে মানবীয় ভুলত্রুটি তো হতে পারে, কিন্তু আদর্শহীন ও লাগামহীন গবেষণা অথবা ইসলামে অনিসলামের মিশ্রণের কোন আশংকা তাদের ক্ষেত্রে নেই। এই খালেছ নৈতিক শক্তির প্রভাব এই ছিল যে,

প্রথমে প্রাচ্যের মুসলিম জনসাধারণ স্বয়ং তাকে ইসলামী আইন হিসাবে স্বীকার করে নেয় এবং নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। অতপর এগুলোকে আব্বাসী সালতানাত আইন হিসাব মেনে নিয়ে দেশের আইন-বিধানরূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অতপর সেই নৈতিক বলে এই আইন-বিধান মুসলিম পাশ্চাত্যের তুর্কী সালতানাতের এবং প্রাচ্যে ভারতের মুসলিম রাজত্বের আইন-বিধানে পরিণত হয়।[১]

পরের শতাব্দীগুলোতেও এই সব আইন ঠিক সেই স্থানে স্থবির হয়ে থাকেনি, যেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহ) তা রেখে গিয়েছিলেন। বরং প্রতিটি শতকে এর মধ্যে অনেক সংস্কার হয়েছে এবং নতুন সমস্যার সমাধানও তাতে শামিল হতে থেকেছে। যেমন যাহিরু রিওয়ায়াতের গ্রন্থাবলী এবং পরবর্তী কালের ফতোয়ার কিতাবসমূহের মধ্যে তুলনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের এসব কাজও সরকারী প্রভাবের সম্পূর্ণ বাইরে থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ফতোয়া প্রতিষ্ঠানসমূহে হতে থাকে। কারণ মুসলিম বাদশাহগণ এবং তাদের আমীর-ওমরা ও প্রশাসকগণের জ্ঞানের পরিধি ও খোদাভীতি সম্পর্কে মুসলিম জনগণের আস্থা ছিল না, খোদাভীরু আলেমগণের প্রতিই তাদের আস্থা ছিল। তাই তাদের ফতোয়াসমূহ এই আইনের অংশে পরিণত হতে থাকে এবং তাদের হাতে ইসলামী আইনের ক্রমোন্নতি হতে থাকে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত বাদে এই গোটা শতকসমূহে কোন নিকৃষ্টতম বাদশাও নিজের সম্পর্কে এই ভুল ধারণার শিকার হয়নি যে, সে একটি আইন-বিধান রচনা করবে আর মুসলমানগণ তা বিনা প্রতিবাদে শরীআতের বিধান হিসাবে মেনে নেবে। আওরাংযেবের মত খোদাভীরু শাসকও সমকালীন বিশিষ্ট আলেমগণকেই একত্র করেন যাদেরকে মুসলমানগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর পর ইমাম মালেক (রহ) ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দেন। তাও কেবলমাত্র নৈতিক শক্তি বলে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যসমূহের আইন-বিধানে পরিণত হয়। অতপর ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং তাঁর পরে ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (রহ) সম্পূর্ণ বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী আইনের পরিপুষ্টি সাধন করতে থাকেন এবং তাও শুধুমাত্র মুসলিম জনসাধারণের সম্মতিতে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অনুরূপভাবে যায়দী ও জাফরী ফিক্হসমূহও বিভিন্ন লোক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলন করেন এবং তাও কেবলমাত্র নিজের নৈতিক বলে শীআ রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়। অতপর আহলে হাদীসগণের দৃষ্টিভংগীতে যে ফিক্হী বিধান প্রণীত হয় তাকেও কোন রাজনৈতিক প্রভাব ব্যতীত লাখো মুসলমান নিজেদের মর্জিমত নিজেদের জীবনের বিধান হিসাবে গ্রহণ করেছে।

থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করত এবং তাদের সহায়তায় তিনি হানাফী ফকীহ্গণের ফতোয়ার সংকলন তৈরী করে তাকে আইন–বিধান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এই আলোচনা থেকে তিনটি কথা সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

(এক) হানাফী ফিক্হ, যা ইংরেজদের আগমনের শতশত বছর পূর্ব থেকে প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের আইন–বিধান ছিল এবং যাকে ইংরেজরা আগমন করে তাদের গোটা শাসনকালে অন্তত ব্যক্তিগত আইনের সীমা পর্যন্ত মুসলমানদের আইন হিসাবে মান্য করতে থাকে, তা মূলত মুসলমানদের সাধারণ সম্মতি ও পছন্দের ভিত্তিতে আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তা কোন রাজনৈতিক শক্তি কার্যকর করেনি, বরং এসব দেশের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাকে ইসলামী আইন হিসাবে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করতে থাকে এবং সরকারসমূহ তাকে এজন্য আইন হিসাবে গ্রহণ করে যে, এসব দেশের মুসলমানগণ তাছাড়া অন্য কোন জিনিসের আনুগত্য অন্তর ও বিবেকের প্রশান্তি সহকারে করতে পারত না।

(দুই) মুসলমানগণ যেভাবে ইংরেজ আমলে নিজেদের দীন ও শরীআত ইংরেজ বা অপর কোন অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না, অনুরূপভাবে তারা উমাইয়্যা যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কখনও এমন কোন মুসলমানের হাতেও তাদের দীন ও শরীআত অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল না এবং নেই যাদের ধর্মীয় জ্ঞান, খোদাভীতি ও সাবধানতা সম্পর্কে তারা আশ্বস্ত নয়।

(তিন) এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া তো দূরের কথা, আংশিকও পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজদের পরিবর্তে কেবল মুসলমানদের সিংহাসনে আসীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে স্বয়ং কোন চমকপ্রদ পার্থক্য নেই। খেলাফতে রাশেদার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমা পর্যন্ত তা এখনও পূর্ববৎ অবশিষ্ট রয়েছে। আর এই শূন্যতা ততক্ষণ পর্যন্ত বিরাজ করতে থাকবে যতক্ষণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন খোদাভীরু ফকীহ্ সৃষ্টি করতে না পারবে যাদের জ্ঞান ও তাকওয়ার উপর মুসলমানগণ আস্থা স্থাপন করতে পারে, এবং আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা উল্লেখিত ধরনের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের আইন রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত না করবে। আমরা যদি এ দেশে আমাদের জাতির বিবেক ও আইনের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে না চাই তবে যতক্ষণ না এই শূন্যতা বাস্তবিকই সঠিক পন্থায় পূর্ণ হবে, ততক্ষণ তা অসার বস্তু দিয়ে পূর্ণ করার কোন চেষ্টা না করাই উচিৎ।

বিজ্ঞ বিচারপতির মৌলিক দৃষ্টিভংগী

এরপর প্যারা ৮ থেকে ১৬ পর্যন্ত বিজ্ঞ বিচারপতি ইসলামী আইন সম্পর্কে নিজের কিছু দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করেন যা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপঃ

১. ইসলামের আলোকে একজন মুসলমানের উপর তার জীবনের প্রতিটি শাখায় যে আইন প্রভাবশীল হওয়া উচিৎ, চাই তা তার জীবনের ধর্মীয় শাখা হোক, অথবা রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক শাখা হোক, তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আইন।

২. কুরআন যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তার আওতার মধ্যে থেকে মুসলমানদের চিন্তা করার ও কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. আইন যেহেতু মানুষের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপকারী শক্তি, তাই আল্লাহ তাআলা আইন প্রণয়নের সার্বিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। ইসলামে কোন ব্যক্তির এমনভাবে কাজ করার এখতিয়ার নাই যার ফলে মনে হতে পারে যে, সে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

৪. রসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা এই ছিল যে, তাঁরা যা কিছু করতেন মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন। ইসলামের মূল আকীদা স্বীয় মেজাজের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ব্যক্তির অন্যদের উপর প্রাধান্যকে নাকচ করে দেয়। তা সামগ্রিক চিন্তা ও কর্মের পথ দেখায়।

৫. এই দুনিয়ায় যেহেতু মানবীয় অবস্থা ও সমস্যাবলীর পরিবর্তন হতে থাকে, তাই এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় স্থায়ী ও অপরিবর্তনযোগ্য বিধান চলতে পারে না। স্বয়ং কুরআনও এই সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম নয়। এ কারণে কুরআন বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় ব্যাপক ও সাধারণ নীতিমালা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য দিয়ে দিয়েছে।

৬. কুরআন সহজ-সরল ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তা বুঝতে পারে! তা পড়ার এবং অনুধাবন করার অধিকার এক-দুই ব্যক্তির জন্য একচেটিয়া নয়। সমস্ত মুসলমান ইচ্ছা করলে বুঝতে পারে এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারে। এই অধিকার সব মুসলমানকে দেয়া হয়েছে এবং তা কেউ তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, চাই সে বিরাট উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিই হোক না কেন।

৭. কুরআন মজীদ পড়ার এবং তা বুঝার বিষয়টি স্বয়ং দাবী করে যে, পাঠক তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানের সময় সে সমকালীন পরিস্থিতি ও পৃথিবীর পরিবর্তিত প্রয়োজনের উপর তার প্রয়োগ করবে।

৮. ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ), ইমাম মালেক (রহ) এবং অতীতের অপরাপর তাফসীরকারগণ কুরআনের যেসব ব্যাখ্যা করেছিলেন

তা আজকের যুগে হুবহু অনুসরণ করা যেতে পারে না। সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর কুরআনের সাধারণ মূলনীতিসমূহের প্রয়োগ করার জন্য তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এমন পন্থায় ব্যাখ্যা করতে হবে–যেন লোকেরা তদনুযায়ী নিজেদের ভাগ্য, চিন্তাধারা ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলতে পারে এবং নিজের দেশ ও যুগের উপযোগী পন্থায় কাজ করতে পারে। অন্য জাতির লোকদের মত মুসলমানগণও জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেকের অধিকারী এবং এই শক্তি ব্যবহারের জন্যই দেয়া হয়েছে। সমস্ত মুসলমানকে কুরআন পড়তে হবে এবং এর ব্যাখ্যা করতে হবে।

৯. কুরআন বুঝবার এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছার জন্য কঠোর পরিশ্রমের নামই হচ্ছে ইজতিহাদ। কুরআন সব মুসলমানের নিকট, শুধু তাদের বিশেষ শ্রেণীর নিকটই নয়, এই আশা পোষণ করে যে, তারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে, তা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করবে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১০. যদি প্রত্যেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করে তবে অসংখ্য রকমের ব্যাখ্যা অস্তিত্ব লাভ করবে যার ফলে মারাত্মক বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে যেসব বিষয়ে কুরআন নীরব রয়েছে–যদি এসব ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি নীতিমালা তৈরীর এবং একটি কর্মপন্থা বেছে নেয়ার এখতিয়ার প্রদান করা হয় তবে একটি বিশৃংখল ও অসংহত সমাজের সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই লোকদের সর্বাধিক সংখ্যকের রায় কার্যকর হওয়া উচিৎ।

১১. এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিজ্ঞান ও শক্তিতে অপূর্ণাংগ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যত অধিক শক্তিশালী ও মেধাশক্তির অধিকারীই হোক না কেন তার কামেল (পূর্ণাংগ) হওয়া আশা করা যায় না। লাখ লাখ ও কোটি কোটি মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক জীবন পরিচালিত করছে তা নিজেদের সামষ্টিক দিক থেকে ব্যক্তির তুলনায় অধিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। কুরআন মজীদের আলোকেও আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যা এবং পরিস্থিতির উপর তার সাধারণ মূলনীতিসমূহের প্রয়োগের কাজটি এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া যায় না, বরং একাজ মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

১২. আইন বলতে সেই বিধান ও প্রণালীকে বুঝায় যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক এই ধারণা পোষণ করে যে, তাদের যাবতীয় বিষয় তদনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিৎ। কয়েক কোটি অধিবাসীর একটি দেশে বাসিন্দাদের অধিকাংশের কুরআনের একাধিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াতসমূহের এমন ব্যাখ্যা পেশ করা উচিৎ যা হবে তাদের পারিপার্শিক অবস্থার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুরূপভাবে কুরআনের সাধারণ নীতিমালাকে বর্তমান পরিস্থিতির [illegible] করা উচিৎ যাতে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। [illegible] সমস্যা ও ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে কুরআন নীরব সেসব ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের পালন করতে হবে।

১৩. অতীত কালে ইজতিহাদকে কতিপয় ফকীহ্র মধ্যে সীমিত রাখা হয়ত ঠিক ছিল। কারণ জনগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে এবং ব্যাপক আকারে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো হত না। কিন্তু আধুনিক কালে এই দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধিদের আঞ্জাম দেয়া উচিৎ। কেননা আমি যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি– কুরআন মজীদ পড়া, তা অনুধাবন করা এবং তার সাধারণ নীতিমালাকে বিরাজমান পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করা এক অথবা দুই ব্যক্তির বিশেষ অধিকার নয়, বরং সমস্ত মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য এবং একাজ তাদেরই আঞ্জাম দেয়া উচিৎ, যাদেরকে মুসলমানগণ এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করে থাকবে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভংগীর সমালোচনা

উপরের ১৩টি নম্বরের অধীনে আমরা বিজ্ঞ বিচারপতির সকল মৌলিক দৃষ্টিভংগীর সংক্ষিপ্ত ও সঠিক বর্ণনা তুলে ধরার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এর ভাষা ও ধারাবাহিক বিন্যাসেও আমরা বিজ্ঞ বিচারপতির নিজস্ব ভাষা ও যৌক্তিক বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখেছি, যাতে পাঠকদের সামনে সেই ধারণার সঠিক চিত্র ফুটে উঠে, যার উপর ইতিপূর্বে তিনি তার রায়ের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এইসব মৌলিক দৃষ্টিভংগীর কয়েকটি কথা গভীর চিন্তা ও সমালোচনার যোগ্য।

১. বিজ্ঞ বিচারপতির দৃষ্টিতে আল্লাহর বিধান বলতে কুরআনে বর্ণিত বিধান। সুন্নাত যে বিধান ও দিকনির্দেশনা দেয় তাকে তিনি আল্লাহর বিধানের মধ্যে গণ্য করেন না। উপরের বক্তব্যে একথা গোপন রয়েছে, কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি তার রায়ে এই ব্যাখ্যা দেন। যথাস্থানে আমরা তার দৃষ্টিভংগীর ভ্রান্তি তুলে ধরব।

২. তিনি যখন বলেন, কোন ব্যক্তিরই অন্য লোকদের উপর প্রাধান্য নেই, এবং কুরআন বুঝা ও তার ব্যাখ্যা করা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের বিশেষ অধিকার নয়, তখন তিনি এর মধ্যে মহানবী (স)–কেও অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এ জিনিসটিও উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে প্রতীয়মান নয়, কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। অতএব তার এই মূলনীতিও সমালোচনার মুখাপেক্ষী।

৩. তিনি রসূলুল্লাহ (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের একই পাল্লায় রেখে বলেছেন, "তাঁরা যা কিছুই করতেন মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন।" একথা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বীয় ধরন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রসূলুল্লাহ (স)–এর মর্যাদা খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল মুসলিম শাসকগণের মর্যাদার তুলনায় মৌলিকভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহানবী (স)–কে তাদের কাতারে দাঁড় করানো স্বয়ং সেই কুরআনের পরিপন্থী যাকে বিজ্ঞ বিচারপতি আল্লাহ্‌র বিধান বলে স্বীকার করেছেন। অতপর তার এই দাবীও সত্য নয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মত মহানবী (স)–ও যা কিছু করতেন মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন। যেসব বিষয়ে মহানবী (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশনা লাভ করতেন সেসব ক্ষেত্রে তাঁর কাজ ছিল কেবল নির্দেশ প্রদান এবং মুসলমানদের কাজ ছিল তার অনুসরণ। এক্ষেত্রে পরামর্শের প্রশ্ন তো দূরের কথা কোন মুসলমানের কিছু বলারও কোন অধিকার ছিল না। আর আল্লাহ্‌র বিধান রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট অপরিহার্যরূপে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতের আকারেই আসত না, বরং তা ওহী গায়র মাতলূর আকারেও আসত।

৪. বিজ্ঞ বিচারপতি সাধারণ মুসলমানদের ইজতিহাদ করার অধিকারের উপর জোর দেয়ার পর স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন যে, একটি সুসংগঠিত সুশৃংখল সমাজে ব্যক্তিগত বা একক ইজতিহাদ চলতে পারে না, অধিকাংশ লোকের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ইজতিহাদই কেবল আইনের মর্যাদা পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, অধিকাংশ কর্তৃক নির্বাচিত কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিকে ইজতিহাদের অধিকার প্রধান এবং এই কয়েকজন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করে তাদের ইজতিহাদ গ্রহণ করা –এতদোভয়ের মধ্যে নীতিগতভাবে কি পার্থক্য আছে? এই দেশের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি হানাফী ফিক্‌হ –এর উপর আস্থা স্থাপন করে কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যাসমূহ এবং তাদের ইজতিহাদসমূহকে ইসলামী আইন হিসাবে স্বীকার করে নেয়, তবে বিজ্ঞ বিচারপতি তার নিজের বিবৃত নীতিমালার আলোকে এর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করতে পারেন এবং কিভাবে করতে পারেন? এর উপর মুসলমানদের যে গভীর আস্থা রয়েছে তার অবস্থা তো এরূপ যে, যখন এই বিধান কার্যকর করার মত কোন ক্ষমতাসীন শক্তি বর্তমান ছিল না এবং অমুসলিম শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখনও মুসলমানগণ নিজেদের বাড়ীতে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রসমূহে তাঁদের বর্ণিত আইন–কানূনেরই অনুসরণ করতে থাকে। এর অর্থ এই যে, মুসলিম জনসাধারণ কোনরূপ চাপের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এবং মন ও বিবেকের পূর্ণ প্রশান্তি

সহকারে তাকে সঠিক আইন মনে করে। দুনিয়ার কোন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত বিধানের সপক্ষে এতটা শক্তিশালী ও ব্যাপক জনসমর্থন লাভের ধারণা করা যায় কি? এর মোকাবিলায় কোন এক ব্যক্তির–চাই সে একজন বিজ্ঞ বিচারপতিই হোক না কেন–এই যুক্তির কি মূল্য আছে যে, এই ফকীহগণের ব্যাখ্যাসমূহ আজকের যুগে মান্য করা যেতে পারে না? বিচারপতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব স্বয়ং বলেন যে, আইন বলতে তাকেই বুঝায় যা অধিকাংশ লোক মান্য করে। অতএব সর্বাধিক লোক ফিক্হ–এর এই বিধান মেনে চলছে। অবশেষে কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তার এই ব্যক্তিগত রায় এসব বিধান রদ করতে পারে?

৫. বিজ্ঞ বিচারক একদিকে স্বয়ং স্বীকার করেন যে, আইন প্রণয়ন এবং তাতে রদবদল সাধন অধিকাংশ লোক কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ, কতিপয় ব্যক্তির কাজ নয়, তা সে যত বড় শক্তিশালী ও মেধার অধিকারীই হোক না কেন। কিন্তু অপর দিকে তিনি নিজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতিমালার পরিবর্তনও করেছেন এবং অভিভাবকত্ব সম্পর্কে অধিকাংশের অনুসৃত বিধানও রদ করেছেন। এটা যদি স্ববিরোধিতা না হয়, তবে এ দুটি কথার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে তা জানতে পারলে আমরা খুবই আনন্দিত হব।

ইজতিহাদের কয়েকটি নমুনা

এরপর প্যারা ১৬ থেকে ২০–এর মধ্যে বিজ্ঞ বিচারপতি স্বয়ং কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করে নিজের ইজতিহাদের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই যুগে ইজতিহাদী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা কুরআন থেকে কিভাবে বিধান আবিষ্কার করা উচিৎ।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিজ্ঞ বিচারকের ইজতিহাদ

এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম সূরা নিসার তৃতীয় আয়াত উধৃত করেনঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ -

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে তার বক্তব্য হচ্ছে, "এ আয়াতটি বেশীর ভাগই ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করা হায়েছে।" এ আয়াতের উপর আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেনঃ "কুরআন পাকের কোন হুকুমের কোন

অংশই অর্থহীন মনে করা উচিৎ নয়।" কিন্তু এর পরপরই তিনি বলেনঃ "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হল, তারা এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে যে, একজন মুসলমান একের অধিক বিবাহ করতে পারবে কি না, যদি পারে তবে কি অবস্থায় কি কি শর্ত সাপেক্ষে?"

এই ইজতিহাদের প্রথম ভ্রান্তি

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিজ্ঞ বিচারক তার এই দুটি বাক্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা উপলব্ধি করতে কিভাবে ব্যর্থ হলেন! প্রথম বাক্যে তিনি নিজে যে নীতিগত কথা বলেছেন তার আলোকে আলোচ্য আয়াতের কোন শব্দ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অর্থহীন নয়। এখানে দেখুন, আয়াতের মূল পাঠ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এ আয়াতে মুসলিম সমাজের সদস্যদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছেঃ "তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিবাহ কর–দুজনকে, তিনজনকে অথবা চারজনকে। কিন্তু তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একজনই যথেষ্ট–––।"

একথা স্পষ্ট যে, বিবাহের জন্য নারীদের বাছাই, পছন্দ করা, তাদের বিবাহ করা এবং নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করা অথবা না করা ব্যক্তির কাজ, গোটা জাতি বা সমাজের কাজ নয়। অতএব আয়াতের অবশিষ্ট সব অংশেও যাতে বহুবচনের ক্রিয়াপদে সম্বোধন করা হয়েছে, অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যক্তিদেরই সম্বোধন করা হয়েছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এভাবে গোটা আয়াতটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মূলত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করছে এবং বিষয়টি তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয় তবে অনধিক চারের সীমা পর্যন্ত যে কজন স্ত্রীলোককে ইচ্ছা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। ইনসাফ বা ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারার আশংকা হলে এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে, যতক্ষণ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ এবং فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا –এর সম্বোধনমূলক ক্রিয়াপদ দুটি অযথা ও অর্থহীন মনে না করা যাবে, ততক্ষণ অত্র আয়াতের কাঠামোর মধ্যে জাতির প্রতিনিধিগণ কোন্ পথ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে? আয়াতের কোন্ শব্দটি তাদের জন্য প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেয়? আবার প্রবেশও এতদূর পর্যন্ত যে, তারাই ফয়সালা করে দেবে একজন মুসলমান দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে কি না? অথচ একাধিক বিবাহের

অধিকার তাকে স্বয়ং আল্লাহ–ই সুস্পষ্ট বাক্যে প্রদান করেছেন। আবার "করতে পারার" ফয়সালা করার পর তারা এও নির্ধারণ করবে যে, "কোন্ অবস্থায় এবং কি কি শর্তাধীনে করতে পারবে?" অথচ আল্লাহ তাআলা বিষয়টি ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছেন যে, সে যদি নিজের মধ্যে ন্যায়–ইনসাফ করার শক্তি রাখে তবে একাধিক বিবাহ করবে, অন্যথায় একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।

দ্বিতয়ি ভ্রান্তি

দ্বিতীয় কথা তিনি এই বলেন, "কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের বিবাহ (একাধিক স্ত্রী গ্রহণ) এতীমদের স্বার্থে হওয়া উচিৎ।" এ আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণে আধুনিক কালের কোন কোন ব্যক্তি যে ভুল করছে এখানেও সেই সাধারণ ভুলটি করা হয়েছে। তাদের ধারণামতে আয়াতে যেহেতু ইয়াতীমদের সাথে সুবিচার করার উল্লেখ রয়েছে, তাই একাধিক বিবাহ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোন প্রকারে হোক ইয়াতীমদের বিষয়টি একটি অপরিহার্য শর্ত হিসাবে যুক্ত হওয়া উচিৎ। অথচ একথাটিকে যদি একটি মূলনীতিতে পরিণত করা হয় যে, কুরআনে কোন বিশেষ স্থানে বা উপলক্ষে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঐ নির্দেশটি কেবলমাত্র ঐ স্থানের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে, তবে তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। যেমন, আরবের লোকেরা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ক্রীতদাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। কুরআন নিম্নোক্ত বাক্যে তা নিষিদ্ধ করেঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا-

"নিজেদের ক্রীতদাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য কর না যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়"–(সূরা নূরঃ ৩৩)।

এখানে কি কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে যে, এই নির্দেশ কেবলমাত্র বাঁদীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাঁদী নিজে যদি বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতে চায় তবেই তাকে দিয়ে এ পথে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে?

মূলত এসকল শর্তাবলীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যতক্ষণ দৃষ্টিতে থাকবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের এসব আয়াতের, যেগুলোতে কোন হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে কোন বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى - আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই যে, আরবদেশে এবং প্রাচীনকালে সব সমাজে শতশত বছর ধরে বহু বিবাহ সাধাণভাবে বৈধ ছিল। এজন্য নতুনভাবে কোন অনুমতি প্রদানের

মোটেই প্রয়োজন ছিল না। কারণ কুরআন কর্তৃক কোন প্রচলিত প্রথা নিষিদ্ধ না করা ছিল স্বয়ং ঐ প্রথার অনুমোদন দান করার নামান্তর। তাই উপরোক্ত আয়াত মূলত বহুবিবাহের অনুমতি দানের জন্য নাযিল হয়নি, বরং উহুদের যুদ্ধের পর যেসব মহিলা কয়েকটি বাচ্চাসহ বিধবা হয়ে যায়, তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য নাযিল হয়েছিল। এ আয়াতে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, তোমরা যদি উহুদের শহীদদের ইয়াতীম শিশুদের সাথে এমনিতে ন্যায় বিচার করতে না পার, তবে তো তোমাদের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পথ প্রথম থেকেই উন্মুক্ত আছে। তাদের বিধবাদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদের বিবাহ কর, যাতে তাদের শিশু সন্তানেরা তোমাদের নিজেদের সন্তানে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ থেকে কোন যুক্তিতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, ইয়াতীম শিশুদের লালন–পালনের সমস্যা দেখা দিলেই কেবল সেই অবস্থায় একাধিক বিবাহ করা যেতে পারে। এই আয়াত যদি কোন নতুন বিধান প্রণয়ন করে থাকে তবে তা বহুবিবাহের অনুমতি প্রদান নয়। কারণ এ অনুমতি প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে তার প্রচলন ছিল। বরং এ আয়াতে মূলত যে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র এই যে, স্ত্রীর সংখ্যা চার–এ সীমিত করা হয়েছে, যা পূর্বে ছিল না।

তৃতীয় ভ্রান্তি

বিজ্ঞ বিচারক তৃতীয় কথা এই বলেন, "যদি কোন একজন মুসলমান একথা বলতে পারে যে, আমি একের অধিক বিবাহ করব না, কারণ সে সামর্থ আমার নেই, তবে আট কোটি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গোটা জাতির জন্য এই বিধান প্রণয়ন করতে পারে যে, জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন ব্যক্তিকে একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয় না।"

এই অদ্ভুত যুক্তিপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের আবেদন এই যে, এক মুসলমান যখন বলে যে, সে একের অধিক বিবাহ করবে না, তখন সে তার পরিবারিক জীবন সম্পর্কে তাকে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতারই ব্যবহার করে। সে এই স্বাধীনতাকে বিবাহ না করার ব্যাপারেও ব্যবহার করতে পারে, এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারেও ব্যবহার করতে পারে, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পুনর্বিবাহ করা বা না করার ব্যাপারেও ব্যবহার করতে পারে এবং কোন সময় মত পরিবর্তিত হলে একের অধিক বিবাহ করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু জাতি সমস্ত লোকের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিধান প্রণয়ন করলে তা ব্যক্তির

আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই কিয়াসের ভিত্তিতে জাতি কোন সময় কি এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা পেতে পারে যে, তার অর্ধেক অধিবাসী বিবাহ করবে আর অর্ধেককে অবিবাহিত থাকতে হবে? অথবা যার স্ত্রী বা স্বামী মারা যাবে সে পুনর্বিবাহ করতে পারবে না? প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোন স্বাধীনতাকে যুক্তির ভিত্তি বানিয়ে জাতিকে তার সদস্যদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার অধিকার প্রদান একটি যৌক্তিক ভ্রান্তি তো হতে পারে, কিন্তু আমাদের জানা নাই যে, আইনের ক্ষেত্রে এই যুক্তি গ্রহণ পদ্ধতি কবে থেকে স্বীকার্য হয়েছে? তথাপি আমরা ক্ষণিকের জন্য একথা স্বীকার করে নেই যে, আট কোটি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেমন চার কোটি এক হাজারজন একত্রিত হয়ে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি আট কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার ব্যক্তি একত্র হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী এ ধরনের কোন আইনের প্রস্তাব করে এবং অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে তা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় তবে বিজ্ঞ বিচারপতির বর্ণিত নীতিমালার আলোকে তার কি বৈধতা আছে? আট কোটি মুসলিম অধিবাসীর মধ্যে একলাখ, বরং পঞ্চাশ হাজারেরও দৃষ্টিভংগী এটা নয় যে, জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই দাবী করে যে, একজন মুসলমানের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা তো আইনত নিষিদ্ধ হবে, অবশ্য তার "মেয়ে বন্ধুর" সাথে অবাধ মেলামেশা অথবা গণিকাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অথবা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিতা রাখা আইনত বৈধ। স্বয়ং সেইসব মহিলাও যাদের জন্য সতীনের কল্পনা করাও দুষ্কর, খুব কমই এরূপ পাওয়া যাবে যাদের মতে এক নারীর সাথে তার স্বামীর বিবাহ হলে তার জীবনটা চিতায় সহমরণের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু সেই রমনীর সাথে তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকলে তার জীবনটা জান্নাতের সুখময় নমুনা হয়ে থাকবে।

চতুর্থ ভ্রান্তি

পুনরায় বিজ্ঞ বিচারপতি বলেন, "এ আয়াতকে কুরআনের অন্য দুটি আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। প্রথমটি সূরা নূর-এর ৩৩ নং আয়াত, যাতে বলা হয়েছে-বিবাহ করার উপায়-উপকরণ যার নাই তার বিবাহ করা অনুচিৎ। উপায়-উপকরণের স্বল্পতার কারণে যদি কোন ব্যক্তিকে এক বিবাহ থেকেও বিরত রাখা যায় তবে এসব কারণে বা এ জাতীয় কারণে তাকে একের অধিক বিবাহ থেকেও বিরত রাখা উচিৎ।"

বিচারপতি সাহেব স্বয়ং এখানেও নিজের বর্ণনাকৃত মূলনীতি ভংগ করেছেন। আয়াতের মূল পাঠ এই যেঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"যারা বিবাহের সুযোগ পায় না তারা যেন সংযমের সাহায্য নেয়, যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনবান করে দেন।"

এই বক্তব্যের মধ্যে এরূপ তাৎপর্য কোথা থেকে পাওয়া গেল যে, এ ধরনের লোকেরা বিবাহ করতে পারবে না? কুরআনের কোন আয়াতের শব্দাবলীকে যদি "অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন" মনে করা বৈধ না হয় তবে বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেয়ার ধারণা এ আয়াতে কোন প্রকারেই প্রবেশ করানো যেতে পারে না। এখানে তো শুধু বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যতক্ষণ বিবাহের উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা না করে দেবেন ততক্ষণ অবিবাহিত লোকেরা সংযমের সাথে পবিত্র জীবন যাপন করবে এবং খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করে ফিরবে না। তথাপি যদি কোন না কোন প্রকারে বিবাহ থেকে বিরত রাখার অর্থ উক্ত শব্দসমূহের মধ্যে প্রবেশও করানো হয়, তবুও এ নির্দেশ ব্যক্তির প্রতি, জাতি বা সরকারের প্রতি নয়। কোন ব্যক্তি নিজেকে কখন বিবাহ করার উপযুক্ত মনে করে এবং কখন উপযুক্ত মনে করে না তা নির্ধারণের বিষয়টি তার সুবিবেচনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাকে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে (যদি বাস্তবিকই এ ধরনের কোন পথনির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে) যে, যতক্ষণ সে বিবাহ করার উপায়-উপকরণ না পাবে ততক্ষণ বিবাহ করবে না। এখানে সরকারকে ব্যক্তির এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোথায় দেয়া হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি যতক্ষণ বিচারালয়ের সামনে নিজেকে একজন স্ত্রী এবং হাতে গোনা কয়েকটি সন্তানের (যার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়ার অধিকারও বিজ্ঞ বিচারকের রায় অনুযায়ী এই আয়াত সরকারকে দান করে) ভরণ-পোষণ করার উপযুক্ত প্রমাণ করতে না পারবে, ততক্ষণ সে বিবাহ করতে পারবে না? আয়াতের শব্দাবলী যদি "অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন" না হয়ে থাকে তবে আমাদের বলে দিতে হবে যে, আয়াতের কোন্ শব্দ থেকে এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়নের বৈধতা প্রমাণিত হয়? যদি বৈধতা প্রমাণিত না হয় তবে এ আয়াতের ভিত্তিতে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে একাধিক স্ত্রী এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক সন্তানের ব্যাপারে সরকারকে আইন প্রণয়নের অধিকার কিভাবে দেয়া যেতে পারে?

পঞ্চম ভ্রান্তি

দ্বিতয়ি আয়াত যাকে সূরা নিসার ৩য় আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে এবং তা থেকে একই বিধান বের করতে বিজ্ঞ বিচারক চেষ্টা করেছেন, তা হচ্ছে এই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াত। আয়াতের বরাত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং তার মূল পাঠও তিনি স্বয়ং নকল করেছেন। তা এই যেঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন মহিলাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে ন্যায় বিচার করতে কখনও সক্ষম হবে না। অতএব (এক স্ত্রীর প্রতি) সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড় না যে, (অপর স্ত্রীকে) ঝুলানো অবস্থায় রাখবে। তোমরা যদি নিজেদের কর্মপন্থা সঠিক রাখ এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই শব্দাবলীর ভিত্তিতে বিজ্ঞ বিচারক প্রথমে তো বলেন, "আল্লাহ তাআলা একথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা মানবীয় সত্তার ক্ষমতা বহির্ভূত।" অতপর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, "এই দুটি আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন এবং একের অধিক বিবাহের উপর বাধানিষেধ আরোপ সরকারের কাজ। সরকার বলতে পারে যে, দুই স্ত্রী রাখার ক্ষেত্রে যেহেতু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে এবং কুরআনেও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, উভয় স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার সম্ভব নয়, অতএব এই পন্থা চিরকালের জন্য খতম করা হল।"

চরম হতবাক হতে হয় যে, আয়াত থেকে এতবড় বিষয়বস্তু কিভাবে এবং কোথা থেকে বের হয়ে আসল? অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথা তো অবশ্যই বলেছেন যে, মানুষ দুই অথবা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায়ইনসাফ করতে চাইলেও তা করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু এ কারণেই কি আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সূরা নিসার তিন নম্বর আয়াতে ন্যায়ইনসাফের শর্ত সহকারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যে অনুমতি দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করেছেন? আয়াতের শব্দসমষ্টি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এই প্রকৃতিগত সত্যকে পরিষ্কার বাক্যে বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা দুই অথবা ততোধিক স্ত্রীর স্বামীর নিকট শুধু এই দাবী করেন যে, সে যেন এক স্ত্রীর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে না

পড়ে যে, অপর বা অপরাপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। অন্য কথায়, কুরআনের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণরূপে ইনসাফ না করতে পারার সারকথা একাধিক বিবাহের অনুমতিই মূলত রহিত হয়ে যাওয়া নয়। বরং পক্ষান্তরে এর সারকথা এই যে, দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য স্বামী এক স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়া থেকে বিরত থাকবে এবং সকল স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, তার অন্তর একজনের প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও। স্বামী তার অপর স্ত্রী বা স্ত্রীদের ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিলেই কেবল এই অবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়। ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিলে ন্যায়ইনসাফ ব্যাহত হবে এবং এই পরিস্থিতিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ নেয়া যেতে পারে না। কিন্তু কোন যুক্তির আলোকে এই আয়াতের শব্দাবলী এবং তার পারস্পরিক বিন্যাস ও অর্থ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় না রাখার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করার সুযোগ বের করা যেতে পারে না। আর কোথায় তা থেকে সরকার কর্তৃক সমস্ত লোকের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়টি চিরতরে নিষিদ্ধ করার এত বিরাট বক্তব্য নির্গত হয়? কুরআনের যতগুলো আয়াত ইচ্ছা লোকেরা মিলিয়ে পড়ুক, কিন্তু কুরআনের বাক্যের মধ্যে কুরআনের বক্তব্যই পড়তে হবে। অন্য কোন বক্তব্য কোথাও থেকে ধার করে এনে তা কুরআনের মধ্যে পড়া এবং অতপর একথা বলা যে, এই বক্তব্য কুরআনেই পাওয়া গেছে, কোন প্রকারেই কুরআন পাঠের সঠিক পন্থা নয়, তাকে সঠিক পন্থার ইজতিহাদ বলে গ্রহণ করা তো দূরের কথা!

সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমরা বিজ্ঞ বিচারপতিকে এবং তার অনুরূপ চিন্তাধারার লোকদেরও একটি প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করার আহবান করছি। কুরআন মজীদের যে আয়াতের উপর তিনি বক্তব্য রাখছেন, তা নাযিল হওয়ার পর ১৪০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই গোটা কাল ব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠী পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে অব্যাহতভাবে বসবাস করে আসছে। আজ এমন কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক অবস্থার নির্দেশ করা যেতে পারে না যা পূর্বে কোন কালে মুসলিম সমাজে উদ্ভূত না হয়ে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, গত শতাব্দীর শেষার্ধের আগ পর্যন্ত গোটা ইসলামী দুনিয়ায় কখনও এই ধারণার সৃষ্টি হয়নি যে, একাধিক বিবাহ প্রতিরোধ করার অথবা তার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজন আছে? এর কোন যুক্তিসংগত কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আজ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের সেইসব জাতির আধিপত্যের কারণে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যারা একের অধিক স্ত্রী রাখাকে একটি নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ এবং বিবাহ ছাড়াই মেয়ে বন্ধুর সাথে (অবশ্য উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে) সম্পর্ক রাখা

বৈধ, পবিত্র অথবা অন্তত উদার দৃষ্টিতে দেখার মত ব্যাপার মনে করে এবং যাদের সমাজে রক্ষিতা রাখার প্রথা বলতে গেলে প্রায় গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে, বরং ঐ রক্ষিতাকে বিবাহ করাই অপরাধ মনে করা হয়? এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে যদি সততার সাথে বাস্তবিকই এছাড়া অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা না যায়, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এভাবে বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা কি ইজতিহাদের কোন সঠিক পন্থা হতে পারে? মুসলিম জনগণের বিবেক কি এ ধরনের ইজতিহাদের দ্বারা আশ্বস্ত করা যাবে?

২য় ইজতিহাদ—চুরির শাস্তি সম্পর্কে

এরপর বিজ্ঞ বিচারপতি সূরা মাইদার ৩৭-৩৯ নং আয়াত টেনে এনেছেন এবং তার উপর ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বলেছেন যে, "এ স্থানে কুরআন চুরির চরম শাস্তি হাত কর্তন বলেছে।" অথচ কুরআন এই অপরাধের চরম শাস্তি (Maximum punishment) নয়, বরং একমাত্র শাস্তি (Only punishment) হাত কর্তন সাব্যস্ত করেছে। কুরআনের মূল পাঠ নিম্নে দেয়া হলঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

"আর পুরুষ চোর অথবা নারী চোর-উভয়ের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা নির্দিষ্ট।"

কুরআন যদি অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন শব্দ ব্যবহার না করে থাকে তবে এই বাক্যে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, পুরুষ চোর ও নারী চোর-উভয়ের জন্য পরিষ্কারভাবে একই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে হাত কর্তন। এর মধ্যে "চূড়ান্ত বা সর্বশেষ পর্যায়ের শাস্তি"-র ধারণা কোন্ পথে প্রবেশ করতে পারে?

৩য় ইজতিহাদ—সন্তানের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে

বিজ্ঞ বিচারপতি ইজতিহাদের সর্বশেষ নমুনা পেশ করেছেন এমন সন্তানদের অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে যাদের মায়েরা নিজ নিজ স্বামী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তিনি সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াত এবং সূরা তালাকের ৬ নং আয়াত উল্লেখ করে নিম্নোক্ত দুটি কথা বলেছেন এবং দুটি কথাই পরিষ্কারভাবে কুরআনের বক্তব্যের সীমার বাইরে।

প্রথম কথা তিনি এই বলেছেন যে, "এসব আয়াতের আলোকে মায়েদেরকে তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন দান করতে হবে।"

অথচ তিনি যে আয়াতগুলো উধৃত করেছেন তার আলোকে পূর্ণ দুই বছর তো দূরের কথা, স্বয়ং দুধপান করানোই বাধ্যতামূলক করা হয়নি। সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۔

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন দান করবে-সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে দুধপান-কাল পূর্ণ করতে চায়।"

আর সূরা তালাকের আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"অতএব তারা যদি তোমাদের জন্যে বাচ্চাদের দুধপান করায় তবে তাদের পারিশ্রমিক তাদের দিয়ে দাও।"

তিনি দ্বিতীয় কথা এই বলেছেন যে, "কুরআনে এমন কোন নির্দেশ নাই যে, কোন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে প্রথম স্বামী তার কাছ থেকে বাচ্চা নিয়ে নিতে পারে। সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার কারণেই যদি সন্তান থেকে বঞ্চিত হতে পারে, তবে আমি এর কোন কারণ বুঝতে পারছি না যে, কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করার ক্ষেত্রে কেন বাচ্চা থেকে বঞ্চিত হবে না।"

উপরোক্ত কথা বলার সময় বিজ্ঞ বিচারপতি খুব সম্ভব খেয়াল করতে পারেননি যে, কয়েক লাইন পূর্বে তিনি নিজে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন তাতে পিতাকে সন্তানের মালিক সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এসব আয়াতে 'পিতাই সন্তানের মালিক' এই ভিত্তির উপর সমস্ত বিধান রচিত হয়েছে। عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ "সন্তানের মালিক যে-তাকেই (স্তন দায়িনী মায়েদের) খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে হবে।" وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ "তোমরা যদি (অন্য কোন মহিলার দ্বারা) নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাতে চাও তবে তাতে তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই।"

"অতএব তারা যদি তোমাদের জন্য বাচ্চাদের দুধ পান করায় তবে তাদের পারিশ্রমিক তাদের দিয়ে দাও।" হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ বিচারপতির নিকট একথা গোপন থাকতে পারে না যে, কুরআনের এই শব্দাবলী সন্তানের ব্যাপারে পিতা ও মাতার মর্যাদার মধ্যে কি পার্থক্য নির্দেশ করছে?

মৌলিক ভ্রান্তি

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে বিজ্ঞ বিচারক এমন ভংগীতে আলোচনা করেছেন যে, মনে হয় কুরআন শূন্যলোকে পরিভ্রমণ করতে করতে সরাসরি আমাদের নিকট এসে পৌঁছে গেছে। মুসলিম সমাজের কোনো অতীত নাই, যখন এই কিতাবের বিধানসমূহ বুঝবার এবং বুঝাবার এবং তদনুযায়ী আমল করার কোন কাজ কখনো হয়ে থাকবে এবং যা থেকে আমরা কোন প্রকারের কোন নজীর কোথাও পেতে পারি। যেন কোন নবী ছিল না যার উপর এই কিতাব নাযিল হয়ে থাকবে এবং তিনি এর কোন নির্দেশের তাৎপর্য বর্ণনা করে থাকবেন অথবা তদনুযায়ী কাজ করে দেখিয়ে থাকবেন। যেন কোন খলীফা, কোন সাহাবী, কোন তাবিঈন, কোন ফকীহ এবং বিচারালয়ের কোন কাযী (বিচারক) এই উম্মাতের মধ্যে আবির্ভূত হননি। আমরা যেন এখন প্রথমবারেই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি যে, এই যে কুরআন যা একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়, অথবা চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি নির্ধারণ করে, অথবা সন্তানদের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দান করে, এ সম্পর্কে আমরা কি বিধিবিধান প্রণয়ন করবো। এ জাতীয় সকল ব্যাপারে তের-চৌদ্দশত বছরের ইসলামী সমাজ যেন আমাদের জন্য কিছুই রেখে যায়নি। সব কিছুই আমাদেরকে কুরআন হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং তাও ঠিক সেইভাবে যার কয়েকটি নমুনা ইতিপূর্বে আমাদের সামনে এসেছে।

সুন্নাত সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিভংগী

এ ধরনের আলাচনা হঠাৎ শুরু করা হয়নি, বরং ২১ নং প্যারা থেকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তা পড়লে বুঝা যায় যে, তা বিজ্ঞ বিচারপতির চিন্তাভাবনা প্রসূত রায়ের ফল। তা যেহেতু তার রায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই আমরা এর প্রতিটি বিষয় ক্রমিক নম্বরের অধীনে নকল করার সাথে সাথে তার উপর সমালোচনা পেশ করে যাব, যাতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

সুন্নাত সম্পর্কে উম্মাতের দৃষ্টিভংগী

বিজ্ঞ বিচারক বলেন, "মুসলমানদের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অংশ

কুরআন মজীদ ছাড়াও হাদীস অর্থাৎ সুন্নাহকেও ইসলামী আইনের একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করে নিয়েছে”–(প্যারা ২১)।

যে ব্যক্তিই ইসলামী আইন ও তার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও অধ্যয়ন করেছে, সে কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, উপরোক্ত বাক্যে ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঘটনার সঠিক অবস্থা এই যে, রিসালাতের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত গোটা উম্মাত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় সুন্নাতে রসূল (স)–কে কুরআনের পরে আইনের বুনিয়াদী উৎস এবং হাদীসকে সুন্নাত সম্পর্কে জানার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে আসছে এবং করছে। যেমন আমরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলে এসেছে–ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবার একটি ক্ষুদ্র দল দ্বিতীয় হিজরী শতকে আত্মপ্রকাশ করেছিল যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করেছিল। মুসলমানদের মধ্যে এদের সংখ্যা একেবারে বাড়িয়ে বললেও প্রতি দশ হাজারে একজনের অধিক ছিল না। তৃতীয় হিজরী শতকের শেষ মাথায় পৌঁছতে পৌঁছতে এই দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারণ সুন্নাতের আইনের উৎস হওয়ার সপক্ষে এমন শক্তিশালী কার্যকর সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল যে, এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। অতপর নবম হিজরী শতক পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ায় এ ধরনের কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি ইসলামের ইতিহাসে কোন এক ব্যক্তিরও উল্লেখ করা যাবে না যে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করে থাকবে। এখন এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার লোকের গত শতাব্দী থেকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, এ ধরনের লোকের অনুসারী ইসলামী দুনিয়াতে কতজন আছে তবে তাদের সংখ্যা লাখে একজনের অধিক পাওয়া যাবে না। এই সত্য ঘটনাকে নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করা “মুসলমানদের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অংশ সুন্নাতকে আইনের উৎস মনে করে নিয়েছে” কি বাস্তব সত্যের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করা হল? পক্ষান্তরে এরূপ বলাই যথার্থ হবে যে, “মুসলমানদের একটি সম্পূর্ণ অনুল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক 'সুন্নাতের আইনের উৎস হওয়াকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে।”

বিচারকের দৃষ্টিতে ইসলামে নবীর মর্যাদা

এরপর বিজ্ঞ বিচারক প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইসলামে নবীর মর্যাদা কি? এই প্রশ্নের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

“ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে হাদীসের মূল্য ও মর্যাদা কি তা পূর্ণরূপে অনুধাবন করার জন্য আমাদের জানতে হবে যে, ইসলামী দুনিয়ায় রসূলে পাকের

মর্যাদা ও স্থান কি? আমি এই রায়ের প্রাথমিক অংশে বলেছি যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি দীন। তা নিজের সনদ আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করে। এটা যদি ইসলামের সঠিক ধারণা হয়ে থাকে তবে তা থেকে অপরিহার্যরূপে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, নবীর কথা, কাজ ও আচার–ব্যবহারের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত ওহীর সমান মর্যাদা হতে পারে না। তা থেকে সর্বাধিক এতটুকু অবগত হওয়ার জন্য সাহায্য নেয়া যেতে পারে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা কিভাবে করা হয়েছিল, অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ নীতিমালাকে বিশেষ ঘটনার উপর কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছিলেন একজন পূর্ণাংগ মানব। কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ যে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী অথবা আমরা তাঁর জন্য যে সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করতে চাই তার প্রকাশের শক্তি ও যোগ্যতা তার রয়েছে। কিন্তু তথাপি তিনি না খোদা ছিলেন আর না তাকে খোদা মনে করা হত। অন্য সব রসূলদের মত তিনিও মানুষই ছিলেন"–(প্যারা ২১)।

"তিনি আমাদের মতই নশ্বর ছিলেন–––তিনি একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন, কিন্তু নিশ্চিত খোদা ছিলেন না––––তাঁকেও ঠিক সেভাবে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করতে হত, যেভাবে আমাদের করতে হচ্ছে, বরং সম্ভবত তাঁর যিম্মাদারী কুরআন মজীদের আলোকে আমাদের যিম্মাদারীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তাঁর উপর যতটুকু নাযিল হত তার অধিক তিনি মুসলমানদের দিতে পারতেন না"–(প্যারা ২১)।

এসব কথার সমর্থনে কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করার পর তিনি পুনরায় বলেনঃ

"মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ যদিও বড়ই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্র পরে দ্বিতীয় স্থান দেয়া যেতে পারে। তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী ছাড়াও মানুষ হিসাবে তিনি নিজে কিছু ধারণার অধিকারী ছিলেন এবং নিজের এই ধারণার প্রভাবাধীন কাজ করতেন। একথা সত্য যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কোন পাপ করেননি, কিন্তু তাঁর দ্বারা ভুলত্রূটি তো হতে পারত এবং এই সত্য স্বয়ং কুরআনে স্বীকার করে নেয়া হয়েছেঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ....

কুরআনের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বিশ্বের জন্য এক অতীব উত্তম আদর্শ, কিন্তু তার অর্থ কেবলমাত্র এতটুকুই যে, কোন

ব্যক্তিকে তাঁর মতই ঈমানদার, সত্যবাদী কর্মতৎপর, ধর্মভীরু ও মুত্তাকী হওয়া উচিৎ। তার অর্থ এই নয় যে, আমরাও হুবহু তার মতই চিন্তা-ভাবনা করব এবং কাজকর্ম করব। কারণ তা হবে স্বভাব বিরুদ্ধ কথা এবং তদ্রূপ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমরা তদ্রূপ করার চেষ্টা করি তবে জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠবে"-(প্যারা ২২)।

"একথাও সত্য যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য করার উপর জোর দিয়েছে, কিন্তু তার অর্থ শুধু এই যে, তিনি যেখানে আমাদেরকে একটি বিশেষ কাজ একটি বিশেষ পন্থায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেই কাজটি সেভাবেই করব। আনুগত্য তো কোন নির্দেশেরই হতে পারে। যেখানে কোন নির্দেশ নাই সেখানে না কোন আনুগত্য হতে পারে আর না আনুগত্যহীনতা। রসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করেছেন আমরাও ঠিক তাই করব, কুরআনের আয়াত থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণ অত্যন্ত কষ্টকর। পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কোন একক ব্যক্তির জীবনকালের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা একটি সীমিত সংখ্যার অধিক লোকের জন্য নজীর সরবরাহ করতে পারে না, সেই একক ব্যক্তি নবীই হোন না কেন। একথা জোরের সাথে বলা উচিৎ যে, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে মৌলিক ও বাস্তব পার্থক্য রয়েছে"-(প্যারা ২৩)।

কুরআনের আলোকে নবীর আসল মর্যাদা

আমরা অত্যন্ত সৌজন্যবোধের সাথে আরজ করব যে, উপরোক্ত গোটা বক্তব্যের মধ্যে অপ্রাসংগিক আলোচনাই বেশী আছে এবং মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল খুব কমই আছে। যে আসল বিষয়টির বিশ্লেষণ এখানে বাঞ্ছিত ছিলো তা এই নয় যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (মাযাল্লাহ) খোদা কি না, তিনি মানুষ না অন্য কিছু এবং ইসলামী শরীআতের বিধানে সনদ ও চূড়ান্ত ফায়সালা করার জিনিস খোদার হুকুম না অন্য কারো হুকুম। বরং যে জিনিসের পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল তা এই যে, রসূলে পাক (স)-কে আল্লাহ তাআলা কি কাজের জন্য নিয়োগ করেছিলেন, দীন ইসলামে তাঁর মর্যাদা ও এখতিয়ারসমূহ কি এবং কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত বিধানই কি শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান, না রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে কুরআন পাক ছাড়াও যে বিধান দিয়েছেন তাও? বিজ্ঞ বিচারকের উধৃত আয়াতসমূহের দ্বারা এসব প্রশ্নের পর্যালোচনা হতে পারে না। কারণ এসব আয়াতে মূলতই উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয়া হয়নি। এসব প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে পাওয়া যাবে যার প্রতি বিজ্ঞ বিচারপতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননিঃ

(١) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

১. "আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করে। সে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং তাদের কিতাব ও বিচক্ষণতা শিক্ষা দেয়"–(সূরা আল–ইমরানঃ ১৬৪)।

(٢) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ـ

২. "এবং আমরা তোমার উপর এই যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি–যাতে তুমি লোকদের তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার–যা তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে"–(সূরা নাহলঃ ৪৪)।

(٣) يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ـ

৩. "সে (নবী) তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ বৈধ করে এবং কলুষ জিনিস নিষিদ্ধ করে"–(সূরা আরাফঃ ১৫৭)।

(٤) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۔

৪. "রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক"–(সূরা হাশরঃ ৭)।

(٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

৫. "আমরা রসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে"–(সূরা নিসাঃ ৬৪)।

(٦) وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

৬. "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল–সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল"–(সূরা নিসাঃ ৮০)।

(٧) وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔

৭. "তোমরা রসূলের আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে"–(সূরা নূরঃ ৫৪)।

(٨) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

৮. "তোমাদের জন্য রসূলের সত্তায় রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"–(সূরা আহ্যাবঃ ২১)।

(٩) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

৯. "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও মুমিন হতে পারবে না–যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক মতবিরোধের মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দিবে সে সম্পর্কে নিজেদের মনে দ্বিধা অনুভব না করে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়"–(সূরা নিসাঃ ৬৫)।

(١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

১০. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। অতপর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রসূলের নিকট পেশ কর–যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমানদার হয়ে থাক"–(সূরা নিসাঃ ৫৯)।

(١١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

১১. "(হে নবী!) তাদের বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর–আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।"–(সূরা আল–ইমরানঃ ৩১)।

উল্লেখিত ১১টি আয়াত একত্রে পাঠ করলে দীন ইসলামে রসূলে পাক (স)–এর প্রকৃত মর্যাদা অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে ফুটে উঠে। নিসন্দেহে তিনি খোদা ছিলেন না, মানুষই ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন মানষ

আল্লাহ যাঁকে নিজের কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর বিধান আমাদের নিকট সরাসরি আসেনি, বরং তাঁর মাধ্যমে এসেছে। তাঁর উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শুনিয়ে দেয়ার জন্যই শুধু তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি, বরং তাঁকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কিতাবের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেবেন, একজন অভিভাবক হিসাবে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজের পরিশুদ্ধি[১] সাধন করবেন এবং আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রশিক্ষণ দিবেন।

৩ নম্বর আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, তাঁকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (Legislative power)–ও আল্লাহ তাআলাই সোপর্দ করেছেন এবং তাতে তাঁর ক্ষমতাকে শুধুমাত্র কুরআনিক বিধানের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পর্যন্ত সীমিত করার কোন শর্ত নেই। ৪ নম্বর আয়াত সাধারণভাবে নির্দেশ দেয় যে, তিনি যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যে জিনিসে বাধা দেন তা থেকে বিরত থাক। এ আয়াতেও এমন কোন শর্ত নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা যেতে পারে যে, তিনি কুরআনের আয়াতের আকারে যা কিছু দেন কেবল তাই গ্রহণ কর। ৮ নম্বর আয়াত তাঁর জীবনাচার, চালচলন ও কার্যাবলীকে আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ সাব্যস্ত করে। এ স্থানেও এরূপ কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি যে; তাঁর যে কথা ও কাজের সমর্থন কুরআন থেকে পেশ করতে পারবেন শুধু সেগুলোকেই নিজেদের জন্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কর, বরং পক্ষান্তরে তাঁকে সাধারণভাবে সত্যের মানদন্ড হিসাবে আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

৫, ৬ ও ৭ নম্বর আয়াত আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয় এবং এখানেও এমন কোন ইংগিত মোটেই নাই যে, তিনি আমাদের যে নির্দেশ কুরআনের আয়াতের আকারে দেবেন, কেবল সেইসব নির্দেশেরই আনুগত্য করতে হবে। ৯ নম্বর আয়াত তাঁকে এমন একজন বিচারপতি হিসাবে দাঁড় করিয়েছে, যাঁর নিকট মীমাংসার জন্য রুজু হওয়া এবং যাঁর সিদ্ধান্ত শুধু বাহ্যতই নয়, বরং আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ঈমানের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তা এমন এক পদমর্যাদা যা দুনিয়ার কোন বিচারালয় অথবা কোন বিচারককেও দেয়া হয়নি। ১০ নম্বর আয়াত তাঁর মর্যাদাকে মুসলমানদের জন্য সমস্ত

---

১. "পরিশুদ্ধি" (তাযকিয়া) অর্থ "পাপ–পংকিলতা থেকে পবিত্রকরণ এবং পুণ্য ও কল্যাণের ক্রমবিকাশ সাধন।" উক্ত শব্দের মধ্যে স্বয়ং এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, পরিশুদ্ধকারীই সেইসব পংকিলতা নির্দেশ করবেন যা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে পবিত্র করতে হবে এবং তিনিই পুণ্য ও কল্যাণ নির্দেশ করবেন যেগুলোর ব্যক্তি ও সমাজে ক্রমবিকাশ সাধন করতে হবে।

কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের মর্যাদা থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি বা উলিল-আম্‌র (যার মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, তার মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ সকলে অন্তর্ভুক্ত) আনুগত্য পাওয়ার দিক থেকে তিন নম্বরে আসে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য এক নম্বরে আসে। এই উভয়ের মাঝখানে রসূলুল্লাহ (স)-এর স্থান এবং এ স্থানে রসূল (স)-এর মর্যাদা এই যে, উলিল-আম্‌র-এর সাথে মুসলমানদের মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু রসূলের সাথে হতে পারে না। বরং যে মতবিরোধই সৃষ্টি হবে তার মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু হতে হবে। এই মর্যাদা স্বীকার করে নেয়াকেও ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেমন আয়াতের শেষাংশ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ـ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। অতপর শেষ আয়াত আল্লাহ্‌র ভালবাসার একমাত্র দাবী এবং তাঁর ভালবাসা লাভ করার একমাত্র রাস্তা বলে দিচ্ছে এবং তা এই যে, ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য করবে।

এ হল দীন ইসলামে রসূলের আসল মর্যাদা যা কুরআন মজীদ এতটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তা অধ্যয়নপূর্বক বিজ্ঞ বিচারপতি কি ২১ নং প্যারায় বর্ণিত তাঁর রায়ের পুনর্বিবেচনা করবেন? দুটি চিত্র সামনাসামনি রেখে কি পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায় না যে, তিনি রসূলে পাক (স)-এর মর্যাদা তাঁর আসল মর্যাদার তুলনায় অনেক কম, বরং মৌলিকভাবে ভিন্নরূপ করেছেন?

ওহী কি শুধু কুরআন পর্যন্ত সীমিত?

বিজ্ঞ বিচারপতির একথা আক্ষরিকভাবে সম্পূর্ণ ঠিক যে, রসূলে করীম (স) "মুসলমানদেরকে তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত জিনিসের অধিক কিছু দিতে পারতেন না।"

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে এবং এ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিচারপতির মতে মহানবী (স)-এর নিকট কি শুধু কুরআনে সন্নিবেশিত ওহীই আসত, না তা ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে তিনি পথনির্দেশ লাভ করতেন? যদি প্রথমটি হয়ে থাকে তবে তার যথার্থতা স্বীকার করা যায় না। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর কিতাবের আয়াত ব্যতীত আর কোন ওহী আসত না। বরং কুরআন থেকে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, কিতাবুল্লাহর আয়াত ছাড়াও নবী আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশনা লাভ করেন। আর যদি দ্বিতীয় কথা হয়ে থাকে তবে কুরআনের সাথে সুন্নাতকেও আইনের উৎস না মেনে উপায় নেই, কারণ তাও সেই খোদার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যাঁর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হয়েছে।

মহানবী (স) কি নিজের চিন্তাভাবনার অনুসরণ করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন?

পুনশ্চ বিজ্ঞ বিচারকের নিম্নোক্ত কথা কঠোরভাবে পুনর্বিবেচনার মুখাপেক্ষী যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট "আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছিল তা ছাড়াও স্বয়ং নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা ধারণ করতেন এবং এই চিন্তাভাবনার প্রভাবাধীন কাজ করতেন।"

না কুরআনের সাথে এ বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য আছে আর না বুদ্ধিবিবেক তা বিশ্বাস করতে পারে। কুরআন মজীদ বারবার এ বিষয়টি সুপষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, রসূল হিসাবে মহানবী (স)–এর উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছিল তা আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল–খুশী ও কামনা–বাসনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাঁকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং তিনি ওহীর অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন। إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ـ

"আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি"–(সূরা আনআমঃ ৫০)। قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي .

"বল, আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার নিকট যে ওহী করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি"–(আরাফঃ ২০৩)।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

"তোমাদের সংগী বিভ্রান্তও নয়, বিপথগামীও নয়। আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"–(সূরা নাজ্‌মঃ ২,৩, ৪)।

এখন বুদ্ধিবিবেকের দিক থেকে বলা যায় যে, তা কোনক্রমেই একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলও নিযুক্ত করা হবে, আবার তাকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নিজের প্রবৃত্তি, ঝোঁক প্রবণতা ও ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেয়াও হবে। একটি মামুলি সরকারও যদি কোন ব্যক্তিকে কোন এলাকার রাজপ্রতিনিধি অথবা গভর্নর অথবা কোন দেশে নিজের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে, তবে তাকে তার সরকারী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে স্বয়ং নিজের মর্জি অনুযায়ী কোন কর্মপন্থা তৈরী করে নেয়ার এবং নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী মোতাবেক কথা বলার ও কাজ করার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেয় না। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদ

দেয়ার পর তাকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কর্মপন্থা ও নির্দেশনামার অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। তার উপর কঠোর পাহারা নিযুক্ত করা হয়, যাতে সে সরকারী নীতিমালা ও নির্দেশনামার পরিপন্থী কোন কাজ করতে না পারে। যেসব বিষয় তার সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে তার সুবিবেচনাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করছে, না ভ্রান্তভাবে। তাকে শুধু জনসাধারণকে শুনিয়ে দেয়ার জন্য অথবা যে জাতির মধ্যে তাকে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাদের শুনিয়ে দেয়ার জন্যই পথনির্দেশ দেয়া হয় না, বরং তার নিজের পথনির্দেশের জন্য তাকে গোপনেও উপদেশ দেয়া হয়। সে যদি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য-বিরোধী কোন কাজ করে তাবে তাৎক্ষণিকভাবে তকে সংশোধন করে দেয়া হয় অথবা ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। তার কথা ও কাজের জন্য পৃথিবী সেই সরকারকে দায়ী মনে করে, যার প্রতিনিধিত্ব সে করছে এবং তার কথা ও কাজ সম্পর্কে অপরিহার্যভাবে মনে করা হয় যে, এর প্রতি তার নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে, অথবা অন্তত এই সরকার তা অপছন্দ করে না। এমনকি তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের ভালোমন্দ পর্যন্ত তাঁর নিয়োগদাতা সরকারের সুনামের উপর প্রভাব ফেলে।

এখন আল্লাহ সম্পর্কে কি এতটা অসতর্কতার আশংকা করা যায় যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নিজের রসূল নিয়োগ করেন, দুনিয়াবাসীকে তাঁর উপর ঈমান আনার আহবান জানান, তাঁকে নিজের তরফ থেকে আদর্শ মানব নিযুক্ত করেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের বারবার জোরালো নির্দেশ দেন এবং এসব কিছু করার পর তাঁকে এভাবে ছেড়ে দেন যে, তিনি নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি মোতাবেক যেভাবেই ইচ্ছা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন?

মহানবী (স)—এর সুন্নাত ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র কি না?

বিজ্ঞ বিচারপতি বলেন, "একথা সঠিক যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কোন গুনাহ করেননি, কিন্তু তিনি ভুল করতে পারেন এবং এ সত্য স্বয়ং কুরআনেও স্বীকার করা হয়েছে।"

এ সম্পর্কে যদি কুরআন মজীদের অুসরণ করা হয় তবে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা মাত্র পাঁচটি জায়গায় মহানবী (স)-কে ভুলত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করেছেনঃ সূরা আনফালের ৬৭-৬৮ নং আয়াতে, সূরা তওবার ৪৩ নং আয়াতে, সূরা আহ্যাবের ৩৭ নং আয়াতে, সূরা তাহ্রীমের ১ নং আয়াতে এবং সূরা আবাসার ১-১০ নং আয়াতে। ৬ষ্ঠ স্থান যেখানে ধারণা করা যেতে পারে যে, হয়ত এখানেও কোন ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তা

হচ্ছে সুরা তওবার ৮৪ নং আয়াত। তেইশ বছরের গোটা নবুওয়াতী জীবনে এই পাঁচ অথবা ছয়টি স্থান ব্যতীত কুরআন মজীদে না মহানবী (স)-এর কোন ভুল-ত্রুটির উল্লেখ এসেছে আর না তার সংশোধনের।

এ থেকে যে কথা প্রমাণিত হয় তা এই যে, এ গোটা সময় ব্যাপী মহানবী (স) সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বাবধানে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি রাখতে থাকেন যে, তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি কোথাও যেন তাঁর ভুল প্রতিনিধিত্ব অথবা লোকদের ভুল পথে পরিচালনা না করেন। আর যে পাঁচ-ছয়টি স্থানে মহানবী (স)-এর সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ বাধা প্রদান করে তার সংশোধন করে দেয়া হয়। এই কয়টি স্থান ছাড়া যদি তাঁর আরও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যেত তবে তারও সাথে সাথে সংশোধন করে দেয়া হত, যেভাবে উপরোক্ত স্থানসমূহে সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। অতএব এই জিনিস মহানবী (স)-এর পথপ্রদর্শনের উপর থেকে আমাদের বিশ্বস্ততা ও নিশ্চয়তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার পরিবর্তে তাকে আরও শক্তিশালী করে দেয়। আমরা এখন নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, মহানবী (স)-এর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনের সমস্ত স্বরণীয় কার্যাবলী ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুমোদন (approval) রয়েছে।

রসূলের আনুগত্যের প্রকৃত অর্থ

মহানবী (স)-এর আনুগত্যের যে হুকুম কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে তাকে বিজ্ঞ বিচারক এই অর্থে গ্রহণ করেন যে, "আমাদেরকেও সেই রকম ঈমানদার, সৎ এবং সেই রকম কর্মতৎপর, দীনদার ও খোদাভীরু হতে হবে- যেমনটি ছিলেন মহানবী (স)।" তার মতে আনুগত্যের এই (কুরআনে উল্লেখিত) অর্থ "স্বভাববিরোধী এবং অবাস্তব যে, আমাদেরকেও ঠিক সেইভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং কাজকর্ম করতে হবে-যেভাবে মহানবী (স) চিন্তা করতেন ও কাজ করতেন।" তিনি বলেন, এই অর্থ গ্রহণ করলে জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারে আমাদের নিবেদন এই যে, এতবড় মৌলিক বিষয়টিকে খুবই হালকাভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আনুগত্যের অর্থ কেবলমাত্র রং-বৈশিষ্ট্যের সমরূপ হওয়া নয়, বরং চিন্তাধারার পদ্ধতি, মূল্যবোধের মানদন্ড, মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী, চরিত্র-নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার, জীবনাচার ও কার্যক্রম-সব কিছুরই আনুগত্য করা তার মধ্যে অপরিহার্যরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড়

কথা হচ্ছে, মহানবী (স) যেখানে শিক্ষক হিসাবে দীনের কোন হুকুম অনুযায়ী কাজ করে বলে দিয়েছেন, সেখানে ছাত্রের মতই সেই কাজে তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। এর অর্থ কখনও এই নয় যে, তিনি যে কাঠামোর পোশাক পরিধান করতেন আমাদেরও তাই পরিধান করতে হবে। তিনি যে ধরনের আহার করতেন আমাদেরকেও সেই জাতীয় খাদ্য আহার করতে হবে। তিনি যে ধরনের যানবাহন ব্যবহার করতেন আমাদেরও অনুরূপ যানবাহনে ভ্রমণ করতে হবে। অথবা তিনি যে ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতেন তা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র আমরা ব্যবহার করতে পারব না। আনুগত্যের এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করলে নিসন্দেহে জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। কিন্তু উম্মাতের মধ্যে আজ পর্যন্ত এমন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি অতীত হননি, যিনি আনুগত্যের উপরোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করে থাকবেন। আনুগত্যের অর্থ সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা এই বুঝেছে যে, মহানবী (স) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাপদ্ধতি এবং দীনের মূলনীতি ও হুকুম–আহ্‌কামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাতে আমরা তাঁর অনুসরণ করব।

উদাহরণস্বরূপ ঐ একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়টিই নেয়া যেতে পারে, যে সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারক ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে মহানবী (স)–এর কথা ও কাজের দ্বারা চূড়ান্তভাবেই এই চিন্তাভংগীর প্রকাশ পায় যে, একাধিক বিবাহ মূলত কোন খারাপ কিছু নয়, যার উপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজন রয়েছে এবং এক বিবাহ মূলত কোন কাংখিত মূল্যবোধ নয় যাকে মানদন্ড হিসাবে দৃষ্টির সামনে রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে। অতএব মহানবী (স)–এর আনুগত্যের দাবী এই যে, উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের চিন্তাপদ্ধতিও তদ্রূপ হতে হবে। তাছাড়া এ প্রসংগে কুরআনের পথনির্দেশের উপর মহানবী (স)–এর নিজের শাসনকালে যেভাবে আমল করা হয়েছিল তা ঐ পথনির্দেশের যথার্থ ব্যাখ্যা যার আনুগত্য আমাদের করতে হবে। তাঁর যুগে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের বর্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক গুণ বেশী খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি ইংগিতেও এসব কারণে একাধিক বিবাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে তিনি একথা বলেননিঃ প্রথমে প্রমাণ কর যে, বাস্তবিকই তোমার দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন এবং তুমি দুই বা ততোধিক স্ত্রীর খোরপোষ বহনে সক্ষম। তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করেননি যে, কোন ইয়াতীম শিশুর লালন–পালনের জন্য তুমি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাও? তিনি কাউকেও বলেননি যে, প্রথমে তোমার বর্তমান স্ত্রীকে সম্মত কর। তাঁর শাসনকালে কোন ব্যক্তির জন্য স্বেচ্ছায় চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের পরিষ্কার অনুমতি ছিল। তাঁর যুগে যদি

কখনও হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে তবে তা কেবল তখনই হয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করেনি। এখন আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারী হয়ে থাকি তবে আমাদের কাজ এই হওয়া উচিৎ নয় যে, দুই-তিনটি আয়াত নিয়ে স্বয়ং ইজতিহাদ করতে বসে যাব। বরং আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, যে রসূলের উপর এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল তিনি এর কি উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছিলেন এবং কিরূপে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন।

মহানবী (স) এর পথনির্দেশ কি তাঁর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল?

বিজ্ঞ বিচারকের বক্তব্য হলো, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও আচার-ব্যবহারকে সর্বাধিক যতটুকু কাজে লাগানো যেতে পারে তা শুধু এই যে, তার মাধ্যমে "এটা জানার জন্য সাহায্য নেয়া যেতে পারে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা কিভাবে করা হয়েছিল, অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ নীতিমালাকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।"

উপরোক্ত বক্তব্য তার পাঠকের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা এই যে, বিজ্ঞ বিচারকের মতে মহানবী (স)-এর পথনির্দেশ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য ছিল না এবং চিরকালের জন্যও ছিল না, বরং তাঁর যুগের একটি বিশেষ সমাজের জন্য ছিল। তার নিম্নোক্ত বাক্য থেকেও একই প্রতিক্রিয়া হয়ঃ "একজন একক ব্যক্তির জীবনকালের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা একটি সীমিত সংখ্যার অধিক লোকের জন্য দৃষ্টান্ত সরবরাহ করতে পারে না।"

এ বিষয়ে তিনি যেহেতু বিস্তারিতভাবে নিজের দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করেননি, তাই এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো করা যায় না, কিন্তু তার বক্তব্য যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা নিবেদন করা আমরা জরুরী মনে করি।

কুরআন মজীদ সাক্ষী যে, তা (কুরআন) স্বয়ং একটি বিশেষ যুগে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও যেমন একটি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী নির্দেশনামা, অনুরূপভাবে তার বাহক রসূলও একটি সমাজে কয়েক বছর যাবত রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও গোটা মানব জাতির জন্য আজ পর্যন্ত এবং অনাগত কাল পর্যন্ত পথপ্রদর্শক। যেভাবে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

"এই কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে-যাতে আমি এর সাহায্যে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি"-(সূরা আনআমঃ ১৯)।

ঠিক তদ্রূপ কুরআনের বাহক রসূল (স) সম্পর্কেও বলা হয়েছেঃ

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ـ

"(হে মুহাম্মাদ!) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল"–(সূরা আরাফঃ ৫৮)।

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ـ

"আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি"–(সূরা সাবাঃ ২৮)।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল এবং নবীগণের শেষ"–(সূরা আহ্যাবঃ ৪০)।

এদিক থেকে "কুরআন ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" (স)–এর পথনির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি সাময়িক ও সীমিত হয় তবে উভয়ই হবে, যদি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয় তবে উভয়ই হবে। কে না জানে যে, ৬১০ খৃষ্টাব্দে কুরআন নাযিল শুরু হয় এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তার অবতরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়। কে না জানে যে, এই কুরআনের সম্বোধনকৃত লোক ছিল তৎকালীন আরবজাতি এবং তাদের অবস্থা সামনে রেখে তাতে পথনির্দেশ দান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কিসের ভিত্তিতে এই পথনির্দেশকে সর্বকালের জন্য এবং আগত–অনাগত গোটা মানবজাতির জন্য হেদায়াতের উৎস বলে স্বীকৃতি দেই? এই প্রশ্নের যে উত্তর হতে পারে–নিম্নোক্ত প্রশ্নেরও ঠিক একই উত্তর হবে যে, এক ব্যক্তির নবুওয়াতী জীবন যা সপ্তম শতকে মাত্র ২২টি সৌর বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার অভিজ্ঞতা সর্বকালের জন্য এবং গোটা মানবজাতির জন্য কিভাবে পথনির্দেশের মাধ্যম হতে পারে? হেদায়াতের এই দুটি উৎস বা মাধ্যম স্থান–কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সর্বকালীন ও বিশ্বব্যাপক পথনির্দেশ দান করতে পারে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। এখানে আমরা শুধু এতটুকু জানতে চাই যে, যেসব লোক কুরআনের সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূলের মধ্যে কিসের ভিত্তিতে পার্থক্য করে? অবশেষে কোন্ যুক্তিতে একের (কুরআনের) পথনির্দেশ সাধারণ বা ব্যাপক এবং অপরের (রসূলের) পথনির্দেশ সীমিত ও নির্দিষ্ট?

খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক সুন্নাত অনুসরণের কারণ

এই নীতিগত আলোচনার পর ২৪ নং প্যারায় বিজ্ঞ বিচারপতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীন নিজ নিজ যুগে যদিও সুন্নাতের অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু তার কারণ কি? এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

"চারজান খলীফা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর কথা, কাজ ও আচার–ব্যবহারের কতটা গুরুত্ব দিতেন তা জ্ঞাত হওয়ার মত কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, তাঁরা লোকদের সমস্যাবলী এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমাধান পেশ করার জন্য ব্যাপাক ভাবে হাদীসের প্রয়োগ করতেন, তবে তাঁরা ঠিকই করেছেন। কারণ তাঁরা স্থান–কালের বিচারে আমাদের তুলনায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন।"

আমাদের নিবেদন এই যে, অতীত কালের কোন ঘটনা সম্পর্কে যে সাক্ষ্য সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্ভব এতটা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যই নিম্নোক্ত বিষয়ে বর্তমান রয়েছে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনই অত্যন্ত কঠোরতার সাথে রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের অনুসরণ করতেন এবং তার কারণ এই ছিল না যে, তাদের যুগের পরিস্থিতি রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগের পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, বরং তার কারণ এই ছিল যে, তাদের মতে কুরআনের পরেই সুন্নাত ছিল আইনের উৎস। তার থেকে সীমাতিক্রম করাকে তাঁরা নিজেদের জন্য বৈধ মনে করতেন না। এ সম্পর্কে তাদের নিজেদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা এই গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৮ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত "খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধে অপবাদ" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উধৃত করে এসেছি। তাছাড়া এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে চতুর্দশ হিজরী শতক পর্যন্ত প্রতি শতকের ফিক্‌হ সাহিত্য অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্নভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের এই মত ও কর্মধারাই বর্ণনা করে আসছে। বর্তমান কালে কতিপয় লোক তাঁদের সুন্নাত অমান্য করার যেসব নজীর পেশ করছে তার মধ্যে একটিও মূলত একথার নজীর নয় যে, কোন খলীফায়ে রাশেদও কার্যত সুন্নাত অমান্য করেছেন, অথবা নীতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে এরূপ করার অধিকারী মনে করেছেন। এর মধ্যে কতিপয় নজীরের তাৎপর্য আমরা এই গ্রন্থের ১৯২–১৯৬ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করে এসেছি (২৬–২৮ নং অভিযোগের উত্তর দ্র.)।

ইমাম আবু হানীফা (রহ)—এর হাদীসের জ্ঞান ও সুন্নাতের অনুরসণ

অতপর বিজ্ঞ বিচারপতি ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর দৃষ্টিভংগীকে প্রমাণ

"কিন্তু আবু হানীফা, যিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০ বছর পরে মারা যান, মাত্র ১৭ কি ১৮ টি হাদীস তার সামনে পেশকৃত বিষয়ের সমাধানের জন্য ব্যবহার করেন। খুব সম্ভব এর কারণ এই ছিল যে, তিনি চার খলীফার অনুরূপ রসূলুল্লাহর যুগের নিকটবর্তী ছিলেন না। তিনি তার সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি কুরআনের লিপিবদ্ধ নির্দেশনামার উপর রাখেন এবং কুরআনের মূল পাঠের শব্দসমষ্টির পেছনে সেইসব ক্রিয়াশীল উপাদান অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন যা সেই নির্দেশের কারণ ছিল। তিনি যুক্তি প্রদান ও সমাধান বের করার পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বাস্তব অবস্থার আলোকে কিয়াসের ভিত্তিতে আইনের মূলনীতি ও নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করেন। হাদীসের সাহায্য ব্যতিরেকে সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার যদি ইমাম আবু হানীফার থেকে থাকে, তবে অপর মুসলমানদের এই অধিকার প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না"-(প্যারা ২৪)।

উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণতো ভুল বিবরণ ও কল্পনা প্রসূত বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। ইমাম আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে ইবনে খালদুন না জানি কোন্ সনদের ভিত্তিতে এ কথা লিখে দিয়েছেন যে, "হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা এতো বেশী কঠোর ছিলেন যে, তাঁর মতে ১৭-এর অধিক হাদীস সহীহ ছিল না।"

উপরোক্ত কথা প্রচলিত হতে হতে লোকদের মধ্যে এভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, ইমাম আবু হানীফার মাত্র ১৭ টি হাদীসের জ্ঞান ছিল, অথবা বলা হয় তিনি ১৭টি হাদীস থেকে সমাধান বের করেছেন। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী কল্পকাহিনী। আজ ইমাম আবু হানীফার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর প্রণীত 'কিতাবুল আছার' শীর্ষক গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান রয়েছে, যার মধ্যে তিনি নিজ উস্তাদের বর্ণনাকৃত এক হাজার হাদীস একত্র করেছেন। তাছাড়া ইমাম সাহেবের অপরাপর প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ আল-লুলুঈ (রহ) এবং ইমামের পুত্র হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফাও তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহের সংকলন তৈরী করেছিলেন। অতপর অব্যাহতভাবে কয়েক শতাব্দী যাবত অসংখ্য আলেম তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহ "মুসনাদে আবী হানীফা"[১] শীর্ষক নামে জমা করতে থাকেন। তার মধ্যে ১৫ খানা মুসনাদের একটি ব্যাপক সংকলন কাযীল

১. হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায়-একক ব্যক্তির রিওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহ যে গ্রন্থে সংকলনাবদ্ধ করা হয় তাকে "মুসনাদ" বলা হয়।

কুযাত (প্রধান বিচারপতি) মুহাম্মাদ ইবনে মাহ্মূদ আল-খাওয়ারাযমী "জামি মাসানিদিল ইমাম আল-আজম" শিরোনামে সংকলন করেছেন যা হায়দরাবাদের 'দাইরাতুল মাআরিফ' শীর্ষক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এসব কিতাব এই দাবী চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন অথবা তিনি ফিক্হী মাসআলা প্রণয়নে মাত্র ১৭টি হাদীস ব্যবহার করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উস্তাদের সংখ্যা (যাদের রিওয়ায়াত তিনি গ্রহণ করেছেন) চার হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁকে হাদীসের প্রবীণ হাফেজদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রকারীদের মধ্যে ইমাম দারু কুতনী, ইবনে শাহীন এবং ইবনে উকদার মত নামকরা হাদীসবেত্তাগণ শামিল রয়েছেন। কোন ব্যক্তি হানাফী ফিক্হ-এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র ইমাম তাহাবী (রহ)-এর "শারহু মাআনিল আছার," আবু বাক্র আল-জাসসাস (রহ)-এর "আহ্কামুল কুরআন" এবং ইমাম সারাখসীর "আল-মাবসূত" দেখে নিলে সে কখনও এই ভুল ধারণার শিকার হবে না যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) হাদীসকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কিয়াস ও কুরআনের উপর নিজের ফিক্হ-এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

আবার হাদীস থেকে যুক্তিপ্রমাণ গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর যে দৃষ্টিভংগী ছিল তা তিনি নিজেই নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেনঃ

"আমি যখনই কোন হুকুম আল্লাহর কিতাবে পেয়ে যাই তখনই তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরি। যদি তাতে না পাই তবে রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত এবং তাঁর সেইসব হাদীস গ্রহণ করি যা নির্ভরযোগ্য লোকদের কাছে নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ। অতপর যখন আল্লাহ্র কিতাবেও নির্দেশ পাওয়া যায় না এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতেও না, তখন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের বক্তব্যের (অর্থাৎ তাদের ইজমার অনুসরণ করি এবং তাদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে যে সাহাবীর বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ করি আর যারটা চাই বর্জন করি। কিন্তু তাদের সকলের বক্তব্য ত্যাগ করে অপর কারো কথা গ্রহণ করি না। অন্যদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইজতিহাদের অধিকার যেমন তাদের আছে, তেমন আমারও আছে"-(তারীখে বাগদাদ, আল-খাতীব রচিত, ১৩ খ., পৃ. ৩৬৮; আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, মানাকিব ইমাম আজম, ১খ., পৃ. ৭৯; আয-যাহাবী, মানাকিব ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইন, পৃ. ২০)।

ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর সামনেই একবার তাঁকে অপবাদ দেয়া হল যে, তিনি কিয়াসকে কুরআনের উপর অগ্রাধিকার দেন। এর জবাবে তিনি বলেন,

"আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে এবং আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে যে বলেছে–আমি কিয়াসকে কুরআনের উপর অগ্রাধিকার দেই। আল্লাহ্‌র কিতাবে দলীল বর্তমান থাকতে কিয়াসের কি আর প্রয়োজন থাকে"–(শারানী, কিতাবুল মীযান, ১খ., পৃ. ৬১)।

আব্বাসী খলীফা মানসূর একবার ইমাম সাহেবকে লিখে পাঠান, আমার কানে এসেছে আপনি কিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেন। উত্তরে তিনি লিখে পাঠান, "আমীরুল মুমিনীন! যে কথা আপনার কানে পৌঁছেছে তা ঠিক নয়। আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করি, অতপর রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতের উপর, অতপর আবু বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী (রা)–র সিদ্ধান্তের উপর, এরপর অবশিষ্ট সাহাবীদের সিদ্ধান্তের উপর। অবশ্য সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে আমি কিয়াসের আশ্রয় নেই"–(শারানী, কিতাবুল মীযান, ১খ., ৬২)।

আল্লামা ইবনে হাযম (রহ) তো এ পর্যন্ত লিখেছেন, "আবু হানীফা (রহ)–এর সকল সংগী একমত যে, আবু হানীফা (রহ)–এর মাযহাব ছিলঃ যঈফ হাদীসও পাওয়া গেলে তা গ্রহণপূর্বক কিয়াস ও রায় পরিত্যাগ করতে হবে"–(যাহাবী, মানাকিব ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইন, পৃ. ২১)। প্রকাশ থাকে যে, যঈফ হাদীসের অর্থ জাল হাদীস নয়। এখানে যঈফ হাদীস বলতে এমন হাদীস বুঝানো হয়েছে যার সনদসূত্র শক্তিশালী নয়, কিন্তু যা থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, এটা মহানবী (স)–এর কথাই হবে।

বিচারপতির মতে হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণ

এরপর বিজ্ঞ বিচারকের মতে যেসব কারণে হাদীস নির্ভরযোগ্য নয় এবং দলীল–প্রমাণও নয়, ২৫ নং প্যারায় তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রসংগে তার আলোচনার বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. "ইসলামের সকল ফকীহ্‌ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যুগের পরিক্রমায় জাল হাদীসের একটি বিরাট স্তূপকে ইসলামী আইনের এক বৈধ ও স্বীকৃত উৎস হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। মিথ্যা হাদীস স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে প্রকাশ পাওয়া শুরু করে। মিথ্যা ও ভ্রান্ত হাদীসের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, হযরত উমার (রা) তার খিলাফতকালে হাদীস বর্ণনার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, বরং তার বর্ণনা নিষিদ্ধ করে দেন। ইমাম বুখারী ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে মাত্র নয় হাজার হাদীস সহীহ্‌ হিসাবে নির্বাচন করেন।"

২. "আমি বুঝতে পারছি না কোন লোক কি একথা অস্বীকার করতে পারে যে, কুরআনকে যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তদ্রূপ প্রচেষ্টা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের যুগে হাদীসসমূহের সংরক্ষণের জন্য নেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যে সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে তা এই যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে তাঁর কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করতে চরমভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দেন, কোন ব্যক্তি তাঁর হাদীসসমূহ সংরক্ষণ করে থাকলে সে যেন তা অবিলম্বে নষ্ট করে দেয়। لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا ولا حرج এ হাদীস অথবা এ ধরনেরই একটি হাদীসের তরজমা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী[২] তার "দীন ইসলাম" নামক গ্রন্থের ১৯৬২ সনের সংস্করণের ৬২ নং পৃষ্ঠায় এভাবে দিয়েছেনঃ "বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা হাদীস লিখছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি লিখছ? আমরা বললাম, হাদীস যা আমরা আপনার নিকট শুনি। তিনি বললেন, কি! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আরও একটি কিতাব?

৩. "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পরপরই চার খলীফার যুগে হাদীস সংরক্ষণ অথবা সংকলন করা হয়েছিল বলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান নেই। এই বাস্তব ঘটনার কি অর্থ হতে পারে? বিষয়টি গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে। একথা বলা যায় কি, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এবং তাঁর পরে আগত চার খলীফা হাদীস সংরক্ষণের চেষ্টা এজন্য করেননি যে, এসব হাদীস সাধারণ ব্যবহারের জন্য ছিল না?"

৪. "মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কুরআন মুখস্ত করে নিয়েছিল। যখন ওহী আসত তার পরপরই লেখার যেসব উপকরণ সহজলভ্য

---

১. আশ্চর্যের কথা, সম্ভবত ঘটনাক্রমেই এরূপ হয়ে থাকবে যে, বিজ্ঞ বিচারক তার রায়ের মধ্যে যতগুলো আয়াত ও হাদীসের উধৃতি দিয়েছেন তার অনুবাদও সাথে দিয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসের অনুবাদ তিনি দেননি। এর অনুবাদ এই যেঃ আমার থেকে কোন জিনিস লিখ না। আর কোন ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। "অবশ্য মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা কর, তাতে আপত্তির কিছু নাই।" এ হাদীসের দুই কমার মাঝখানের অংশ বিজ্ঞ বিচারকের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. অর্থাৎ কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপের নেতা। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহার মরহুম নন।

হত তার উপর তা লিখে নেয়া হত এবং এই উদ্দেশ্যে রসূলে করীম (স) কতিপয় সুশিক্ষিত সাহাবীকে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, তা না মুখস্ত করা হয়েছিল, আর না সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তা এমন লোকদের মগজে লুক্কায়িত ছিল যারা ঘটনাক্রমে কখনও অন্যদের সামনে তা বর্ণনা করার পরপরই মরে গেছে। এমনকি রসূলের ওফাতের কয়েক শত বছর পর তা সংগ্রহ ও সংকলনাবদ্ধ করা হয়।”

৫. “একথা স্বীকার করা হয় যে, পরবর্তী কালে প্রথম বারের মত রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রায় একশত বছর পর হাদীসসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার রেকর্ড আজ দুষ্প্রাপ্য। এরপর তা নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সংগ্রহ করেনঃ ইমাম বুখারী (মৃ.২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃ.২৬১ হি.), আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), জামে তিরমিযী[৩] (মৃ. ২৭৯ হি.), সুনানে নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.), সুনানে ইবনে মাজা[৪] (মৃ. ৩৮৩ হি.), সুনানুদ দরীবী[৫] (মৃ. ১৮১ হি.), বায়হাকী (জ. ৩৮৪ হি.), ইমাম আহ্‌মাদ (জ. ১৬৪ হি.)।” বিজ্ঞ বিচারপতি এরপর শীআ সম্প্রদায়ের মুহাদ্দিসদের উল্লেখ করেছেন। এদের উল্লেখ আমরা এজন্য করলাম না যে, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা শীআ আলেমগণের দায়িত্ব।

৬. “এমন হাদীস খুব কমই আছে যে সম্পর্কে হাদীসের এই সংকলকগণ একমত হতে পেরেছেন। এই জিনিস (মতানৈক্য) কি হাদীসসমূহের উপর আস্থা স্থাপনের ব্যাপারটি চরমভাবে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয় না?”

৭. “যাদের উপর তথ্যানুসন্ধানের কাজ অর্পণ করা হবে তারা অবশ্যই এদিকে দৃষ্টি রাখবে যে, হাজার হাজার জাল হাদীস ছড়ানো হয়েছে যাতে ইসলাম ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র দুর্নাম গাওয়া যেতে পারে।”

৮. “তাদেরকে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আরবদের স্মৃতিশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শুধুমাত্র স্মৃতি থেকে নকলকৃত বিবরণ কি

---

৩. বিজ্ঞ বিচারক নামটা এভাবে লিখেছেন, অথচ জামে তিরমিযী সংকলকের নাম নয়, বরং সংকলনের নাম। সংকলক ইমাম তিরমিযী নামে পরিচিত।

৪. এও সংকলকদের নাম নয়, সংকলনের নাম। সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজার তো এখনও মৃত্যু হয়নি (কারণ উভয়ই দুটি গ্রন্থ)।

৫. আমাদের জানামতে এ নামের কোন সংকলক নেই, না এই নামের কোন কিতাব আছে।

নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে? অবশেষে বর্তমান আরবদের স্মৃতিশক্তি তো তদ্রূপই রয়ে গেছে যেরূপ স্মৃতিশক্তি তেরশত বছর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে থাকবে। আজকাল আরবদের যা কিছু স্মরণশক্তি আছে তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌছতে এক গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা হিসাবে আমাদের কাজে আসতে পারে যে, যেসব রিওয়ায়াত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা সঠিক ও যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে কি আস্থা স্থাপন করা যায়?"

৯. "আরবদের বাড়াবাড়ি এবং যেসব বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এসব রিওয়ায়াত আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও গোঁড়ামিও অবশ্যই ব্যাপক আকারে রিওয়ায়াত নকল করতে গিয়ে তাকে কদাকার করে থাকবে। শব্দসমষ্টি যখন এক মস্তক থেকে অন্য মস্তকে স্থানান্তরিত হয়, সেই মস্তক চাই আরবদের হোক বা অপর কারো, মোটকথা এই শব্দভান্ডারে এমন পরিবর্তন সূচীত হয় যা প্রতিটি মস্তিষ্কের নিজস্ব ছাঁচের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে। প্রতিটি মস্তিষ্ক তা নিজস্ব কায়দায় উলটপালট করে, এবং শব্দভান্ডার যখন অনেক মস্তিষ্ক অতিক্রম করে আসে তখন যে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, তার মধ্যে কত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।"

উল্লেখিত কারণসমূহের সমালোচনা

এই নয়টি দফা আমরা বিজ্ঞ বিচারপতির নিজের বাক্যে তার নিজস্ব ধারাবাহিকতা অনুযায়ী উধৃত করলাম। এখন আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়ন করে দেখব, এগুলো কতটা সঠিক এবং এগুলোকে হাদীসসমূহের উপর আস্থা স্থাপন না করার এবং সুন্নাতকে দলীল-প্রমাণ হিসাবে না মানার ব্যাপারে যুক্তি হিসাবে কতটা গ্রহণ করা যায়?

জাল হাদীস কি ইসলামী আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে?

সর্বপ্রথম তার ১নং ও ৭নং দফার উপর আলোকপাত করব। জাল হাদীসসমূহের একটি বিরাট স্তূপ ইসলামী আইনের উৎসের মধ্যে প্রবেশ করার বিষয়টি ইসলামের সকল ফকীহ ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নিয়েছেন -তার এ দাবী বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামের ফকীহগণ নিসন্দেহে একথা স্বীকার করেন যে, প্রচুর জাল হাদীস রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একজনও একথা সমর্থন করে থাকেন যে, এসব হাদীস ইসলামী আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে, তবে এ ধরনের মাত্র একজন ফকীহ অথবা মুহাদ্দিস অথবা নির্ভরযোগ্য আলেমে দীনের নাম আমাদের বলা হোক।

ঘটনা এই যে, জাল হাদীস যখন থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে তখন থেকেই মুহাদ্দিসগণ, মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ফকীহ্গণ নিজেদের সার্বিক প্রচেষ্টা এদিকে নিয়োজিত করেন যে, এই দুর্গন্ধময় নর্দমা যেন ইসলামী আইনের সূত্রসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হতে না পারে। যেসব হাদীসের সাহায্যে শরীআতের কোন বিধান প্রমাণিত হত, সে সব হাদীসের পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধানেই বেশীরভাগ তাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়। ইসলামী বিচারালয়ের বিচারকগণও সদা সতর্ক ছিলেন যে, কেবলমাত্র (রসূলুল্লাহ বলেন)" শুনেই যেন তারা কোন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী মামলার রায় না দেন, বরং তার পূর্ণ যাচাই-বাছাই করতেন, যার আলোকে কোন অপরাধী নিস্কৃতি পেতে পারে অথবা শাস্তি পেতে পারে, অথবা বাদী কোন ব্যাপারে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে অথবা তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক কালের আদালতের হাকীমগণ ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞ বিচারপতি এবং তাদের সহকর্মীদের তুলনায় কিছু কম সতর্ক ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য এটা কি করে সম্ভব ছিল যে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ব্যতীত কোন জিনিসকে অইনগত নির্দেশ মেনে নিয়ে তারা রায় প্রদান করে বসেছেন? আর মামলার পক্ষদ্বয়ই বা কিভাবে ঠান্ডা মাথায় এটা বরদাশত করতে পারে যে, একটি আইনগত নির্দেশ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কোন কাচাপাকা রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হবে? অতএব একথাও বাস্তবিকই সত্য নয় যে, ইসলামী আইনের উৎসের মধ্যে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ইসলামের ফকীহ্গণও এই অনুপ্রবেশকে একমত হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন।

মহানবী (স)—এর যুগেই কি জাল হাদীসের প্রচলন শুরু হয়েছিল?

বিজ্ঞ বিচারপতির একথাও চরম বিভ্রান্তিকর যে, জাল হাদীস স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। মূলত এর রহস্য এই যে, জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি মদীনাস্থ কোন এক গোত্রের কন্যাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু কন্যাপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হিজরতের পর প্রথমদিকেই ঐ ব্যক্তি একটি জুব্বা পরিধান করে সেই গোত্রে গিয়ে পৌছে এবং কন্যাপক্ষের নিকট গিয়ে বলে যে, রসূলুল্লাহ (স) নিজে আমাকে এই জুব্বা পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে অত্র গোত্রের প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। গোত্রের লোকেরা তাকে বাহন থেকে নামিয়ে নিল এবং গোপনে ব্যাপারটি মহানবী (স)-কে অবহিত করে। মহানবী (স) বলেন, "মিথ্যা বলেছে আল্লাহর এই দুশমন।" অতপর তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যাও-তাকে যদি জীবন্ত

পাও হত্যা কর, আর যদি মৃত পাও, তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দাও। এই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে দেখে যে, তাকে সাপে কামড় দিয়েছে, ফলে সে মারা গেছে। অতএব নির্দেশ অনুযায়ী তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর মহানবী (স) সাধারণ্যে ঘোষণা দিতে থাকেন, যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলে সে দোযখে যাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে যায়।[১] উপরোক্ত কঠোর সতর্কতামূলক কার্যক্রমের ফল এই হয়েছিল যে, প্রায় ৩০-৪০ বছরের মধ্যে মনগড়া হাদীস ছড়ানোর কোন ঘটনা আর ঘটেনি।

হযরত উমার (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন কেন?

বিচারপতি সাহেবের একথাও একটি প্রমাণহীন দাবী যে, হযরত উমার (রা)-র যুগ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে জাল হাদীসের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, হযরত উমারকে হাদীস বর্ণনার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হল, বরং তা সম্পুর্ণ বন্ধ করে দিতে হল।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে যদি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক তার বরাত উল্লেখ করা হোক। সে যুগে বাস্তবিকই মনগড়া হাদীসের কোন ফেতনাই উত্থিত হয়নি। ইতিহাসে এর কোনো প্রকার উল্লেখ নেই। হযরত উমার (রা) যে কারণে অধিক হাদীস বর্ণনা পছন্দ করতেন না তা মূলত এই যে, দক্ষিণ আরবের সামান্য এলাকা ব্যতীত ঐ সময় পর্যন্ত আরব দেশে কুরআন মজীদের ব্যাপক প্রচার হয়নি। আরবের বেশীর ভাগ এলাকা মহানবী (স)-এর পবিত্র জিন্দেগীর শেষাংশে ইসলামের প্রভাবাধীনে এসেছিল এবং আরবেই সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা তখনও পূর্ণভাবে শুরু হতে পারেনি। এই অবস্থায় মহানবী (স)-এর ইন্তেকাল, এবং তারপরে হযরত আবু বাক্‌র (রা)-র খেলাফতকালে ধর্মত্যাগীদের বিশৃংখলার প্রাদুর্ভাব হওয়ার কারণে একাজ এলোমেলো হয়ে যায়। হযরত উমার (র)-র যুগেই মুসলমানগণ নিশ্চিন্তে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পান। এসময় গোটা জাতিকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া অধিক জরুরী ছিল এবং কুরআনের সাথে অন্য কোন জিনিসের বিভ্রাট সৃষ্টির আশংকা হওয়ার মত কাজ তখন বন্ধ রাখা দরকার ছিল। যেসব সাহাবী মহানবী (স)-এর পক্ষ থেকে লোকদের নিকট কুরআন পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁরাই যদি সাথে

---

১. সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে আদী তাঁর "আল-কামিল ফী মারিফাতিদ-দুআফা ওয়াল-মাতরূকীন" শীর্ষক গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সাথে মহানবী (স)--এর হাদীস বর্ণনা করতে থাকতেন তবে বেদুইনদের এক বিরাট অংশের হাদীসের সাথে কুরআনের আয়াতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মুখস্ত করে নেয়ার আশংকা ছিল। এই সার্বিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা হযরত উমার (রা) এক স্থানে নিজেই বর্ণনা করেছেন।

উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহ) বলেন, "হযরত উমার (রা) একবার রসূলুল্লাহ (স)–এর সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ সম্পর্কে তিনি সাহাবীদের পরামর্শ নিলেন। সকলে মত ব্যক্ত করেন যে, একাজ অবশ্যই করা উচিৎ। কিন্তু হযরত উমার (রা) লেখার কাজ শুরু করার ব্যাপারে একমাস পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে অতিবাহিত করেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন যে, যে জিনিসের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে সেদিকে যেন তিনি তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন। অবশেষে একমাস পর তিনি একদিন বলেন, "আমি সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা হল যে, তোমাদের পূর্বে একদল লোক অতিবাহিত হয়েছে, যারা অন্যান্য গ্রন্থ লিখেছিল, কিন্তু আল্লাহর কিতাব ত্যাগ করেছিল। অতএব আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে অন্য জিনিস শামিল হতে দেব না–" (তাদরীবুর–রাবী, পৃ. ১৫১, বায়হাকীর আল–মাদখাল–এর বরাতে)।

ইমাম বুখারী (রহ)— এর ছয় লক্ষ হাদীসের কল্পকাহিনী

বিজ্ঞ বিচারপতির আরও একটি বক্তব্য যা মারাত্মক ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে তা এই যে, "ইমাম বুখারী (রহ) ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে নয় হাজার হাদীসকে সহীহ হাদীস হিসাবে বাছাই করেছেন।"

উপরোক্ত বক্তব্যে কোন ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে বলতে পারে যে, ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে তো মাত্র নয় হাজার সহীহ হাদীস ছিল যা ইমাম বুখারী (রহ) গ্রহণ করেছেন এবং অবশিষ্ট ৫,৯১,০০০ জাল হাদীস উম্মাতের মধ্যে ছড়িয়েছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মূলত একটি ঘটনা যদি ধারাবাহিক সনদসূত্রে বর্ণিত হয়, তবে তা একটি হাদীস এবং ঐ একটি হাদীস যদি উদাহরণস্বরূপ ১০, ২০ অথবা ৫০টি বিভিন্ন সনদসূত্রে বর্ণিত হয়ে আসে তবে তাকে ১০, ২০ অথবা ৫০টি হাদীস বলা হয়। ইমাম বুখারী (রহ)–এর যুগ পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মহানবী (স)–এর এক একটি হাদীস এবং তাঁর জীবনের এক একটি ঘটনা অসংখ্য রাবী বহু সনদসূত্রে বর্ণনা করতেন এবং এভাবে কয়েক হাজার হাদীস কয়েক লক্ষ হাদীসের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইমাম বুখারী (রহ)–এর নীতি এই ছিল যে, তিনি কোন

ঘটনা যতগুলো সনদসূত্রে জ্ঞাত হতেন সেগুলোকে যথাযথতা যাচাই তাদের নিজস্ব শর্তাবলী (অর্থাৎ বর্ণনা সূত্রের যথার্থতা, আসল ঘটনার যথাযথতা নয়) মোতাবেক যাচাই-বাছাই করতেন এবং তার মধ্যে সনদ (বর্ণনা সূত্র) অথবা যেসব সনদ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করতেন তা বেছে নিতেন। কিন্তু তিনি কখনও এই দাবী করেননি যে, যেসব হাদীস তিনি বেছে নিয়েছেন এ পর্যন্তই সহীহ্ এবং অবশিষ্ট সমস্ত রিওয়ায়াত সহীহ্ নয়।[১] তাঁর নিজের বক্তব্য এই যে, "আমি আমার গ্রন্থে এমন কোন হাদীস স্থান দেইনি যা সহীহ নয়, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বিরাট হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক সহীহ হাদীসও বাদ দিয়েছি "[তারীখ বাগদাদ, ২খ., পৃ. ৮-৯; তাহ্যীবুন-নববী, ১খ, পৃ. ৭৪; তাবাকাতুস-সুবকী, ২খ, ৭১]। বরং আরও এক স্থানে তিনি এর ব্যাখ্যাদান প্রসংগে বলেন, "আমি যেসব সহীহ হাদীস বাদ দিয়েছি তা সংখ্যায় আমার বেছে নেয়া হাদীসের চেয়ে অধিক"। আরও এই যে, "আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্ত আছে-" (শুরূতুল-আইম্মাতিস-সিত্তা, পৃ. ৪৯)। প্রায় এই একই কথা ইমাম মুসলিম (রহ)-ও বলেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, "আমি আমার গ্রন্থে যেসব হাদীস একত্র করেছি তাকে আমি সঠিক বলে দাবী করি। কিন্তু আমি কখনও একথা বলি না যে, আমি যেসব হাদীস নেইনি তা যঈফ বা দুর্বল"-(তাওজীহুন-নযর, পৃ. ৯১)।

জাল হাদীস কেন রচনা করা হয়েছিল?

বিজ্ঞ বিচারপতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জোর দিয়ে বলেছেন, হাজার হাজার জাল হাদীস রচনা করা হয়েছিল এবং তিনি একথার উপরও জোর দিয়েছেন যে, তথ্যানুসন্ধানী পর্যালোচকগণ যেন এ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করেন।

কিন্তু আমাদের নিবেদন এই যে, তথ্যানুসন্ধানী পর্যালোচকগণকে সাথে সাথে এই প্রশ্ন সম্পর্কেও গভীর চিন্তাভাবনা করতে হবে যে, এই হাজার

---

১. এ স্থানে একটি ভুল বুঝাবুঝি দূর করে দেয়া আবশ্যক। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় "সহীহ" বলতে সেইসব হাদীস বুঝায় যার সনদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি সহীহ হওয়ার নির্দিষ্ট শর্তাবলী বর্তমান রয়েছে। এর চেয়ে আরেকটু নীচের স্তরের হাদীসের জন্য তাঁরা অন্যান্য পরিভাষাসমূহের ব্যবহার করেন। কিন্তু ইলমে হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকেরা সহীহ হাদীসের অর্থ করে সত্য হাদীস এবং ধারণা করে যে, এ ছাড়া যত হাদীস আছে তা মিথ্যা ও মনগড়া। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

হাজার জাল হাদীস শেষ পর্যন্ত ঐ যুগে কেন রচনা করা হয়েছিল? তা রচনার কারণ তো এটাই ছিল যে, মহানবী (স)-এর কথা ও কাজ হুজ্জাত (দলীল-প্রমাণ) ছিল এবং একটি মনগড়া কথা তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে মিথ্যুক লোকেরা কোন না কোন স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছিল। মহানবী (স)-এর কথা ও কাজ যদি হুজ্জাত না হত এবং কোন ব্যক্তির জন্য নিজের কোন দাবীর পক্ষে হাদীস পেশ করা বা না করা অর্থহীন হত, তবে কারো জন্য একটি মনগড়া কথা রচনার কষ্ট স্বীকার করার কি প্রয়োজন ছিল? দুনিয়াতে কোন জাল বস্তু রচনাকারী তো এমন জাল মুদ্রা তৈরী করে যা বাজারে চালানো যেতে পারে। যে মুদ্রার কোন মর্যাদা ও মূল্যই নাই তার নকল শেষ পর্যন্ত কোন্ নির্বোধ তৈরী করে? যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন সময় জালিয়াতদের কোন গ্যাং দেশে প্রচলিত মুদ্রার হাজার হাজার নকল তৈরী করে ফেলেছে তবে এর উপর ভিত্তি করে কারো এরূপ যুক্তি প্রদান কি সঠিক হবে যে, দেশে প্রচলিত সমস্ত মুদ্রা তুলে নিয়ে ফেলে দেয়া উচিৎ, কারণ জাল মুদ্রার বর্তমানে কোনো মুদ্রা সম্পর্কেই আস্থা স্থাপন করা যায় না? দেশের প্রত্যেক কল্যাণকামী নাগরিক তো সাথে সাথে এসব জালিয়াতকে গ্রেপ্তার করার এবং দেশের মুদ্রাকে এই বিপদ থেকে রক্ষার চিন্তায় লেগে যাবে।

ইসলামের প্রাথমিক কালে জাল হাদীসের ফেতনার প্রাদুর্ভাব হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের কল্যাণকামী লোকেরা ঠিক একই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ কর্মতৎপর হন এবং প্রতিটি জাল হাদীস রচনাকারীর সন্ধানপূর্বক তার নাম "আসমাউর রিজাল" শিরোনামের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, এক একটি জাল হাদীসের অনুসন্ধানপূর্বক-এজাতীয় মাওদূ (মনগড়া) হাদীসের সংকলন তৈরী করেছেন, হাদীসসমূহের যথার্থতা ও দোষক্রটি যাচাইয়ের জন্য অত্যন্ত কঠোর নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক লোকদেরকে সহীহ ও জাল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের যোগ্য করে তোলেন এবং কোন সময়েও যেন জাল হাদীস ইসলামী আইনের উৎসে অনুপ্রবেশ না করতে পারে সে পথ রুদ্ধ করে দেন। অবশ্য সেই যুগেও হাদীস অস্বীকারকারীদের চিন্তা পদ্ধতি এইরূপ ছিল যে, আইনের উৎসে গলদ হাদীস অনুপ্রবেশ করার ফলে গোটা হাদীস ভাণ্ডার সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে, অতএব সমস্ত হাদীস তুলে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। তারা এতটুকুও গ্রাহ্য করেনি যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতসমূহ পরিত্যাগ করলে ইসলামী আইনের উপর কি পরিমাণ ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে এবং স্বয়ং ইসলামের কাঠামো কত মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়ে পড়ে থাকবে।

যুক্তির তিনটি ভ্রান্ত ভিত্তি

এখন আমরা বিজ্ঞ বিচারপতির ২, ৩ ও ৪ নম্বর পয়েন্টের উপর আলোকপাত করব। উক্ত তিনটি বিষয়ে তার যুক্তির গোটা ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর স্থাপিত যা স্বয়ং ভ্রান্ত অথবা সত্য থেকে অনেক ভিন্নতর। (এক) রসূলুল্লাহ (স) হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। (দুই) মহানবী (স)–এর যুগে এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও কুরআন মজীদ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা তো হয়েছিল, কিন্তু হাদীসসমূহের সংরক্ষণের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। (তিন) হাদীসসমূহ সাহাবী ও তাবিঈগণের মনমানসে লুক্কায়িত পড়ে থাকে, তারা কখনও কখনও ঘটনাক্রমে তা অন্যদের সামনে উল্লেখ করতেন এবং এসব রিওয়ায়াত একত্র করার কাজ মহানবী (স)–এর কয়েক শত বছর পর করা হয়েছিল।

বাস্তব ঘটনার বিপরীত এই তিনটি ভিত্তির উপর বিজ্ঞ বিচারপতি প্রশ্নের ভংগিতে এই সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের পথনির্দেশ করেন যে, হাদীসের সাথে এই আচরণ এজন্য করা হয়েছে যে, তা মূলত সাময়িক গুরুত্বের অধিকারী ছিল, গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য অথবা সর্বকালের জন্য তাকে আইনের উৎস বানানোর উদ্দেশ্য ছিল না। যে তিনটি কথার উপর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যের কতটুকু উপাদান আছে এবং তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত স্বয়ং কতটা সঠিক, সম্মুখের আলোচনায় তা আমরা মূল্যায়ন করে দেখব।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা ও তার কারণসমূহ

বিজ্ঞ বিচারপতি রসূলুল্লাহ (স)–এর যে দুটি হাদীসের বরাত দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা মৌখিকভাবে বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং এর মধ্যে একটি হাদীসে তো মহানবী (স) পরিষ্কার বাক্যে বলেছেনঃ وحدثوا عني ولا حرج

“আমার বাণী মৌখিকভাবে বর্ণনা কর, এতে কোন আপত্তি নেই।”

কিন্তু শুধুমাত্র এই দুটি হাদীস গ্রহণপূর্বক তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং একই প্রসংগে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উপেক্ষা করা মূলতই ভ্রান্ত পদ্ধতি। এ প্রসংগে প্রথমে যে কথা অবগত হওয়া জরুরী তা এই যে, মহানবী (স) যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন গোটা আরব জাতিই ছিল অশিক্ষিত এবং নিজেদের যাবতীয় বিষয় মুখস্ত ও বাচনিকভাবে আঞ্জাম দিত। কুরাইশের মত উন্নত গোত্রের অবস্থা ঐতিহাসিক বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী এই ছিল যে,

তাদের মধ্যে মাত্র ১৭ ব্যক্তি পড়ালেখা জানত। বালাযুরীরই বক্তব্য অনুসারে মদীনায় ১১ ব্যক্তির অধিক লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। লেখার জন্য কাগজ ছিল দুষ্প্রাপ্য। পাতলা চামড়া, হাড় ও খেজুর পাতার উপর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হত। এই অবস্থায় মহানবী (স) যখন প্রেরিত হন তখন তাঁর সামনে সর্বপ্রথম কাজ এই ছিল যে, কুরআন শরীফ এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে এর মধ্যে অন্য কোন জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটতে না পারে। লেখক ছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন, তাই তাঁর আশংকা ছিল যে, যেসব লোক ওহীর শব্দভাণ্ডার ও আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করছে, তারাই যদি আবার তাঁর নিকট থেকে শুনে তাঁর বরাতে অন্য জিনিসও লিখে নেয় তবে কুরআন মিশ্রণ থেকে নিরাপদ থাকবে না। সংমিশ্রণ না ঘটলেও অন্তত সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, একটি বক্তব্য তা কুরআনের আয়াত না মহানবী (স)–এর হাদীস। এ কারণে মহানবী (স) প্রাথমিক যুগে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করতে নিষধ করেছিলেন।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি

কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। মদীনা তায়্যিবায় পৌঁছার সামান্য কাল পরেই নিজের সাহাবীদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন এবং যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া শিক্ষে ফেলল তখন তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। এ প্রসংগে নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. আবদুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট যা কিছু শুনতাম তা লিপিবদ্ধ করে নিতাম। লোকেরা আমাকে লিখতে নিষেধ করল এবং বলল, রসূলুল্লাহ (স) একজন মানুষ, কখনও শান্ত অবস্থায় কথা বলেন, আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। তুমি সবকিছুই লিখে নিচ্ছ? এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মহানবী (স)–এর নিকট জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তাঁর কোন কথাই লিখব না। অতপর আমি মহনবী (স)–এর নিকট জিজ্ঞস করলে তিনি নিজের ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বলেনঃ اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا حَقٌّ ۔
"তুমি লেখ, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ থেকে কেবল সত্য কথাই বের হয়"–(আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকীর আল–মাদখাল)।

২. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবেদন করেন, "আমি আপনার নিকট অনেক কথাই শুনি, কিন্তু মনে রাখতে পারি না।"

মহানবী (স) বলেনঃ اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَأَ بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ -
"তোমার ডান হাতের সাহায্য লও।" অতপর তিনি নিজের ডান হাতের ইশারায় বলেন, লিখে নাও-(তিরমিযী)।

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) একটি ভাষণ দিলেন। পরে (ইয়ামনের অধিবাসী) আবু শাহ আরজ করেনঃ আমাকে ভাষণটি লিখে দিন। মহানবী (স) নির্দেশ দেনঃ اُكْتُبُوْا لِاَبِىْ شَاهٍ আবু শাহ্‌কে লিখে দাও-(বুখারী, মুসনাদে আহ্‌মাদ, তিরমিযী)। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র অপর বর্ণনায় এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মক্কার হেরেম শরীফ ও নরহত্যার ব্যাপারে কতিপয় বিধান বর্ণনা করেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি (আবু শাহ) উঠে দাঁড়িয়ে আবেদন করল, আমাকে ভাষণটি লিখিয়ে দিন। মহানবী (স) নির্দেশ দেনঃ ভাষণটি তাকে লিখে দাও-(বুখারী)।

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক হাদীস আর কারো কাছে ছিল না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কারণ তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, কিন্তু আমি লিখে রাখতাম না-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

৫. বিভিন্ন ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে এবং একবার তিনি মিম্বরের উপর থাকা অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা মহানবী (স) বিশেষভাবে আপনাকে দান করেছেন? তিনি উত্তর দেনঃ না, আমার নিকট শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে এবং এই কয়েকটি বিধান আছে যা আমি মহানবী (স)-এর নিকট শুনে লিখে নিয়েছি। অতপর তিনি লিখিত বিষয় বের করে দেখান। এর মধ্যে যাকাতের বিধান, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান, قانون تعزرات মদীনার হেরেম, এবং অনুরূপ আরো কতিপয় বিষয় সম্পর্কে বিধান লিপিবদ্ধ ছিল-(বুখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ ও নাসাঈ এ বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত বিভিন্ন সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

এছাড়া মহানবী (স) তাঁর প্রশাসকবৃন্দের নিকট বিভিন্ন এলাকায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধান, যাকাত ও মীরাস সম্পর্কিত বিধান বিভিন্ন সময় লিখিতভাবে পাঠাতেন। এসব বিষয় সম্পর্কে আবু দাউদ, নাসাঈ, দারু কুতনী, দারিমী, তাবাকাতে ইবনে সাদ, আবু উবাইদের কিতাবুল আমওয়াল, আবু

ইয়ূসুফের কিতাবুল খারাজ এবং ইবনে হাযমের আল–মুহাল্লা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে।

হাদীসসমূহ মৌখিকভাবে বর্ণনা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, বরং গুরুত্ব আরোপ

এ হলো হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু আমরা যেমন ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, আরবজাতি হাজারো বছর ধরে নিজেদের কাজ লিখিতভাবে করার পরিবর্তে স্মৃতিশক্তি, ধারাবাহিক বর্ণনা ও মৌখিক কথনের মাধ্যমে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক কালেও কয়েক বছর পর্যন্ত তাদের এই অভ্যাস অপরিবর্তিত থাকে। এই অবস্থায় কুরআন মজীদ সংরক্ষণের জন্য তো লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয়েছিল, কারণ তার প্রতিটি শব্দ, আয়াত ও সূরা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। কারণ তাতে সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী এবং তার বিশেষ ধারাবাহিক ওহী হওয়ার দাবী ছিল না এবং এরূপ ধারণাও ছিল না, বরং শুধুমাত্র তাতে উল্লেখিত বিধান, শিক্ষা ও হেদায়াতসমূহ স্মরণ রাখা ও অন্যদের নিকট পৌছে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য যা সাহাবীগণ মহানবী (স)–এর নিকট থেকে লাভ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে বর্ণনা করার শুধু খোলা অনুমতিই ছিল না, বরং অসংখ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স) লোকদেরকে তা মৌখিকভাবে বর্ণনা করার পুনপুন এবং অসংখ্য বার তাকিদ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

১. যায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জুবাইর ইবনে মুতঈম এবং আবুদ–দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনুহুম) মহানবী (স)–এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেনঃ

نضر اللّٰهُ امْرأً سَمِعَ مِنا حديثا فَحفظه حتّٰى يبلّغه فرب حامل نقه الى من هو افقه ورب حامل فقه ليس بفقيه ـ

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন–যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং অন্যদের নিকট পৌছে দিয়েছে। কখনও এমনও হয়ে থাকে যে, কোন ব্যক্তি জ্ঞানের কথা এমন কোন ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দেয়–যে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানবান। আর কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি স্বয়ং ফকীহ না হলেও ফিক্‌হ বহনকারী হয়ে থাকে, অথবা জ্ঞানী না হলেও জ্ঞানের

বাহক হয়ে থাকে"– (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

২. আবু বাক্‌রাহ (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

فليبلّغ الشاهد الغائب عسى ان يبلغ من هو اوعى منه .

"উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। হয়ত সে এমন কোন ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয়, যে তার চেয়ে অধিক স্মরণ রাখতে পারে"–(বুখারী, মুসলিম)।

৩. আবু শুরায়হ্ (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন মহানবী (স) ভাষণ দেন যা আমি নিজ কানে শুনেছি ও উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি এবং সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে বন্দী হয়ে আছে। ভাষণ শেষে মহানবী (স) বলেনঃ

وليبلغ الشاهد الغائب -

"উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌছে দেয়"–(বুখারী)।

৪. বিদায় হজ্জের সময়ও মহানবী (স) ভাষণ শেষে প্রায় উক্তরূপ কথা বলেছেন যা উপরের দুটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে–(বুখারী)।

৫. আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল বাহরাইন থেকে এসে মহানবী (স)–এর সাথে সাক্ষাত করে। তারা বিদায়ের প্রক্কালে আবেদন করেঃ আমরা অনেক দূরের অধিবাসী, আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফেরদের বসতি রয়েছে। আমরা কেবল হারাম মাসসমূহেই আপনার নিকট আসার সুযোগ পাই। অতএব আপনি আমাদের এমন কিছু উপদেশ দান করুন যা আমরা সত্যানুসরণ করে নিজেদের গোত্রের লোকদের পৌছিয়ে দেব এবং জান্নাতের হকদার হতে পারব। মহানবী (স) তাদেরকে দীন ইসলামের কতিপয় বিধান শিখিয়ে দিয়ে বলেনঃ احفظوه واخبروه من وراءكم

"এগুলো স্মরণ রাখ এবং তোমাদের ওখানকার লোকদের পর্যন্ত পৌছে দাও"–(বুখারী, মুসলিম)।

উপরের এসব নির্দেশবাণী এবং তাকিদ থেকে কি একথা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (স) হাদীস বর্ণনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে চাইতেন না? অথবা তিনি এগুলোকে সাময়িক বিধান মনে করতেন এবং চাইতেন না যে, তা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এবং সাধারণ অবস্থার উপর তার প্রয়োগ হতে থাকুক?

জাল হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, মহানবী (স) তাঁর হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাকিদ দিতেন, বরং সাথে সাথে তিনি এসব হাদীসের পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য এবং তার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে দূরে থাকার কঠোর তাকিদ দেন। এই প্রসংগে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

مَنْ كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

"যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল"–(বুখারী, তিরমিযী)।

আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স) বলেনঃ

حدثوا عني ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"আমার হাদীস বর্ণনা কর তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করে সে যেন জাহান্নামকে নিজের আবাস বানিয়ে নিল"–(মুসলিম)।

ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

"আমার পক্ষ থেকে কোন কথা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাক–যতক্ষণ না জানতে পার যে, তা আমি বলেছি। কারণ যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা আমার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সে যেন জাহান্নামকে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল" (তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

হযরত আলী (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

لا تكذبوا على فانه مِن كذب عَلى فليلج النار -

"আমার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বল না। কারণ যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলবে সে দোযখে প্রবেশ করবে"–(বুখারী)।

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেনঃ

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل على

مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار -

"আমি মহানবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে জাহান্নামে নিজের বাসস্থান করে নিল"-(বুখারী)।

বারংবার এই ভীতি প্রর্দশন থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, দীন ইসলামে মহানবী (স)-এর বাণীসমূহের কোনই গুরুত্ব ছিল না? দীন ইসলামে যদি তাঁর বাণীসমূহের কোন আইনগত মর্যাদা না থাকত এবং তার দ্বারা দীনের বিধানসমূহ প্রভাবিত হওয়ার আশংকা না থাকত তবে জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে লোকদের মিথ্যা হাদীস রচনা থেকে বিরত রাখার কি প্রয়োজন ছিল? রাজা-বাদশাহ ও নেতাদের সাথে ইতিহাসে অনেক ভ্রান্ত কথা যুক্ত হয়ে যায়। তার দ্বারা অবশেষে দীনের উপর কি প্রভাব পড়ে। মহানবী (স)-এর সুন্নাতেরও যদি এইরূপ মর্যাদা হয়ে থাকে তবে তাঁর ইতিহাস বিকৃত করার অপরাধে কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি কেন হবে?

মহানবী (স)—এর সুন্নাত আইনের উৎস হওয়ার অকাট্য প্রমাণ

এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় কথা হলঃ কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুস্পষ্ট বক্তব্য বর্তমান থাকলে সে সম্পর্কে অপ্রাসংগিক জিনিসসমূহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বাক্যে তাঁর রসূলকে আল্লাহর কিতাবের ভাষ্যকারের এখতিয়ারও প্রদান করেছেন এবং আইন প্রণয়নের এখতিয়ারও প্রদান করেছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত সূরা নাহ্ল-এর ৪৪ নং আয়াত, সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াত এবং সূরা হাশর-এর ৭ নং আয়াত এ প্রসংগে সম্পূর্ণ পরিষ্কার বক্তব্য প্রদান করেছে। তাছাড়া মহানবী (স)-ও স্পষ্ট বাক্যে নিজের এসব এখতিয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন। আবু রাফে (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

لَا اُلْفِيَنَّ احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امرى

مما امرت به او نهيت فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه

"না, আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এমন লোক পাব যে নিজের আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট আমার নির্দেশাবলীর মধ্যে কোন নির্দেশ পৌঁছানো হবে, যার মাধ্যমে আমি কোন কাজ করার বা না করার নির্দেশ দিয়েছি, আর সে তা শুনে বলবে, আমি জানি না; যা কিছু আল্লাহ্র

কিতাবে পাব কেবল তার অনুসরণ করব”–(মুসনাদে আহ্‌মাদ, শাফিঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকীর দালাইলুন–নুবূওয়াহ)।

মিকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ

الا انى اوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله الا لا يحل لكم الحمار الاهلى ولا كل ذى ناب من السباع .....

“সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, প্রাচুর্যের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান কোন ব্যক্তি নিজের আরাম কেদারায় বসে বলবে যে, তোমরা কেবল কুরআনের অনুসরণ কর, তাতে যা কিছু হালাল পাবে তা হালাল মানবে এবং যা কিছু হারাম পাবে তা হারাম মানবে। অথচ আল্লাহ্‌র রসূল যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা মূলত আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর সমান। সাবধান! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং নখরযুক্ত হিংস্র জন্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়[১] ––”(আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী, হাকেম)।

ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহাবনী (স) ভষণ দেয়ার উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما فى القرآن - الا وانى والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها لمثل القرآن او اكثر وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت

১. এই শেষের বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় লোক গাধা, কুকুর ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী এই যুক্তিতে হালাল প্রমাণের চেষ্টা করে থাকবে যে, কুবআনে এগুলো হারাম হওয়ার কোন বিধানের উল্লেখ নাই। এই কারণে মহানবী (স) উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে থাকবেন।

اهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نساء هم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذى عليهم ـ

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি নিজের আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে একথা মনে করে বসেছে নাকি যে, কুরআনে যা কিছু হারাম করা হয়েছে তা ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন জিনিস হারাম করেননি? সাবধান! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যেসব নির্দেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছি তাও কুরআনেরই অনুরূপ, অথবা তার অধিক। আহ্‌লে কিতাবদের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ, তাদের স্ত্রীলোকদের মারধর করা এবং তারা তাদের উপর আরোপিত কর আদায় করার পরও তাদের গাছের ফল খাওয়া আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন[২] –(আবু দাউদ)।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

فمن رغب عن سنتى فليس منى

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই"–(বুখারী, মুসলিম)।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এরূপ সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর অবশেষে এই যুক্তির কি ওজন অবশিষ্ট থাকতে পারে যে, হাদীসসমূহ যেহেতু লিপিবদ্ধ করানো হয়নি তাই তা সাধারণ প্রয়োগের জন্য ছিল না?

লিপিবদ্ধ জিনিসই কি শুধু নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে?

বিজ্ঞ বিচারপতি বারবার লেখার বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করছেন। মনে হয় যেন তার মতে লিপিবদ্ধ করা ও সংরক্ষণ করা সমার্থবোধক নয়। তার যুক্তির সবচেয়ে বড় ভিত্তি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কুরআন লিপিবদ্ধ করে নেয়ার কারণেই তা নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য, আর হাদীসসমূহ মহানবী (স)–এর যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে লিপিবদ্ধ না করার কারণে অনির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য।

---

২. হাদীসের এই শেষাংশ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, কতিপয় মোনাফিক যিম্মীদের উপর হস্তক্ষেপ করে থাকবে এবং কুরআনের আশ্রয় নিয়ে বলে থাকবে যে, দেখাও তো কুরআনের কোথায় লেখা আছে যে, আহ্‌লে কিতাবদের বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে অনুমতির প্রয়োজন আছে? আর কুরআনের কোথায় তাদের নারীদের নির্যাতন করা এবং তাদের বাগানের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে? এই প্রেক্ষিতে মহানবী (স) উপরোক্ত ভাষণ দিয়ে থাকবেন।

এ প্রসংগে প্রথমত একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করিয়ে নেয়ার কারণ এই ছিল যে, তার শব্দভাণ্ডার এবং অর্থ উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল। তার শব্দসমষ্টির ক্রমবিন্যাসই নয়, এর আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস এবং সূরাগুলোর ক্রমবিন্যাসও ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তার কোন শব্দ অন্য কোন শব্দের দ্বারা পরিবর্তন করাও জায়েয ছিল না। আর তা এজন্য নাযিল হয়েছিল যে, লোকেরা নাযিলকৃত শব্দযোগে তার ক্রমবিন্যাস রক্ষা করে তা তিলাওয়াত করবে।

পক্ষান্তরে সুন্নাতের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তা শুধু আক্ষরিক ছিল না, বরং ব্যবহারিকও ছিল। এর শব্দসমষ্টি কুরআনের শব্দসমষ্টির ন্যায় ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়নি, বরং মহানবী (স) তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। তাছাড়া এর এক বিরাট অংশ এমন ছিল যা মহানবী (স)-এর সমসাময়িক কালের লোকেরা নিজেদের ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। যেমন, মহানবী (স)-এর চরিত্র-নৈতিকতা এরূপ ছিল, তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি এরূপ ছিল এবং অমুক স্থানে তিনি অমুক কাজ করেছেন ইত্যাদি। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী ও বক্তৃতামালা নকল করার ক্ষেত্রেও এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না যে, শ্রোতাগণকে তা অক্ষরে অক্ষরে নকল করতে হবে। বরং একই ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য তাঁর কোন কথা শুনে তার অর্থের পরিবর্তন না করে নিজেদের ভাষায় তা ব্যক্ত করার অনুমতি ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা সক্ষমও ছিল। মহানবী (স)-এর বাণীর তিলাওয়াত উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাঁর দেয়া শিক্ষার অনুসরণই ছিল উদ্দেশ্য। কুরআনের আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাসের মত কোন্ হাদীস আগে এবং কোন্ হাদীস পরে হবে এরূপ সংরক্ষণও অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। এ কারণে হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, লোকেরা তা স্মরণ রাখবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব ততটা ছিল না-যতটা কুরআনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় কথা যা খুব ভাল করে বুঝে নেয়া প্রয়োজন তা এই যে, কোন জিনিসের দলীল-প্রমাণ হওয়ার জন্য তার লিপিবদ্ধ হওয়াটা একান্তই জরুরী নয়। বিশ্বস্ততার মূল ভিত্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের "নির্ভরযোগ্য হওয়া" যার বা যাদের মাধ্যমে কোন কথা অন্যের নিকট পৌঁছে থাকে-চাই তা লিপিবদ্ধ হোক অথবা অলিখিত আকারে। স্বয়ং কুরআন মজীদ আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে লিখিত আকারে পাঠাননি, বরং মহানবী (স)-এর জবানীতে তা বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সমপূর্ণরূপে একথার উপর নির্ভর

করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নবীকে সত্য বলে মেনে নিবে সে তাঁর নবীর বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে কুরআনকেও আমার বাণী হিসাবে মেনে নিবে। মহানবী (স)–ও কুরআনের যাবতীয় প্রচার ও প্রসার মৌখিকভাবেই করেছেন। তাঁর যেসব সাহাবী বিভিন্ন জনপদে গিয়ে দীনের প্রচার করতেন তাঁরাও কুরআনের সূরাসমূহ লিখে নিয়ে যেতেন না। লিপিবদ্ধ আয়াত ও সূরাসমূহ তো সেই খণ্ডের ভেতর পড়ে থাকত যার মধ্যে তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করে ঢেলে দিতেন। অবশিষ্ট তাবলীগ ও প্রচারের কাজ মৌখিকভাবে করা হত এবং ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি ঐ এক সাহাবীর বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে একথা মেনে নিত যে, সে যা কিছু শুনছে তা আল্লাহ্‌র কালাম, অথবা সাহাবী রসূলুল্লাহ (স)–এর যে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন তা তাঁরই নির্দেশ।

এ প্রসংগে তৃতীয় গুরুত্বপূণ বিষয় হচ্ছে–লিপিবদ্ধ জিনিস স্বয়ং নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না জীবিত ও বিশ্বস্ত লোকেরা তার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। শুধু লিপিবদ্ধ কোন জিনিস যদি আমাদের হস্তগত হয় এবং আমরা মূল লেখকের হাতের লেখার সাথে পরিচিত না হয়ে থাকি অথবা লিপিবদ্ধকারী নিজে না বলে যে, তা তারই হাতের লেখা, অথবা এমন কোন সাক্ষী না পাওয়া যায়, যে এটাকে ঐ ব্যক্তির হাতের লেখা বলে সাক্ষ্য দেবে, তবে ঐ লিপিবদ্ধ জিনিস আমাদের জন্য নিশ্চিত প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা, অনুমানসর্বস্ব প্রমাণও হতে পারে না। এটা এমন এক নীতিগত সত্য যার প্রতি বর্তমান কালের সাক্ষ্য আইনেরও সমর্থন রয়েছে এবং বিজ্ঞ বিচারপতি নিজেও আদালতে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন মজীদ সংরক্ষিত হওয়ার বিষয়ে আমাদের যে নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে তার ভিত্তি কি এই যে, তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল? ওহী লেখকদের স্বহস্তে লিখিত কুরআন যার অংশ মহানবী (স) তাদের বলে দিতেন, আজ দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান নাই। তা যদি বিদ্যমান থাকতও তবে আজ কে তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিত যে, এটা কুরআনের সেই পাণ্ডুলিপি যা মহানবী (স) স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়েছেন এবং স্বয়ং একথাও যে, মহানবী (স) ওহী নাযিল হওয়ার পরপরই এই কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন? একথা আমরা কেবল মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই জানতে পারি, অন্যথায় এ সম্পর্কে জানার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম ছিল না।

অতএব কুরআনের সুসংরক্ষিত হওয়ার উপর আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের আসল কারণ তার লিপিবদ্ধ হওয়া নয়, বরং এর আসল কারণ হচ্ছে–জীবিত লোকেরা অব্যাহতভাবে জীবিত লোকদের নিকট তা শুনে আসছে এবং এরা

তাদের পরবর্তীদের নিকট তা হুবহু পৌঁছে দিয়ে আসছে। অতএব কোন জিনিসের সংরক্ষিত হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁর লিপিবদ্ধ আকারে অবশিষ্ট থাকা, এই ভ্রান্ত ধারণা মনমগজ থেকে বের করে দিতে হবে।

এসব বিষয়ের উপর যদি সম্মানিত বিচারক ও তার মত চিন্তাভাবনাকারী লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে তাদের একথা স্বীকার করতে ইনশাআল্লাহ কোন কষ্টই অনুভূত হবে না যে, কোন জিনিস যদি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমসমূহের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে তা দলীল-প্রমাণ হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে, তা লিপিবদ্ধ আকারে না রাখা হলেও।

হাদীসসমূহ কি আড়াইশো বছর ধরে অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠে পড়ে রয়েছিল?

পুনরায় চার নম্বর দফার শেষদিকে সম্মানিত বিচারপতির বক্তব্য যে, "হাদীসসমূহ না মুখস্ত করা হয়েছিল আর না সংরক্ষণ করা হয়েছিল, বরং তা এমন সব লোকের মনমস্তিষ্কে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল যারা ঘটনাক্রমে কখনও অন্যদের নিকট তা বর্ণনা করে মারা যায়। এমনকি তাদের মৃত্যুর কয়েক শত বছর পর তা সংগ্রহ ও সংকলনাবদ্ধ করা হয়"-এটা শুধু বাস্তব ঘটনারই পরিপন্থী নয়, বরং এটা মূলত মহানবী (স)-এর ব্যক্তিত্বের এবং তাঁর প্রতি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিশ্বাসের চরম অবমূল্যায়ন। বাস্তব ঘটনা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েও কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি প্রয়োগ করেও যদি সঠিক অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করে তবে সে কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, যে সুমহান বক্তিত্ব আরব জাতির লোকদেরকে চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের চরম পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে নিয়ে উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর বক্তব্য ও কাজকর্মকে সেই লোকেরা এতটা দৃষ্টি দানের অনুপযুক্ত মনে করবে যে, তারা তাঁর কোন কথা স্মরণ রাখার চেষ্টা করেনি, অন্যদের কাছে ঘটনাক্রমে বর্ণনা করা ছাড়া আরেকটু অগ্রসর হয়ে তার চর্চা করেনি এবং পরবর্তী কালের লোকেরাও তাঁর সাক্ষাত লাভকারী লোকদের নিকট তাঁর বিষয়ে জানার জন্য সামান্য চেষ্টাও করেনি। কোন একজন সাধারণ নেতার সাথেও যদি কেউ ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভে সক্ষম হয় তবে সে তার সাথে নিজের সাক্ষাত লাভের প্রতিটি ঘটনা স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট তা বর্ণনা করে। এই নেতার মৃত্যুর পর তার সাহচর্য লাভকারীদের নিকট গিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধররা তার অবদান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করে। বিচারপতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-কে কোন্ পর্যায়ের লোক মনে করে নিয়েছেন যে,

তাঁর সমসাময়িক কালের এবং এর পরের যুগের লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার যোগ্যও তাঁকে মনে করেননি?

এখন প্রকৃত অবস্থা কিছুটা খতিয়ে দেখা যাক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের জন্য এমন এক মহান নেতা ছিলেন যাঁর নিকট তাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে আকীদা-বিশ্বাস, ঈমান-আমল, ইবাদত-বন্দেগী, নীতি-নৈতিকতা, তাহযীব-তমদ্দুন, আচার-ব্যাবহার এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর জীবনের এক একটি দিকের অনুসরণ করে তাঁরা নিষ্কলুষ লোকদের মত জীবন যাপনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন যে, তাঁর নবী হয়ে আগমনের পূর্বে তাঁরা কি ছিলেন এবং তিনি তাদের কোন্ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাদের সামনে আগত প্রতিটি বিষয়ে ফতোয়া দানকারী ছিলেন তিনিই এবং বিচারপতিও ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই তাঁরা যুদ্ধও করতেন এবং সন্ধিও করতেন। তাদের অভিজ্ঞতা ছিল যে, তাঁর নেতৃত্বের অনুসরণ করে তাঁরা কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন। এ কারণে তাঁরা তাঁর প্রতিটি কথা স্মরণ রাখতেন। যাঁরা তাঁর নিকটে থাকতেন তাঁরা অপরিহার্যরূপে তাঁর সাহচর্যে বসে থাকতেন। যাঁদেরকে কখনও তাঁর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকতে হত তাঁরা অন্যদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন যে, আজ তিনি কি কি কাজ করেছেন এবং কি কথা বলেছেন?

দূরদূরান্ত থেকে আগত লোকেরা মহানবী (স)-এর সাহচর্যে যতটুকু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পেতেন তাকে তারা নিজেদের গোটা জীবনের মূলধন মনে করতেন এবং জীবনভর তা স্মরণ করতেন। তাঁর সাহচর্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ যাদের হত না তারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চারপাশে সমবেত হত যিনি তাঁর সাহচর্য লাভ করে আসতেন এবং তন্নতন্ন করে প্রতিটি কথা তার কাছ থেকে জেনে নিতেন। যারা তাঁকে কখনও দূর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন অথবা কোন বৃহৎ জনসমাবেশে শুধু তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন সেই স্মৃতি জীবন ভর ভুলতেন না এবং গৌরবের সাথে নিজের এই সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করতেন যে, আমাদের এই চোখ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ করেছে এবং আমাদের কান তাঁর ভাষণ শুনেছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর পরবর্তী যুগে যারা জন্মগ্রহণ করেন তাদের জন্য দুনিয়াতে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে থাকত তবে তা ছিল মহানবী (স)-এর 'সীরাত' যাঁর নেতৃত্বের মুজিযাসুলভ কৃতিত্ব আরবের উটচালকদের জাগরিত করে সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত ভূখন্ডের শাসকের মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। তারা এমন এক একজনের

নিকট পৌঁছে যেত যিনি মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, অথবা কখনও তাঁকে দেখেছিলেন, অথবা তাঁর কোন ভাষণ শুনেছিলেন। সাহাবীগণের একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তাদের সাহচর্য লাভের আকাংখাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি তাবিঈগণ সাহাবাদের নিকট থেকে সীরাতে পাক সম্পর্কে যে জ্ঞানেরই সন্ধান পেতেন তা-ই নিংড়ে নিতেন।

সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনা

বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষ্য দেয় যে, অবশ্যই এরূপ হয়ে থাকবে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাস্তবিকই এরূপ হয়েছিল। আজ পৃথিবীতে হাদীসের যে জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমান রয়েছে তা প্রায় দশ হাজার সাহাবীর সূত্রে লাভ করা গেছে। তাবিঈগণ কেবলমাত্র তাঁদের বর্ণিত হাদীসই গ্রহণ করেননি, বরং এসব সাহাবীর জীবনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা এও বর্ণনা করেছেন যে, কোন্ সাহাবী কত কাল মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, অথবা কোথায় এবং কখন তাঁকে দেখেছেন এবং কোন্ কোন্ স্থানে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। বিজ্ঞ বিচারক তো বলেছিলেন যে, হাদীসসমূহ প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মনমগজে সমাহিত অবস্থায় পড়েছিল এবং দুইশো আড়াইশো বছর পরে ইমাম বুখারী (রহ) ও তাঁর সমসাময়িক মনীষীগণ এসব হাদীস খননকার্য চালিয়ে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ইতিহাস আমাদের সামনে যে চিত্র তুলে ধরে তা তার বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

আবু হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৭ হি.), বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪ (এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা ৮০০-এর অধিক। তাঁর অধিকাংশ ছাত্র তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন)।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (মৃ. ৪৬ হি.), হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৪ হি.), হাদীস ১,৫৪০।

আনাস ইব্‌নে মালেক (মৃ. ৯৩ হি.), হাদীস ১,২৮৬।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (মৃ. ৫৯ হি.), হাদীস ২,২১০।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (মৃ. ৬৭ হি.), হাদীস ১,৬৬০।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (মৃ. ৭০ হিঃ), হাদীস ১৬৩০।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (মৃ. ৬৩ হি.), হাদীস ৭০০।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (মৃ. ৩২ হি.), হাদীস ৮৪৮।

উপরোক্ত তথ্য কি একথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)–এর সার্বিক অবস্থার বর্ণনাসমূহ নিজেদের বক্ষ পিঞ্জরে সমাহিত করে তা এভাবে পৃথিবী থেকে পরজগতে নিয়ে চলে গেছেন?

সাহাবীদের যুগ থেকে ইমাম বুখারীর যুগ পর্যন্ত ইলমে হাদীসের ধারাবাহিক ইতিহাস

এরপর সেইসব তাবিঈগণের দিকে লক্ষ্য করুন যাঁরা সাহাবায়ে কিরামগণের নিকট মহানবী (স)–এর জীবনাচার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং পরবর্তী বংশধরগণ পর্যন্ত তা পৌছিয়েছেন। কেবল ইবনে সাদের তাবাকাত গ্রন্থে কয়েকটি কেন্দ্রীয় শহরের তাবিঈনের যে জীবনী দেয়া হয়েছে, তা থেকে তাদের সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। যেমন–মদীনায় ৪৮৪ জন, মক্কায় ১৩১ জন, কূফায় ৪১৩ জন, বসরায় ১৬৪ জন।

তাদের মধ্যে যেসব প্রবীণ সাহাবী হাদীসের জ্ঞান অর্জনে, তা সংরক্ষণ করতে এবং পরবর্তীদের নিকট তা পৌছে দিতে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (জন্ম ৪১ হি., মৃত্যু ৯৩ হি.), হাসান বসরী (২১–১১০), ইবনে সীরীন (৩৩–১১০), উরওয়া ইবনুয যুবাইর (২২–৯৪), ইনি সর্বপ্রথম মহানবী (স)–এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন, আলী ইবনুল হুসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন –৩৮–৯৪), মুজাহিদ (২১–১০৪), কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্র (৩৭–১০৬), শুরায়হ্ যিনি হযরত উমার (রা)–র খিলাফতকালে বিচারপতি ছিলেন (মৃ. ৭৮ হি.), মাসরূক যিনি হযরত আবু বাক্র (রা)–র যুগে মদীনায় আসেন (মৃ. ৬৩ হি.), আসওয়াদ ইবনে হায়ওয়াত (মৃ. ৭৫ হি.), মাকহূল (মৃ. ৬৩ হি.), রাজাআ ইবনে হায়ওয়াত (মৃ. ১০৩ হি.) হাম্মাম ইব্‌নে মুনাব্বিহ (৪০–১৩১), তিনি হাদীসের একটি সংকলন প্রণয়ন করেছিলেন যা সাহীফায়ে ইবনে হাম্মাম নামে বর্তমান কালেও বিদ্যমান আছে এবং প্রকাশিত হয়েছে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (মৃ. ১০৬ হি.), নাফে মাওলা ইবনে উমার (মৃ. ১১৭ হি.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (৪৫–৯৫), সুলাইমান আল–আমাশ (৬১–১৪৮), আইউব আস–সুখতিয়ানী (৬৬–১৩১), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (৫৪–১৩০), ইবনে শিহাব আয–যুহ্রী (৫৮–১২৪), তিনি লিখিত আকারে হাদীসের বিরাট পাণ্ডুলিপি রেখে যান, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (৩৪–১০৭), ইকরামা–ইবনে আব্বাস (রা)–র মুক্তদাস (২২–১০৫), আতা ইবনে আবী রাবাহ (২৭–১১৫), কাতাদা ইবনে

দিআমা (৬১–১১৭), আমের আশ–শাবী (১৭–১০৪), আলকামা (মৃ. ৬২ হি.), তিনি রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে যুবক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাত লাভ করতে পারেননি। ইবরাহীম নাখঈ (৪৬–৯৬), ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (৫৩–১২৮)।

এসকল মহামনীষীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই জানা যায় যে, তাঁরা সাহাবাগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সাহাবীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহিলা সাহাবীগণের কোলে লালিত–পালিত হন। আর তাদের কতেক তো কোন না কোন সাহবীর সাহচর্যে গোটা জীবন কাটিয়ে দেন। তাদের জীবনেতিহাস পাঠে জান যায় যে, তাদের প্রত্যেকে অসংখ্য সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভ করে মহানবী (স)–এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর বাণীসমূহ ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে যুগপৎভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেন। এ কারণে তাদের মাধ্যমে হাদীসসমূহ তাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে যায়। যদি না কোন ব্যক্তি মনে করে বসে যে, ১ম হিজরী শতকের সকল মুসলমান মোনাফিক ছিল, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, এসব মহান ব্যক্তি নিজেদের বাড়িতে বসে মনগড়াভাবে হাদীস রচনা করে থাকবেন এবং এর পরও গোটা উম্মাত তাদেরকে নিজেদের শিরোমনি বানিয়ে নিয়ে থাকবে এবং তাদেরকে নিজেদের প্রবীণ আলেমগণের মধ্যে গণ্য করে থাকবেন।

এরপর আমাদের সামনে আসে বয়সে যুবক তাবিঈ ও তাব্‌উ তাবিঈনের ইতিহাস, যাঁরা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার এবং গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ব্যাপকভাবে তাবিঈগণের নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা লাভ করে এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত সফর করে এক এক এলাকার সাহাবা ও তাবিঈদের জ্ঞানভাণ্ডার একত্রিত করেন। তাদের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত্যু ১৪৮ হিজরী), তিনি ইমাম জাফর সাদেক নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম আজম আবু হানীফা আন–নোমান (৮০–১৫০), শোবা ইবনুল হাজ্জাজ (৮৩–১৬০), লাইস ইবনে সাদ (৯৩–১৬৫), রবীআ আর–রাই (মৃ. ১৩৬ হি.), তিনি ইমাম মালেক (রহ)–এর উসতাদ ছিলেন। সাঈদ ইবনে আরূবা (মৃ. ১৫৬), মিসআর ইবনে কিদাম (মৃ. ১৫২), আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (মৃ. ১২৬), সুফিয়ান আস–সাওরী (৯৭–১৬১), হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (৯৭–১৭৯)।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের হাদীস সংকলনসমূহ

এ যুগেই হাদীসের সংকলন সম্পাদনের কাজ যথারীতি শুরু হয়। এ যুগে যেসব মহান মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

রবী ইবনে সাবীহ্ (মৃ. ১৬০ হি.), তিনি প্রতিটি ফিকহী বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। সাঈদ ইবনে আরূবা (মৃ. ১৫৬ হি.), তিনিও প্রতিটি ফিকহী বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেন। মূসা ইবনে উকবা (মৃ. ১৪১ হি.), তিনি মহানবী (স)-এর যুদ্ধসমূহের ইতিহাস সংকলন করেন। ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯), তিনি ইসলামী শরীআতের বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীস ও আছারসমূহ সংগ্রহ করেন। ইবনে জুরাইজ (৮০-১৫০), ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৮৯), সুফিয়ান সাওরী (৯৭-১৬১), হাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে দীনার (৯৭-১৭৬), ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২), ইমাম মুহাম্মাদ (১৩১-১৮৯), এঁরা সকলেই ইম্াম মালেক (রহ)-এর অনুরূপ কাজ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৮১ হি.), তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সাদ (১৬৮-২২০), তিনি মহানবী (স)-এর সীরাত এবং সাহাবা ও তাবিঈদের জীবনী সংক্রান্ত বর্ণনা একত্র করেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আব্সী (মৃ. ২১৩ হি.), মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ আল-বসরী (মৃ. ২১৮ হি.), আসাদ ইবনে মূসা (মৃঃ ২১২), নুআইম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযাঈ (মৃ. ২২৮), ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১), ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ (১৬১-২৩৮), উসমান ইবনে আবু শাইবা (১৫৬-২৩৯), এঁরা সকলে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেন। আবু বাক্র ইবনে আবু শাইবা (১৫৯-২৩৫), তিনি ফিক্হ্-এর অনুচ্ছেদসমূহের ক্রমানুসারে এবং সাহাবীদের প্রত্যেকের রিওয়ায়াতসমূহ উভয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে হাদীস সংকলন করেন।

তাদের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইবনে সাদ, ইমান আহ্মাদ ইবনে হাম্বল এবং আবু বাক্র ইবনে আবু শাইবার গ্রন্থাবলী বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া মূসা ইবনে উকবার আল-মাগাযী গ্রন্থের একটি অংশও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া যাঁদের গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না তাও মূলত বিলীন হয়ে যায়নি, বরং সেগুলোর সার্বিক বিষয়বস্তু ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং তাদের সমসাময়িকগণ ও পরবর্তীগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। এজন্য লোকেরা এসব দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির এখন আর মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম বুখারী (রহ)–এর যুগ পর্যন্ত ইলমে হাদীসের ধারাবাহিক ইতিহাস অধ্যয়নের পর কোন ব্যক্তি বিজ্ঞ বিচারকের নিম্নোক্ত কথার কোনো মূল্য দিতে পারে কিঃ "হাদীসসমূহ মুখস্থও করা হয়নি, সংরক্ষণও করা হয়নি, বরং সেইসব লোকের মনমগজে তা লুক্কায়িত ছিল যারা ঘটনাক্রমে তা অন্যদের সামনে উল্লেখ করার পর মরে গেছে, অতপর তাদের মৃত্যুর কয়েক শত বছর পর তা সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছিল"? এবং তার এ কথা–"পরে প্রথম বারের মত রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রায় একশত বছর পর হাদীসসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছিল, কিন্তু তার দস্তাবেজ সংরক্ষিত নেই"? এ স্থানে আমরা এই নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, হাইকোর্টের মত একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিচারালয়ের বিচারকগণের ইসলাম তথা কুরআন–সুন্নাহ ভিত্তিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে মত প্রকাশের জন্য এর চেয়েও অধিক সতর্ক ও সুগভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

হাদীসসমূহের মধ্যে মতপার্থক্যের তাৎপর্য

সামনে অগ্রসর হয়ে সম্মানিত বিচারপতি তার ষষ্ঠ দফায় হাদীসসমূহের "চরম সংশয়পূর্ণ" ও "অনির্ভরযোগ্য" হওয়ার একটি কারণ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "এমন হাদীস খুব কমই আছে যে সম্পর্কে হাদীস সংগ্রহকারীগণ একমত হতে পেরেছেন।"

এটা এমন একটি দাবী যা কয়েকটি বিরোধপূর্ণ হাদীসের উপর ভাসাভাসা দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে করা যেতে পারে বটে, কিন্তু বিস্তারিতভাবে হাদীসের গ্রন্থাবলীর তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, সেই হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যই বেশী এবং মতভেদ সামান্যই আছে। অতপর যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ পাওয়া যায় তার মূল্যায়ন করা হলে অধিকতর মতভেদ নিম্নোক্ত চার ধরনের যে কোন এক ধরনের আওতায় পড়বেঃ

(এক) বিভিন্ন রাবী একই কথা বা একই ঘটনা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর অর্থের মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই, অথবা বিভিন্ন রাবী একই ঘটনা অথবা ভাষণের এক একটি অংশ বর্ণনা করেছেন।

(দুই) স্বয়ং মহানবী (স) একই বিষয় বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

(তিন) মহানবী (স) বিভিন্ন অবস্থায়, পরিবেশে বা স্থানে বিভিন্ন পন্থায় আমল (কাজ) করেছেন।

(চার) একটি হাদীস পূর্বের ও অপর হাদীস পরের এবং শেষোক্ত হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসকে রহিত (মানসূখ) করে দিয়েছে।

এই চার শ্রেণীর সন্দেহযুক্ত হাদীস বাদ দিলে যেসব হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য দূর করা আলেমগণের গবেষণায় [illegible] হাদীস [illegible] এরূপ হাদীসের সংখ্যা শতকরা একটিরও অনেক কম। কয়েকটি মাত্র হাদীসের মধ্যে এরূপ ত্রুটি বিদ্যমান থাকার কারণে গোটা হাদীস ভাণ্ডারকে সংশয়পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার মত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট কি? রিওয়ায়াত (বা হাদীস) শ্রেণীবিভাগের অযোগ্য কোন অখণ্ড একক–এর নাম নয় যার কোন অংশ অকেজ বা বর্জিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণটাই বর্জিত হতে পারে। প্রতিটি রিওয়ায়াত (হাদীস) নিজস্বভাবে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং নিজের স্বতন্ত্র সনদ সহকারে বর্ণিত হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতে একটি–দুইটি নয়, দুই–চারশত রিওয়ায়াত বর্জিত হলেও অবশিষ্ট রিওয়ায়াতসমূহের বর্জিত হওয়া অপরিহার্য হতে পারে না। ইল্‌মী (বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য) সমালোচনার মানদণ্ডে যে রিওয়ায়াতই পূর্ণরূপে উতরে যাবে তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

. .

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্যের আরেকটি দিক এই যে, কোন রিওয়ায়াতের সনদকে একজন মুহাদ্দিস নিজস্ব সমালোচনার নিরিখে সঠিক মনে করেন এবং অপরজন তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। এটা রায় ও তথ্যানুসন্ধানের পার্থক্য, যার ফলে অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিচারালয়সমূহে কি কোন সাক্ষ্য গ্রহণ ও কোন সাক্ষ্য বর্জন করার ব্যাপারে কখনও মতপার্থক্য হয়া না?

স্মৃতিশক্তি থেকে নকলকৃত রিওয়ায়াত কি অনির্ভরযোগ্য?

এখন আমরা বিজ্ঞ বিচারপতির সর্বশেষ দফা দুটির উপর আলোকপাত করব। তিনি বলেন, "বর্তমান কালের আরবদের স্মৃতিশক্তি যতটা শক্তিশালী প্রথম হিজরী শতকের আরবদের স্মরণশক্তি ততটাই শক্তিশালী হয়ে থাকবে। তথাপি এটাকে যতই শক্তিশালী বলে স্বীকার করে নেয়া হোক, শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি থেকে নকলকৃত বক্তব্যকে কি নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে? তিনি আরও বলেন, "একজনের স্মৃতিশক্তি থেকে অপরের স্মৃতিশক্তিতে কোন বক্তব্য স্থানান্তরিত হতে হতে তার মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং প্রত্যেকটি স্মৃতিশক্তির নিজস্ব ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগী তাকে দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে।"

এই দুটি অতিরিক্ত কারণের ভিত্ততে তিনি হাদীসসমূহকে নির্ভরযোগ্য ও দলীল–প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

তার প্রথমোক্ত কথা সম্পর্কে বলা যায় যে, তা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ তার যে শক্তির সাহায্যে অধিক কাজ করে তা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং যে শক্তির সাহায্য কম পরিমাণে গ্রহণ করে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। একথা যেমন সমস্ত মানবীয় শক্তির ব্যাপারে সত্য তেমন স্মৃতিশক্তির বেলায়ও সত্য। আরব জাতি মহানবী (স)–এর পূর্বে হাজারো বছর ধরে নিজেদের কাজ লেখনির পরিবর্তে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে চালাতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ দীনারের আদান–প্রদান করত এবং কোন লেখাপড়া জানত না। কড়ায়–গন্ডায় হিসাব এবং অগণিত ক্রেতার হিসাব তারা মুখে মুখে রাখত। তাদের গোত্রীয় জীবনে বংশীয় ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব কিছুও স্মৃতিশক্তিতে সংরক্ষিত থাকত এবং মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে এক বংশধর থেকে পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছনো হত। তাদের সমস্ত সাহিত্য সম্পদ কাগজে নয়, বরং অন্তরের পর্দায় মুদ্রিত থাকত। তাদের এই অভ্যাস লেখার প্রচলন হওয়ার পরও প্রায় একশত বছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে যায়। কারণ জাতীয় অভ্যাসসমূহ ধীরে ধীর পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তারা কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্মৃতিশক্তির উপরই অধিক নির্ভর করত। এটা ছিল তাদের গৌরবের বিষয়। কোন ব্যক্তির নিকট কোন কথা জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি তা স্মৃতিশক্তি থেকে না বলে বাড়িতে গিয়ে লিখিত পুস্তক এনে তার জবাব দিত তবে সে তাদের দৃষ্টি থেকে পরিত্যক্ত হয়ে যেত। দীর্ঘকাল যাবত তারা লিপিবদ্ধ করে রাখা সত্ত্বেও মুখস্ত করে রাখত এবং লিখিত বিবরণ পড়ে শুনানোর পরিবর্তে মুখস্ত শুনিয়ে দেয়া কেবল সম্মানের বিষয়ই মনে করত না, বরং তাদের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির বিদ্যাবত্তার উপর নির্ভরতা এ পন্থায়ই কায়েম হত।

আজকের আরবদের মধ্যে স্মৃতিশক্তির এই অবস্থা অটুট থাকার কোন কারণ নেই। শত শত বছর ধরে লেখনিশক্তির উপর নির্ভর করা এবং স্মৃতিশক্তিকে কম কাজে লাগোনোর কারণে এখন তাদের স্মৃতিশক্তি প্রাচীন আরবদের মতই প্রখর থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। কিন্তু আরব ও অনারব সকলের মধ্যে আজও পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যে, অশিক্ষিত লোক ও অন্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি শিক্ষিত ও চক্ষুষ্মান লোকদের তুলনায় অধিক প্রখর। মূর্খ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক পাওয়া যায়, যারা নিজেদের ক্রেতাদের সাথে সম্পাদিত হাজার হাজার টাকার লেনদেন পূর্ণাংগরূপে ও বিস্তারিতভাবে মনে রাখতে পারে। এমন অসংখ্য অন্ধ মানুষ আছে যাদের স্মৃতিশক্তি মানুষকে হতবাক করে দেয়। একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, লেখনির উপর নির্ভর

করার পর কোন জাতির স্মৃতিশক্তির সেই অবস্থা অবশিষ্ট থাকতে পারে না যা মূর্খতার যুগে তাদের মধ্যে ছিল।

হাদীসসমূহের সুরক্ষিত থাকার আসল কারণ

এটা হল উল্লেখিত বিষয়ের একটি দিক। দ্বিতীয় দিকটি এই যে, সাহাবায়ে কিরামদের জন্য বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীসসমূহ স্মরণ রাখা এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করার পেছনে আরও কতিপয় জিনিসও ক্রিয়াশীল ছিল যা কিছুতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।

প্রথমতঃ তাঁরা সর্বান্তকরণে মহানবী (স)–কে আল্লাহর রসূল এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতেন। তাদের অন্তরের মধ্যে তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাদের নিকট মহানবী (স)–এর বক্তব্য এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও অবস্থার মর্যাদা সাধারণ মানবীয় ঘটনাবলীর মত ছিল না যে, তা নিজেদের স্মরণশক্তির হাওয়ালা করে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। তাঁরা মহানবী (স)–এর সাহচর্যে যে সময় অতিবাহিত করেন তার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এবং তাকে নিজেদের স্মৃতিতে ধরে রাখাকে তাঁরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন মনে করতেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রতিটি ভাষণ, প্রতিটি বক্তব্য এবং তার জীবনের প্রতিটি কার্যক্রম থেকে এমন শিক্ষা লাভ করতেন যা তাঁরা ইতিপূর্বে কখনও লাভ করতে সক্ষম হননি। তাঁরা নিজেরাও জানতেন যে, তাঁরা ইতিপূর্বে চরম অজ্ঞ, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিলো এবং এই পবিত্রতম মানুষটি তাদেরকে এখন সঠিক জ্ঞান দান করছেন এবং সুসভ্য মানুষের মত জীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁর প্রতিটি কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন। কারণ তাদেরকে নিজেদের বাস্তব জীবন তদনুযায়ী গঠন করতে হত, তারই হুবহু অনুস্মরণ করতে হত এবং তারই নির্দেশনায় কাজ করতে হত। প্রাকাশ থাকে যে, এই চেতনা ও অনুভূতি সহকারে মানুষ যা কিছু দেখে ও শুনে থাকে তা স্মরণ রাখার ব্যাপারে তাঁরা এতটা সহজ হতে পারে না যতটা তাঁরা কোন মেলায় অথবা কোন বাজারে শ্রুত ও দৃষ্ট কথা স্মরণ রাখার ব্যাপারটি সাধারণ মনে করতে পারে।

তৃতীয়তঃ তাঁরা কুরআনের আলোকেও জানতেন এবং মহানবী (স) বারবার তাকিদ দেয়ার কারণেও তাদের প্রবল অনুভূতি ছিল যে, আল্লাহর নবীর উপর মিথ্যা আরোপ অতীব মারাত্মক অপরাধ, যার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া। এ কারণে তাঁরা মহানবী (স)–এর সাথে কোন কথা সংযুক্ত করে বর্ণনা করার

ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যায় না যে, কোন একজন সাহাবীও নিজের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে অথবা নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মহানবী (স)–এর নাম অবৈধভাবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে যখন মতবিরোধের সূচনা হয় এবং দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে যায় সে সময়ও উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তিও মনগড়াভাবে কোন হাদীস রচনা করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেননি। পরবর্তী কালের অসৎ ও আল্লাহর প্রতি ভয়হীন লোকেরা অবশ্যই এ ধরনের জাল হাদীস রচনা করেছে, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের ঘটনাবলীর মধ্যে এর একটি দৃষ্টান্তও খুজে পাওয়া যাবে না।

চতুর্থতঃ পরবর্তী বংশধরদের নিকট মহানবী (স)–এর জীবনাচার এবং তাঁর হেদায়াত ও শিক্ষা সম্পূর্ণ যথার্থ আকারে পৌছে দেয়া এবং তার মধ্যে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা মিশ্রণ না ঘটানোকে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন। কারণ তাদের নিকট এটাই ছিল (আল্লাহর) দীন এবং তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন সাধন করাটা কোন সামান্য অপরাধ নয়, বরং তা ছিল এক মারাত্মক প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সাহাবাদের জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁরা হাদীস বর্ণনা করার সময় থরথর করে কেঁপে যেতেন। তাঁদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। যেখানে সামান্যতম সন্দেহ হত যে, হয়ত রসূলুল্লাহ (স)–এর ব্যবহৃত শব্দ অন্য কিছু সেখানে বক্তব্য নকল করার সাথে সাথে "আও কামা কালা" (অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন) বাক্যাংশ বলে দিতেন, যাতে শ্রোতামন্ডলী তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলীকে হুবহু মহানবী (স)–এর ব্যবহৃত শব্দ মনে না করে বসে।

পঞ্চমতঃ প্রবীণ সাহাবীগণ বিশেষভাবে সাধারণ সাহাবীদের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিতে থাকতেন। এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শনকেও তাঁরা কঠোরভাবে প্রতিহত করতেন এবং কখনও কখনও তাদের নিকট মহানবী (স)–এর কোন হাদীস শুনলে তার সপক্ষে সাক্ষ্য তলব করতেন, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অন্যরাও সংশিষ্ট হাদীস শুনেছে। এই নিশ্চয়তা লাভের জন্য সাহাবীগণ একে অপরের স্মরণশক্তির পরীক্ষাও নিতেন। যেমন, একবার হজ্জের মৌসুমে হযরত আয়েশা (রা)–র নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস পৌছে। পরের বছর হজ্জের সময় উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা) পুনরায় একই হাদীস সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর নিকট লোক পাঠান। মাঝখানে এক বছরের

ব্যবধানের পরও হযরত আবদুল্লাহ (রা)-র দুই বারের বর্ণনার মধ্যে একটি শব্দেরও পার্থক্য ছিল না। এর উপর হযরত আয়েশা (রা) মন্তব্য করেন, বাস্তবিকই আবদুল্লাহর সঠিক কথা স্মরণ আছে -(বুখারী, মুসলিম)।

ষষ্ঠতঃ মহানবী (স)-এর শিক্ষা ও হেদায়াতের এক উল্লেখযোগ্য বিরাট অংশ-যা শুধু মৌখিক বর্ণনাই ছিল না, বরং সাহাবাদের সমাজে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে, তাদের পরিবারে, তাদের অর্থনীতি, সরকারী প্রশাসন ও বিচারালয়সমূহে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর ছিল, যার প্রভাব ও প্রকাশ লোকেরা দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র দেখতে পেত। এমন এক জিনিস সম্পর্কে কোন ব্যক্তি স্মৃতিশক্তির ভ্রান্তি অথবা নিজের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ও ঝোঁক-প্রবণতার ভিত্তিতে কোন বিচ্ছিন্ন কথা নিয়ে এসে পেশ করলে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারত? অতএব কখনও কোন অপরিচিত ও বিচ্ছিন্ন হাদীস সামনে এসে পড়লেও তার বর্ণনাকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ বলে দিয়েছেন যে, ঐ বিশেষ বর্ণনাকারী ছাড়া এই কথা আর কেউ বর্ণনা করেনি অথবা তদনুযায়ী আমল করার কোন নযীর বর্তমান নাই।

হাদীসসমূহের যথার্থতার একটি প্রমাণ

এসব ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি কথা আছে-যা সেইসব লোকেরাই বুঝতে পারেন যারা আরবী ভাষা জানেন এবং যারা ভাসাভাসাভাবে কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হাদীস অধ্যয়ন করেননি, বরং গভীর দৃষ্টিতে হাদীসের সব গ্রন্থাবলী অথবা অন্ততপক্ষে কোন একটি গ্রন্থ (যেমন বুখারী, অথবা মুসলিম) আদ্যপান্ত পাঠ করেছেন। তাদের নিকট একথা গোপন নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিজস্ব একটি ভাষা এবং তাঁর নিজস্ব একটি বিশেষ প্রকাশভংগী ও বাচনভংগী রয়েছে যা সমস্ত সহীহ হাদীসসমূহে সম্পূর্ণ একরূপ এবং এক রং-এ দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআনের মত তাঁর সাহিত্য ও স্টাইলে এতটা স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার অনুকরণ অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বই সবাক অনুভূত হয়। তাতে তাঁর উন্নত মর্যাদা ও অবস্থান অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। তা পড়তে পড়তে মানুষের অন্তর সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, একথা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি বলতে পারে না। যেসব লোক অধিক পরিমাণে হাদীসমূহ পাঠ করে এবং মহানবী (স)-এর ভাষা ও বাচনভংগী উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পেরেছে তারা হাদীসের সনদসমূহের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শুধু মূল বক্তব্য পাঠ করে বলে দিতে পারে যে, হাদীসটি সহীহ অথবা মনগড়া কি

না? মনগড়া হাদীসের ভাষাই বলে দেয় যে, তা রসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষা নয়। এমনকি সহীহ হাদীসের মধ্যে পর্যন্ত শব্দগত বর্ণনা ও অর্থগত বর্ণনার روایت باللفظ اور روایت بالمعنی মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য অনুভব করা যায়। কারণ বর্ণনাকারী যেখানে মহানবী (স)-এর বক্তব্য নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সেখানে তাঁর ভাষা ও স্টাইল সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারে যে, এই চিন্তাধারা ও বর্ণনা তো মহানবীরই (স), কিন্তু ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হাদীসমূহের মধ্যে কখনও পাওয়া যেত না, যদি অসংখ্য দুর্বল হাফেজগণ এগুলো ভুল পন্থায় নকল করে থাকতেন এবং অসংখ্য মস্তিষ্কের কার্যকারণ এগুলোকে নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী চুরমার করে থাকত। একথা কি বুদ্ধিতে কুলায় যে, অসংখ্য মস্তিষ্ক একত্র হয়ে একটি একই রূপ বৈশিষ্ট্যের সাহিত্য এবং একটি একক রীতির (Style) সৃষ্টি করতে পারে?

এ ব্যাপারটি শুধু ভাষা ও সাহিত্যের গন্ডি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা থেকে সন্ধি ও যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী পর্যন্ত জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগসমূহে এবং ঈমান-আকীদা ও নীতি-নৈতিকতা থেকে কিয়ামতের নির্দশনসমূহ ও আখেরাতের অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যন্ত সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহ এমন এক চিন্তা ও কার্যপদ্ধতি পেশ করে যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব একক গঠনপ্রকৃতির অধিকারী এবং যার সমস্ত অংশ ও শাখার মধ্যে পুরাপুরিভাবে যুক্তিসংগত মিল রয়েছে। এতটা সুবিন্যস্ত, সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা এবং এতটা পূর্ণাঙ্গ ও অখন্ড ব্যবস্থা অপরিহার্যরূপে একই চিন্তাধারা থেকে গড়ে উঠতে পারে, বিভিন্ন চিন্তার অধিকারী মস্তিষ্ক একতাবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবস্থা গঠন করতে পারে না। এটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার সাহায্যে শুধু মনগড়া জাল হাদীসই নয়, বরং সন্দেহযুক্ত হাদীস পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব। সনদসূত্র দেখার পূর্বেই গভীর দৃষ্টির অধিকারী কোন মুহাদ্দিস এই প্রকারে কোন হাদীসের বিষয়বস্তু দেখেই পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারেন যে, সহীহ হাদীসসমূহ ও কুরআন মজীদ একত্র হয়ে ইসলামের যে চিন্তাপদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থা গঠন করেছে তার মধ্যে এই বিষয়বস্তু কোন প্রকারেই ঠিকভাবে খাপ খায় না। কারণ এর মেজাজ-প্রকৃতি পুরা জীবন ব্যবস্থার বিপরীত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

উপরোক্ত তথ্য ও আলোচনার আলোকে সম্মানিত বিচারপতির এই রায় নিতান্তই ভাসাভাসা অধ্যয়ন এবং নেহায়েত অযথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনার

ফলশ্রুতি বলেই দৃষ্টিগোচর হয় যে, হাফেজদের ভুলভ্রান্তি এবং বিভিন্নধর্মী মস্তিষ্কের তৎপরতা হাদীসকে বিকৃত করে দিয়েছে। অর্বাচীনের মুখ দিয়েই কেবল হাদীস সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য বের হতে পারে।

কতিপয় হাদীস সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারকের আপত্তি

সামনে অগ্রসর হয়ে সম্মানিত বিচারপতি বলেন যে, হাদীসের ভান্ডারে এমন সব হাদীস বর্তমান আছে যাকে 'সঠিক মেনে নেয়া খুবই কঠিন। এর সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ তিনি মিশকাতুল-মাসাবীহ-এর আলহাজ্জ মৌলভী ফজলুল করিম সাহেব এম. এ. বি. এল. কৃত ইংরেজী অনুবাদ থেকে ১৩টি হাদীস নকল করেছেন। এই অনুবাদ কলিকাতা থেকে ১৯৩৮ খৃ. প্রকাশিত হয়। এসব হাদীসের উপর সম্মানিত বিচারপতির অভিযোগসমূহ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করার পূর্বে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, মিশকাত শরীফের এই অনুবাদে অনুবাদক সাহেব এত সাংঘাতিক ভুল করেছেন যা শুধু হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কেই নয়, আরবী ভাষা সম্পর্কেও তার অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে সম্মানিত বিচারক সাহেব এই সমস্ত ভুলভ্রান্তিসহ তার মূল পাঠ নকল করে দিয়েছেন। যদিও আলোচ্য বিষয়ের সাথে অনুবাদকের এই ভ্রান্তির কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমরা এখানে কেবলমাত্র এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উক্ত বিষয়টির উল্লেখ্য করছি যে, বর্তমানে পাকিস্তান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র, তার উচ্চ আদালতের একটি রায়ে হাদীসের আইনগত মর্যাদার উপর এতটা সুদূরপ্রসারী আলোচনা ও বিতর্ক তোলা হবে এবং হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে এতটা ভাসাভাসা বরং চরম ক্রটিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রমাণ যুগপৎভাবে উপস্থিত করা হবে, সত্যিই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার জ্ঞানবান লোকদের উপর কি প্রভাব বিস্তার করবে এবং আমাদের বিচারালয়সমূহের সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু বৃদ্ধি করবে?

"উদাহরণস্বরূপ তাঁর উধৃত প্রথম হাদীসের দুটি বাক্যাংশ দেখা যাক। - وَاَىُّ شَانِهٖ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا -এর অনুবাদ করা হয়েছে "এবং এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক কথা আর কি হতে পারে।" অথচ তার সঠিক অনুবাদ হবেঃ "তাঁর কোন্ কথাটি আশ্চর্যজনক ছিল না!" - ذَرِيْنِىْ اَتَعَبَّدُ لِـرَبِّىْ কে ذَرِيْنِىْ اَتَعْبُدُ لِـرَبِّىْ - অনুবাদক পড়েছেন এবং এর অনুবাদ করেছেনঃ "আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবে?" অথচ এই অনুবাদই শুধু অস্পষ্ট ও অর্থহীনই নয়, বরং মূল পাঠ পড়তে গিয়ে অনুবাদক এমন ভুল করেছেন যা আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে

প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও করতে পারে না। تعبد (তাবুদু) হল পুং লিংগের ক্রিয়াপদ, আর বাক্যের পারস্পর্য বলে দিচ্ছে যে, সম্বোধিত ব্যক্তি হচ্ছেন মহিলা। মহিলাকে সম্বোধন করতে হলে تعبدين (তাবুদীনা) বলতে হয়, تعبد (তাবুদু) নয়। উপরোক্ত বাক্যাংশের সঠিক অনুবাদ হলঃ "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতি পালকের ইবাদত করব।" এই প্রকারের ভুলভ্রান্তি দেখে শেষ পর্যন্ত কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, সম্মানিত বিচারপতির হাদীস শাস্ত্রের উপর অন্তত এতটা বোধশক্তি আছে যতটা কোন বিষয়ের উপর বিজ্ঞতা সুলভ রায় দেয়ার জন্য অত্যাবশ্যক?

কোন কোন হাদীসে অশালীন বিষয়বস্তু আছে কেন?

এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে ফিরে যাব। ২৬ নং প্যারায় বিজ্ঞ বিচারপতি একের পর এক ৯টি হাদীস নকল করেছেন এবং কোথাও তিনি বলেননি যে, কোন্ হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর তার কি আপত্তি আছে। অবশ্য ২৭ নং প্যারায় তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে মত প্রকাশ করেন যে, উক্ত হাদীসসমূহে যে "উলংগপনা" লক্ষ্য করা যায় তার ভিত্তিতে একথা বিশ্বাস করা যায় না যে, বাস্তবিকই এসব হাদীস সঠিক হতে পারে। খুব সম্ভব তার ধারণা এই যে, মহানবী (স) ও মহিলাদের মধ্যে এবং মহানবী (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ ও তাদের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এ ধরনের খোলামেলা কথোপকথন শেষ পর্যন্ত কিভাবে সম্ভব ছিল? এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ বিচারপতির পেশকৃত হাদীসসমূহ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক কথা বলে দেয়া প্রয়োজন। কারণ বর্তমান কালের "শিক্ষিত ব্যক্তিগণ" সাধারণত এসব কথা না বুঝার কারণে উল্লেখিত প্রকারের হাদীসসমূহ সম্পর্কে সংশয় ও জটিলতায় পতিত হয়ে থাকে।

(এক) মানুষের একান্ত (Confidential) ও ব্যক্তিগত (Private) জীবনের এমন কতিপয় দিক রয়েছে যে সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং পথনির্দেশ ও উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা শরমের অনর্থক অনুভূতি অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এবং এ কারণে উন্নত দেশসমূহের লোকেরা পর্যন্ত এ সম্পর্কে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নীতিমালা সম্পর্কে পর্যন্ত অনবহিত রয়ে গেছে। এটা আল্লাহর দেয়া শরীআতেরই কৃপা যে, তা এসব দিক সম্পর্কেও আমাদের পথনির্দেশ দান করেছে এবং এসব আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বলে দিয়ে আমাদের ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে। বিজাতির চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান লোকেরা এসব জিনিসের মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে, কারণ তাদের জাতির লোকেরা জীবনের

এই বিশেষ শাখার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমান যারা ঘরে বসেই এসব নীতিমালা পেয়ে গেছে, আজ তারা এই শিক্ষার অবমূল্যায়ন করছে এবং আশ্চর্যজনক মজার ব্যাপার এই যে, এই অবমূল্যায়নের প্রকাশের ক্ষেত্রে সেইসব লোকেরাও অংশগ্রহণ করেছে যারা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে যৌন বিজ্ঞানকে (Sex education) পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করার পক্ষপাতী।

(দুই) আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষার জন্য যে কোন নবীকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর উপর জীবনের এই প্রাইভেট শাখা সম্পর্কেও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল। আরব জাতি এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পর্যন্ত অনবহিত ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের পুরুষদেরও এবং মহিলাদেরও পবিত্রতা, পায়খানা-পেশাব, গোসল ইত্যাদির নিয়ম-কানুন, অনন্তর এ জাতীয় অন্যান্য নিয়ম-কানুনও কেবলমাত্র মৌখিকভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং নিজের স্ত্রীগণকেও অনুমতি দেন যে, তাঁরা যেন মহানবী (স)-এর একান্ত পারিবারিক জীবনের এসব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সাধারণ লোকদের সামনে তুলে ধরেন যে, তিনি স্বয়ং কোন্ নীতিমালার উপর আমল করতেন।

(তিন) আল্লাহ তাআলা এই প্রয়োজনে মহানবী (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে মুমিন মুসলমানদের মাতৃস্থানীয় মর্যাদা দান করেছিলেন, যাতে মুসলমানগণ তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে জীবনের এই দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পথনির্দেশ লাভ করতে পারে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় কোন প্রকারের নাপাক আবেগের বহিপ্রকাশের আশংকা না থাকে। এ কারণে হাদীসের গোটা ভান্ডারে এমন কোন একটি নযীর পাওয়া যাবে না যে, মুমিন মুসলমানদের মাতৃস্থানীয় উম্মুহাতুল মুমিনীনের নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা খোলাফায়ে রাশেদীনের বা অপরাপর সাহাবীদের স্ত্রীদের নিকটও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং তারা পুরুষদের সাথে এই ধরনের কথোপকথন করে থাকবেন।

(চার) লোকেরা নিজেদের ধারণায়, অথবা ইহূদী-খৃষ্টানদের প্রভাবে যেসব জিনিস হারাম অথবা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করে নিয়েছিল, সেসব বিষয় শরীআত তাদের জন্য বৈধ করেছে-শুধু এতটুকু শুনেই তারা আশ্বস্ত হতে পারত না। বৈধতার নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে সন্দেহ অবশিষ্ট থেকে যেত যে, হয়ত তা অন্তত মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়-তাই তারা নিজেদের মনের প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিজস্ব কার্যক্রম কি ছিল তা অবহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করত। তারা যখন জানতে পারত যে, মহানবী

(স) স্বয়ং অমুক কাজ করেছেন তখন তাদের মন থেকে সংশ্লিষ্ট কাজটির অন্তত অপছন্দীয় হওয়ার ধারণা দূর হয়ে যেত। কারণ তারা মহানবী (স)–কে অনুসরণীয় আদর্শ মনে করত এবং তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যে কাজ করেছেন তা মাকরূহ অথবা পবিত্রতার স্তর থেকে নিচু হতে পারে না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার ভিত্তিতে মহানবী (স)–এর পবিত্র স্ত্রীগণকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হয়েছে যা অন্য কোন মহিলা বর্ণনা করতে পারত না এবং বর্ণনা করতেও চাইত না।

(পাঁচ) হাদীসসমূহের এই অংশ মূলত মুহাম্মাদ (স)–এর মহানত্ব এবং তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত পৃথিবীতে তেইশটি বছরের রাত ও দিনের প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে রেখে দিতে, নিজের প্রাইভেট জীবনকেও উন্মুক্ত করে দিতে এবং নিজের স্ত্রীদের পর্যন্ত লোকদের সামনে নিজের পারিবারিক জীবনের অবস্থাও পরিষ্কারভাবে বিবৃত করার অনুমতি প্রদানের দুসাহস আর কে করতে পারত এবং গোটা মানব ইতিহাসে কে এইরূপ সৎসাহস দেখাতে পেরেছে?

অভিযোগসমূহের বিস্তারিত মূল্যায়ন

উপরোক্ত বিষয়সমূহ দৃষ্টির সামনে রেখে বিজ্ঞ বিচারপতির পেশকৃত প্রতিটি হাদীস স্বতন্ত্রভাবে নিরীক্ষণ করে দেখা যাক।

প্রথমোক্ত হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) মূলত বলতে চাচ্ছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদিও বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং দুনিয়ার মানুষ নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে যেরূপ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বজায় রাখে তিনিও নিজ স্ত্রীদের সাথে তদ্রূপ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বজায় রাখতেন। কিন্তু তথাপি আল্লাহ তাআলার সাথে তার এমন গভীর সম্পর্ক ছিল যে, বিছানায় স্ত্রীর সাথে শুয়ে যাওয়ার পরও কখনও কখনও হঠাৎ তাঁর উপর ইবাদতের আকাংখা প্রবল হয়ে উঠতো এবং তিনি পার্থিব স্বাদ ও ভোগ বিলাস ত্যাগ করে এমনভাবে উঠে যেতেন যে, আল্লাহর বন্দেগী ছাড়া কোন জিনিসের প্রতি যেন তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, নবী করীম (স)–এর পবিত্র জীবনের এই নির্জন গন্ডি সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কে বলতে পারত? এই তথ্য যদি আলোতে না আসত তবে আল্লাহর প্রতি তাঁর নিষ্ঠার সঠিক অবস্থা বিশ্ব কিভাবে জানতে পারত? ওয়াজ–নসীহতের মজলিসে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয়ের প্রদর্শনী কে না করে থাকে? মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন অবস্থা ও কার্যাবলী

সম্পর্কে অবগত হওয়া গেলেই তখন আল্লাহর প্রতি তার গভীর ও প্রগাঢ় ভালোবাসা ও তাকওয়ার অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় হাদীসে মূলত একথা বলা উদ্দেশ্য যে, চুমু দেয়া স্বয়ং উযু নষ্টকারী জিনিস নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না যৌন উত্তেজনা বশত বীর্যরস নির্গত হয়। লোকেরা সাধারণত চুমুকেই স্বয়ং উযু নষ্টকারী জিনিস মনে করত এবং তাদের ধারণা ছিল, তাতে উযু নষ্ট না হলেও অন্তত পবিত্রতার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য বা ত্রুটি এসে যায়। তাদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য হযরত আয়েশা (রা)–কে বলতে হয়েছে যে, মহানবী (স) স্বয়ং চুমু খাওয়ার পর উযু না করেই নামায পড়েছেন। অন্য লোকের নিকট এই মাসআলাটির গুরুত্ব থাক বা না থাক, কিন্তু যাদের নামায পড়তে হয় তাদের তো অবশ্যি এটা মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক যে, কোন্ অবস্থায় তারা নামায পড়ার উপযোগী থাকে এবং কোন্ অবস্থায় থাকে না।

তৃতীয় হাদীসে এক মহিলার এই মাসআলা জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মত নারীদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে তাকে কি করতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে যেহেতু তা কমই ঘটে থাকে তাই তারা এর শরীআত সম্মত বিধান সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ঐ মহিলা রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, পুরুষদের মত তাকেও গোসল করতে হবে, শুধু তাকেই নয়, যে কোন মহিলাকেই (এরূপ ঘটলে) গোসল করতে হবে। এভাবে তিনি একজন মহিলার মাধ্যমে সব স্ত্রীলোককে একটি জরুরী শিক্ষা দান করলেন। এর উপর যদি কারো আপত্তি থেকে থাকে তবে তিনি কি এটাই চাচ্ছেন যে, মহিলারা তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা–মাসায়েল কারো কাছে জিজ্ঞেস না করুক এবং লজ্জাবনত অবস্থায় নিজের বুদ্ধিতে যা আসে তাই করতে থাকুক? হাদীসের দ্বিতীয় অংশে এক মহিলার আশ্চর্যবোধ করার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) দেহ বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি তথ্য বর্ণনা করেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মত প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের দেহ থেকেও পদার্থ (বীর্য) নির্গত হয়। উভয়ের মিলিত হওয়ার ফলে সন্তান পয়দা হয় এবং উভয়ের মধ্যে যার বীর্যের অংশ বেশী থাকে সন্তানের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যের প্রাবল্য অধিক প্রতীয়মান থাকে। বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এ হাদীসের যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা মিলিয়ে দেখুন। এক বর্ণনায় মহানবী (স)–এর বক্তব্য নিম্নরূপঃ

وَهَلْ يكون الشبه الامن قبل ذالك؟ اذا علا ماءها ماء الرجل

اشبه الولد اخواله واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه الولد اعمامه

"সন্তানের মধ্যে সাদৃশ্য কি এ ছাড়া অন্য কোন কারণে হয়ে থাকে? যখন স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতুল গোষ্ঠীর অনুরূপ হয়ে থাকে। আর যখন স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতৃকুলের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়।"

হাদীস অস্বীকারকারীরা অজ্ঞতা অথবা ভন্ডামীর আশ্রয় নিয়ে এসব হাদীসের এই অর্থ করেছে যে, সহবাসে যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত হয় তবে বাচ্চা পিতৃকুলের প্রভাব প্রাপ্ত হয়, অন্যথায় মায়ের অনুরূপ হয়। আমরা এদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত যে, জাহেল-মূর্খ ও নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকেরা প্রকাশ্যে হাদীসের জ্ঞান নিয়ে এই প্রকারের ধোঁকাবাজি করছে এবং উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত অনুসন্ধান ছাড়াই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে যে, হাদীস বিশ্বাসের অযোগ্য কথায় ভরপুর।

চতুর্থ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করতে পারে এবং মহানবী (স) স্বয়ং এরূপ করেছেন। যেসব দম্পতি নিয়মিত নামায পড়ত মূলত তাদেরই এ মাসআলাটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফজরের সময় বারংবার তারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল যে, সময়ের সংকীর্ণতার কারণে একজনের পরে অপরজন গোসল করলে একজনের নামাযের জামাআত ছুটে যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদেরকে একথা বলে দেয়া আবশ্যক ছিল যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একসাথে গোসল করা শুধু জায়েযই নয়, বরং তাতে দোষেরও কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে আরও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, সে সময় মদীনায় গোসলখানায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না এবং ফজরের জামাআত তার প্রথম ওয়াক্তে অনুষ্ঠিত হত এবং মহিলারাও ফজর ও এশার নামায মসজিদে গিয়ে জামাআতে আদায় করত। এসব তথ্য দৃষ্টির সামনে রেখে আমাদের বলে দেয়া হোক এ হাদীসে কোন্ জিনিসটি গ্রহণযোগ্য নয়?

পঞ্চম হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে কোন্ অবস্থায় গোসল ফরয হয় এবং কোন্ অবস্থায় ফরয হয় না। আর ষষ্ঠ হাদীসে তিনি বলেছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় কখন গোসল ওয়াজিব হয়। এ দুটি হাদীস কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জানতে পারবে যে, তৎকালীন সময়ে গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের মধ্যে একটি মতভেদের উদ্ভব হয়েছিল।

কতিপয় সাহাবী ও তাদের ছাত্রবৃন্দ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে পড়েছিলেন যে, সংগমকালে বীর্যপাত হলেই কেবল গোসল ফরয হয়। এই ভুল বুঝাবুঝি

দূরীকরণার্থে হযরত আয়েশা (রা)-কে একথা বলে দিতে হয়েছে যে, এই হুকুম কেবল স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সহবাসের ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গ পরস্পর একত্র হলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর স্বীয় আমলও তাই ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, নামাযী লোকদের জন্য এই মাসআলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেসব ব্যক্তি কেবল বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হওয়ার পক্ষপাতী ছিল তারা স্ত্রীসহবাসে বীর্যপাত না হওয়ার ক্ষেত্রে গোসল না করেই নামায পড়ার মত ভুল করে বসতে পারত। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স)-এর নিজস্ব কর্মনীতি বলে দেয়ার মাধ্যমেই এই বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেল।

৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ নম্বরের এই হাদীস কয়টি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য জানা প্রয়োজন যে, ফরয গোসল ও হায়েয (মহিলাদের মাসিক ঋতু) অবস্থায় মানুষের নাপাক হওয়ার ধারণা প্রাচীন শরীআতসমূহেও ছিল এবং শরীআতে মুহাম্মাদীতেও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন শরীআতসমূহে ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মযাজকদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এই ধারণাকে এতটা ভারসাম্যহীন করে দেয় যে, তারা এই অবস্থায় মানুষের অস্তিত্বকেই নাপাক মনে করতে থাকে এবং এদের প্রভাবে হেজাযের এবং বিশেষত মদীনার অধিবাসীদের মধ্যেও এই বাড়াবাড়ির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বিশেষত হায়েযগ্রস্ত মহিলারা তো সেখানে সম্পূর্ণ সমাজচ্যুত হয়ে পড়ত।

বিজ্ঞ বিচারপতি মেশকাতের যে গ্রন্থ থেকে এসব হাদীস উধৃত করেছেন তার "হায়েয " শীর্ষক অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস এই যে, "নারীরা হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লে ইহূদীরা তাদের সাথে একত্রে পানাহার, শয়ন ও স্বাভাবিক মেলামেশা পরিত্যাগ করত। মহানবী (স) লোকদের বলেন যে, এ অবস্থায় কেবল সহবাসই নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট যাবতীয় মেলামেশা পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও এক উল্লেখযোগ্য সময় যাবত লোকদের মধ্যে প্রাচীন ধ্যানধারণা অবশিষ্ট থাকে এবং তারা মনে করতে থাকে যে, হায়েয অবস্থায় নারীর অস্তিত্ব কিছু না কিছু অপবিত্র তো থাকেই এবং এ অবস্থায় যে যে জিনিসে তার হাত লেগে যায় তাও অন্তত কিছুটা অপবিত্র অবশ্যই হয়ে যায়। এই ধ্যানধারণাকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে হয়েছেঃ এ অবস্থায় স্বয়ং মহানবী (স) বেছেগুছে চলতেন না। তাঁর মতে না পানি নাপাক হয়ে যেত, না বিছানা, না জায়নামায। অনন্তর তিনি আরও বলে দিয়েছেন যে, হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে তার স্বামী কেবল একটি কাজই করতে পারে না, অবশিষ্ট সমস্ত আচার-ব্যবহার ও মেলামেশা তার সাথে করতে পারে। হযরত আয়েশা (রা) এবং মহানবী (স)-এর অপরাপর স্ত্রীগণ তাঁর কর্মনীতির

বিবরণ দান করে যদি এই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন না করতেন তবে আজ আমাদেরকে নিজেদের পারিবারিক কাজকর্মে যেসব সংকীর্ণতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত তা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের উপর এই অনুগ্রহ প্রদর্শনকারিণীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে আমরা এখন বসে বসে চিন্তা করছি যে, আচ্ছা নবী (স)-এর স্ত্রীগণ কি এ জাতীয় কথা মুখে আনতে পারেন!

আরও দুটি হাদীস সম্পর্কে অভিযোগ

অতপর ২৮ নং প্যারায় বিচারপতি সাহেব আরও দুটি হাদীস উধৃত করেছেন, যাতে মহানবী (স) বলেছেন যে, তিনি জান্নাতসমূহ দেখেছেন এবং তার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল দরিদ্র ও ফকির-মিসকীন। তিনি দোযখও দেখেছেন এবং তার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল স্ত্রীলোক।

এ হাদীস সম্পর্কে তিনি শুধুমাত্র এই মত প্রকাশ করেননি যে, "আমি নিজেকে বিশ্বাসই করাতে পারছি না যে, মহানবী (স) এই রকম কথা বলে থাকবেন, বরং তিনি এ হাদীসের প্রথমাংশ সম্পর্কে এই রায় ব্যক্ত করেন যে, "এর অর্থ কি এই যে, মুসলমানদের ধন-সম্পদ উপার্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে।"

এ জাতীয় কোন হাদীস যদি কোন ব্যক্তি কখনও হালকা দৃষ্টিতে দেখে তবে সে উপরোক্ত ভ্রান্তির শিকার হবে যা এই বিজ্ঞ বিচারপতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেসব লোক ব্যাপক ও গভীরভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেছে এবং যাদের সামনে এ ধরনের প্রচুর হাদীস এসেছে তাদের একথা অজ্ঞাত নয় যে, মহানবী (স) তাঁর এই পর্যবেক্ষণ কেবলমাত্র কাহিনী বলার খাতিরে বর্ণনা করেননি, বরং বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত লোকের সংশোধনের জন্য বর্ণনা করেছেন। তিনি অবশ্যই একথা বলেননি যে, গরীব লোকদের তুলনায় ধনী লোকেরা দোযখের অধিক উপযোগী হয়ে থাকে, বরং সম্পদশালীদের এও বলেছেন যে, তাদের কি কি দোষ বা অপরাধ রয়েছে যা আখেরাতে তাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়; এবং তাদের কি কর্মধারা অবলম্বন করা উচিত যার ফলশ্রুতিতে তারা পার্থিব জীবনের মত আখেরাতেও সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে মহিলাদেরও বলে দিয়েছেন যে, তাদের কোন্ ধরনের দোষত্রুটি তাদেরকে জাহান্নামের বিপদে নিক্ষেপ করতে পারে, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা উচিত এবং কি ধরনের ভালো কাজ করে তারা জান্নাত লাভের অধিকারী হতে পারে। যেসব লোকের কোন একটি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিক অধ্যয়ন ও গবেষণার অবকাশ নেই তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৎসামান্য জ্ঞানের উপর ভরসা করে মত প্রকাশের কি প্রয়োজন আছে?

আরও একটি হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এরপর ২৯ নং প্যারায় বিজ্ঞ বিচারপতি বলেন, "উপরন্তু এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এমন কথা বলে থাকবেন যা বুখারীর ৮২৫ নং পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত নং ৬০২/৭৪-এ আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ জান্নাতে একটি তাঁবুর বিভিন্ন অংশে উপাদেয় নারীদের সাথে সংগম করবে?"

আমরা অত্যন্ত পেরেশান ছিলাম যে, এই বুখারী নামক হাদীস গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত কোন কিতাব যার ৮৫২ নং পৃষ্ঠার বরাত দেয়া হয়েছে? অবশেষে সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সম্ভবত এ গ্রন্থটি হচ্ছে তাজরীদুল বুখারীর উর্দূ অনুবাদগ্রন্থ যা মালিক মুহাম্মাদ এন্ড সন্স প্রকাশ করেছেন। অনুবাদগ্রন্থখানি বের করে দেখা গেল সত্যিই উক্ত গ্রন্থের বরাত দেয়া হয়েছে। এখন কিছুটা এই জুলুম ও অবিচারের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, বিজ্ঞ বিচারপতি হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে একটি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তে বিজ্ঞসুলভ রায় প্রকাশ করেছেন এবং বরাত দিচ্ছেন এমন একটি ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদগ্রন্থের যার অনুবাদকের নামটা পর্যন্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি। আরও অধিক জুলুম ও অন্যায় এই যে, তিনি হাদীসের মূল ভাষা পড়ার পরিবর্তে অনুবাদের ভাষা পাঠ করে রায় প্রদান করেছেন এবং এতটুকুও অনুভব করলেন না যে, অনুবাদে কি ভুল রয়েছে। হাদীসের মূল পাঠ ও তার সঠিক অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا
وَفِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ۔

جنت میں ایک خیمہ ہے جو کھو کھلے موتی سے بنا ہوا ہے اس کا عرض ۶۰ میل ہے اسکے ہر گوشوں میں
رہنے والے دوسرے گوشوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مومن اس پر گشت
کریں گے (یعنی وقتاً فوقتاً ہر گوشے والوں کے پاس جاتے رہیں گے)

"বেহেশতে একটি তাঁবু আছে যা কারুকার্য খচিত মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। তার প্রস্থ ষাট মাইল। এর এক প্রকোষ্ঠের লোকেরা অপর প্রকোষ্ঠে বসবাসকারীদের দেখতে পায় না। মুমিনগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে"

(অর্থাৎ মাঝে মধ্যে প্রতিটি প্রকোষ্ঠের বাসিন্দাদের নিকট যাতায়াত করতে থাকবে)।[১]

রেখাংকিত "ইয়াতূফূনা আলাইহিম" বাক্যাংশের অর্থ অনুবাদক সাহেব করেছেন–"তারা তাদের সাথে সংগম করবে" এবং বিজ্ঞ বিচারপতি এর উপর নিজের রায়ের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অথচ "তাফা আলাইহে"–এর অর্থ "কখনো কখনো কারো নিকট যাতায়াত করা," "সহবাস করা" এর অর্থ নয়। কুরআন মজীদে জান্নাতের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছেঃ

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ ـ

"তাদের নিকট এমন সব কিশোরেরা যাতায়াত করবে যারা চিরকালই কিশোর থাকবে"– (সূরা ওয়াকিয়াঃ ১৭; আদ–দাহ্রঃ ১৯)। এর অর্থ কি এই যে, এসব কিশোর তাদের সাথে সংগম করবে? সূরা নূর–এ (৫৮ নং আয়াতে) দাস–দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তিন সময়ে বাড়ির মালিকের নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না। অবশ্য অন্যান্য সময়ে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবে এবং এই নির্দেশের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ "তাদেরকে তোমাদের নিকট যাতায়াত করতে হয়।" এখানেও কি এই তাওয়াফ শব্দের অর্থ সংগমই হবে? আলোচ্য হাদীসে (আহ্ল) শব্দের অর্থ যদি একজন মুমিন ব্যক্তির স্ত্রীগণই হয়ে থাকে যারা এই ষাট মাইল প্রশস্ত তাঁবুর বিভিন্ন অংশে বসবাস করবে, তবুও কোন ব্যক্তির নিজের স্ত্রীদের কোঠাসমূহে "যাতায়াত" কি অপরিহার্যরূপে "সংগম"–এর সমার্থবোধক? কোন উত্তম ব্যক্তি কি এই একটি উদ্দেশ্য ছাড়া নিজের স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না? তাওয়াফ শব্দের এই অর্থ তো কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার মন–মগজের উপর যৌনাবেগ নিকৃষ্টভাবে সওয়ার হয়ে আছে।

বিচারপতির মতে সুন্নাতে নববী আইনের উৎস না হওয়ার ব্যাপারে আরও দুটি প্রমাণ

৩০ নম্বর প্যারায় বিজ্ঞ বিচারক আরও দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন। (এক) রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে (যার বরাত তিনি দিয়েছেন) মহানবী (স) স্বয়ং বলেছেন, যেসব বিষয় দীন ইসলামের সাথে সম্পর্কিত নয়

---

১. বুখারী, বাংলা অনু. ৪ খ., হাদীস নং ৪৫২, ইংরেজী অনু. ডক্টর মুহসিন খান, ৬খ., হাদীস নং ৪০২; মুসলিম (জান্নাত), তিরমিযী (জান্নাত), দারিমী, (রিকাক), মুসনাদে আহমাদ, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড–(অনুবাদক)।

সেসব ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যকে চূড়ান্ত মনে করতো না। (দুই) মহানবী (স) স্বয়ং এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন (এখানে তিনি অবশ্য কোন হাদীস উল্লেখ করেননি) যে, শুধু কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগে মুসলমানদের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

এর মধ্যে প্রথম দলীল তাঁর পেশকৃত হাদীসের সাহায্যেই চুরমার হয়ে যায়। উক্ত হাদীসে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (স) খেজুরের উৎপাদন কার্যের ব্যাপারে মদীনাবাসীদের একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাতে খেজুরের উৎপাদন কমে যায়। এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, "আমি তোমাদের দীনের ব্যাপারে যখন তোমাদের কোন নির্দেশ দেই তখন তার অনুসরণ কর এবং যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী কিছু বলি তবে সে ক্ষেত্রে আমি একজন মানুষই।"

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইসলাম যেসব বিষয় নিজের দিক নির্দেশনার আওতাভুক্ত করে নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তো মহানবী (স)-এর বাণীর আনুগত্য অপরিহার্য। অবশ্য যেসব বিষয় দীন ইসলাম নিজের আওতাভুক্ত করেনি সেসব ক্ষেত্রে নবী (স)-এর ব্যক্তিগত অভিমতের আনুগত্য অপরিহার্য নয়। এখন স্বয়ং প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে নিতে পারে যে, দীন ইসলাম কোন্ সব বিষয় নিজের আওতাভুক্ত করে নিয়েছে এবং কোন্টিকে নয়। একথা সুস্পষ্ট যে, লোকদের উদ্যানচর্চা, অথবা দর্জীর কাজ, অথবা বাবুর্চির কাজ শিখানোর বিষয় দীন ইসলাম নিজের দায়িত্বভুক্ত করেনি। কিন্তু স্বয়ং কুরআন মজীদই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, পারিবারিক আইন, অর্থনৈতিক বিধান এবং অনুরূপভাবে সামাজিক জীবনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আইন-কানূন বলে দেয়ার দায়িত্ব দীন ইসলাম তার কার্যক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে নিয়েছে। এসব বিষয় সম্পর্কে মহানবী (স)-এর হেদায়াত ও পথনির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপরোক্ত হাদীসকে কিভাবে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে?

তার দ্বিতীয় দলীল সম্পর্কে আমাদের দাবী এই যে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বলে দেয়া হোক যে, মহানবী (স)-এর কোন্ হাদীসে এই বক্তব্য এসেছে যে, মুসলমানদের পথনির্দেশ লাভের জন্য শুধুমাত্র কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ।

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ মোটেই পথভ্রষ্ট হবে না ঃ (এক) আল্লাহর কিতাব, (দুই) তাঁর রসূলের সুন্নাত"– (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

স্বয়ং মুহাদ্দিসগণের কি হাদীসসমূহের উপর আস্থা ছিল না?

৩১ নং প্যারায় সম্মানিত বিচারক আরও একটি যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, "স্বয়ং মুহাদ্দিসগণ নিজেদের সংগৃহীত হাদীসসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না শুধু এই একটিমাত্র বিষয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা মুসলমানদের বলেন না যে, তোমরা আমাদের সংগৃহীত হাদীসগুলো যথার্থ বলে গ্রহণ কর। বরং তাঁরা বলেন, এগুলোকে আমাদের নির্ধারিত হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ডে যাচাই করে তোমরা নিশ্চিত হও। এসব হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁরা যদি নিশ্চিত হতেন তবে যাচাই বাছাইয়ের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।"

বাস্তবিকই এ এক আজব যুক্তি। দুনিয়ার কোন প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ লোক কোন জিনিসকে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বলেন না, যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং যথার্থতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারেন। কিন্তু আপনি একজন ঈমানদার প্রতিভাবান ব্যক্তি সম্পর্কে এই আশা করতে পারেন না যে, তিনি নিজের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার উপর ঈমান আনার জন্য দুনিয়া ব্যাপী দাবী করবে এবং প্রতারণার সাথে লোকদের বলবে যে, আমি এটাকে সঠিক মনে করি, অতএব তোমাদেরও তা সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিৎ। তিনি তো এটাই বলবেন যে, নিজের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা চলাকালে যে তথ্যাবলীই তার সামনে আসবে তার সমস্তটাই লোকদের সামনে রেখে দেবেন এবং বলে দেবেন যে, এই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তোমরা তা যাচাই করে নাও। যদি তোমরা আমার পেশকৃত তথ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পার তবে তা কবুল করে নাও, অন্যথায় এই উপকরণ উপস্থিত আছে তার মাধ্যমে নিজেরাই যাচাই-বাছাই করে নাও। মুহাদ্দিসগণ এই কাজ করেছেন। তাদের নিকট মহানবী (স)-এর যে কথা ও কাজের বিবরণ পৌঁছেছে তার পূর্ণ সনদ (সূত্র পরম্পরা) তাঁরা বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি সনদ সূত্রে যতজন রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম এসেছে তাদের প্রত্যেকের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। বিভিন্ন সনদসূত্রে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতসমূহে যে যে দিক থেকে দুর্বল বা শক্তিশালী হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যেত তাও তাঁরা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, আমরা

অমুক অমুক যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে এই হাদীসকে সহীহ অথবা দুর্বলতার দিক থেকে এই মর্যাদা দান করি।

এখন পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীসকে এই পদ্ধতি ও পন্থায় সহীহ বলেন, তা তাদের নিকট সহীহ বলেই বিবেচিত। এগুলো সহীহ ও যথার্থ হওয়া সম্পর্কে তাঁরা যদি নিশ্চিতই না হতে পারতেন এবং তাদের যদি এরূপ বিশ্বাসই না জন্মাত তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একে সহীহ বলবেনই বা কেন। এর পরও কি তাদের এরূপ আহবান জানানোর প্রয়োজন ছিল যে, হে মুসলমানগণ! তোমরাও এসব হাদীসের সহীহ ও যথার্থ হওয়ার উপর ঈমান আন, কারণ আমরা এগুলোকে সহীহ ও যথার্থ সাব্যস্ত করেছি?

হাদীসের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার অভিযোগ

বিজ্ঞ বিচারপতি ৩৩ নং প্যারায় দুটি কথা বলেছেন, যেখানে পৌঁছে তার যুক্তিপ্রমাণের সমাপ্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম কথা এই বলেছেন যে, "প্রচুর হাদীসের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ও সম্পর্কহীন যা পাঠ করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, এগুলোকে পূর্বাপর সম্পর্ক ও যথাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করা এবং এর যথার্থ দাবী ও তাৎপর্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তার পূর্বাপর সম্পর্কের বিষয়টি সামনে রাখা হবে এবং কোন্ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রসূলে পাক সংশ্লিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন বা কোন কাজ করেছেন তা জ্ঞাত হওয়া যাবে।"

তার দ্বিতীয় কথা এই যে, "একথা বলা হয়েছে এবং যথার্থভাবেই বলা হয়েছে যে, হাদীস কুরআনের বিধান মানসূখ (রহিত) করতে পারে না। কিন্তু অন্ততপক্ষে একটি ক্ষেত্রে তো হাদীসসমূহ কুরআন পাকে সংশোধন আনয়ন করেছে, আর তা হচ্ছে ওসিয়াত সম্পর্কিত বিষয়।"

উপরোক্ত দুটি কথা সম্পর্কেও কয়েকটি বাক্য নিবেদন করে আমরা এই সমালোচনার পরিসমাপ্তি টানব।

প্রথম কথাটি মূলত এমন একটি প্রতিক্রিয়া যা হাদীসের সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র গ্রন্থাবলীর কোন একটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ অগভীর দৃষ্টিতে পাঠ করার পর একজন পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু হাদীসের বিরাট ও ব্যাপক ভান্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়নের পর তার পাঠক জানতে পারে যে, যেসব হাদীস এক স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে ও সম্পর্কহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই অন্য স্থানে তার পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। যেসব হাদীসের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, সে

সম্পর্কেও যদি চিন্তাভাবনা করা হয় তবে তার মূল পাঠ স্বয়ং তার প্রেক্ষাপটের দিকে ইংগীত করে থাকবে। কিন্তু এর প্রেক্ষাপট কেবলমাত্র সেইসব লোকই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন, যাঁরা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলী প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়নের পর রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগ এবং তাঁর সমসাময়িক সমাজের অবস্থা ও ধরন–প্রকৃতি উত্তমরূপে উপলব্দি করতে পেরেছেন। তাঁরা কোন একটি সংক্ষিপ্ত হাদীসে হঠাৎ কোন কথা বা কোন ঘটনার উল্লেখ দেখে সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, একথা কোন্ অবস্থায় এবং কোথায় ও কোন্ প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল; এবং এই ঘটনা কোন্ ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল। এর কতিপয় উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে এই সমালোচনার এক পর্যায়ে কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেশ করে এসেছি।

হাদীস কি কুরআনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে?

দ্বিতীয় কথাটি সম্পর্কে আমাদের নিবেদন এই যে, বিজ্ঞ বিচারক ওসিয়াত সম্পর্কে যেসব হাদীসকে কুরআন মজীদে পরিবর্তন বা সংশোধনের সমার্থবোধক সাব্যস্ত করছেন সেগুলোকে যদি সূরা নিসায় বর্ণিত মীরাস সম্পর্কিত বিধানসমূহের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা হয় তবে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ঐসব হাদীসে কুরআন মজীদের নির্দেশের পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়নি, বরং ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এই সূরার দ্বিতীয় রুকূতে কতিপয় নিকটাত্মীয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়ার পর বলা হয়েছে যে, এই অংশসমূহ মৃত ব্যক্তির ওসিয়াত পূর্ণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর বের করা হবে। মনে করুন এক ব্যক্তি ওসিয়াত করল যে, তার কোন ওয়ারিশকে কুরআন কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশের কম দিতে হবে, কাউকে বেশী দিতে হবে এবং কাউকে কিছুই দেয়া যাবে না, তবে সে মূলত এই ওসিয়াতের মাধ্যমে কুরআন মজীদের নির্দেশের পরিবর্তন বা সংশোধনকারী সাব্যস্ত হবে। এজন্য মহানবী (স) বলেছেনঃ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"ওয়ারিশদের জন্য কোন ওসিয়াত করা যাবে না।" অর্থাৎ কুরআন মজীদে তার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা ওসিয়াতের সাহায্যে বিলোপ করা যাবে না, হ্রাসও করা যাবে না এবং বৃদ্ধিও করা যাবে না, বরং কুরআন অনুযায়ী মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অবশ্য যারা ওয়ারিশ নয় তাদের অনুকূলে, অথবা সামাজিক স্বার্থে অথবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি ওসিয়াত করতে পারে। কিন্তু এই সুযোগেও কোন ব্যক্তির কোন কারণে নিজের সমস্ত সম্পত্তি অথবা এর অধিকাংশ যারা ওয়ারিশ নয় তাদের দিয়ে দেয়ার ওসিয়াত করে বসার এবং

ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার আশংকা ছিল। তাই মহানবী (স) সম্পত্তির মালিকের এখতিয়ারসমূহের উপর আরও একটি বিধিনিষেধ আরোপ করেন যে, সে কেবল তার সম্পত্তির এক–তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসিয়াত করতে পারবে এবং অবশিষ্ট দুই–তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সেইসব হকদারের জন্য ত্যাগ করতে হবে, যাদেরকে কুরআন নিকটতর আত্মীয় সাব্যস্ত করেছে এবং উপদেশ দিয়েছে যে,

- لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا -

"তোমাদের জানা নাই যে, তাদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের নিকটতর"–(সূরা নিসাঃ ১১)।

কুরআনিক বিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য কুরআনের ধারক ও বাহক রসূল (স) যে নীতিমালা ও আইন–কানূন প্রণয়ন করেছেন তা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করার পর আমাদের বলে দেয়া হোক যে, শেষ পর্যন্ত কোন্ যুক্তিসংগত দলীল–প্রমাণের ভিত্তিতে এটাকে "পরিবর্তন বা সংশোধন"–এর সংজ্ঞাভুক্ত করা যেতে পারে? এই প্রকারের বক্তব্য রাখার পূর্বে কিছু চিন্তাভাবনা তো করা উচিৎ যে, কুরআন পাকের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ যদি তার ধারক ও বাহকই না করেন তবে আর কে করবে? আর এই ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ যদি ঐ সময় না করে দেয়া হত তবে ওসিয়াতের অধিকারসমূহ প্রয়োগ করতে গিয়ে লোকেরা কুরআন মজীদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের অবয়ব কিভাবে বিকৃত করে ফেলত। আবার এর চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা এই যে, এই সঠিক ব্যাখ্যাকে তো বিজ্ঞ বিচারক "পরিবর্তন বা সংশোধন" সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং নিজের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের তিনি নমুনা স্বরূপ কুরআনের তিনটি বিধানের যে মুজতাহিদ সুলভ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে তিনি মোটেই অনুভব করছেন না যে, মূলত তার নিজের ব্যাখ্যাই "পরিবর্তন ও সংশোধন"–এর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে।

শেষ নিবেদন

এ হলো সার্বিক যুক্তিপ্রমাণ যা বিজ্ঞ বিচারপতি হাদীস ও সুন্নাহ সম্পর্কে নিজের রায়ের পক্ষে পেশ করেছেন। আমরা তার পেশকৃত প্রতিটি যুক্তির বিস্তারিত মূল্যায়নপূর্বক যে আলোচনা পেশ করেছি তা অধ্যয়নপূর্বক প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এসব যুক্তির কতটুকু ওজন আছে এবং এর প্রতিকূলে সুন্নাহ আইনের উৎস হওয়ার এবং হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্য সূত্র হওয়ার সপক্ষে আমরা যেসব দলীল–প্রমাণ পেশ করেছি তা কতটা শক্তিশালী। আমরা বিশেষভাবে স্বয়ং বিজ্ঞ বিচারপতির নিকট এবং তার

বন্ধুদের নিকট নিবেদন করছি যে, তারা গভীর চিন্তাভাবনা সহকারে আমাদের এই সমালোচনা অধ্যয়ন করুন এবং তাদের নিরপেক্ষ রায় অনুযায়ী একটি উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারপতিগণের রায় যেরূপ নিরপেক্ষ হওয়া উচিৎ, এই সমালোচনা যদি বাস্তবিকই শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে তবে তারা আইন অনুযায়ী এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করুন যার ফলে উক্ত রায় ভবিষ্যতের জন্য নযীর হতে না পারে। বিচারালয়সমূহের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা প্রতিটি দেশের বিচার ব্যবস্থা ও ন্যায়-ইনসাফের প্রাণস্বরূপ এবং বহুলাংশে তার উপর যে কোন দেশের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। দেশের উচ্চতর আদালতসমূহের রায় যদি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দুর্বল যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এবং অযথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অযথার্থ তথ্য সম্বলিত হয় তবে তা তার মান-মর্যাদার জন্য যতটা ক্ষতিকর অন্য কোন জিনিস ততটা ক্ষতিকর নয়। অতএব ঈমানদার সুলভ সমালোচনার মাধ্যমে এ ধরনের কোন ভ্রান্তি চিহ্নিত হয়ে গেলে প্রথম অবসরেই স্বয়ং বিচারালয়সমূহের বিচারকগণের এর প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

—ঃ (সমাপ্ত) ঃ—

মাওলানা
মওদূদী

সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা

ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী আইন ও সংবিধান
এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সংসদ ও সার্বভৌমত্ব
সম্পর্কে জানার জন্যে
পড়ুন

আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)
-এর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ

ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭ ফোন : ৮৩১১২৯২

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

শতাব্দী
প্রকাশনী